রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত
২৫, মহেন্দ্র বসু লেন,
শ্যামবাজার, কলিকাতা

[মূল্য দেড় টাকা]

শ্রীশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রি
বেদান্ত প্রেস
১৪, রামচন্দ্র মৈত্র লেন,
কলিকাতা

"দেখেছ কি নররূপে দেবতা ধরায় ?—
আছে কত দেব ভবে ধরি নর-কায়।
মন যার স্বার্থহীন পর-উপকারে,
ব্রত যার পর দুঃখ দূর করিবারে ;
প্রিয়ভাষী, সত্যবাদী, নহেক গর্ব্বিত,
নররূপে দেব সেই ধরায় পূজিত।
জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে,
দেখিয়াছি প্রত্যক্ষ এ মহৎ জীবনে।"

উৎসর্গ

স্বনামধন্য কর্ম্মবীর

পরম পূজ্যপাদ

স্যার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কে-সি-আই-ই, কে-সি-ভি-ও

মহোদয়ের কর-কমলে

অন্যতম কর্ম্মবীরের চরিত-কথা

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

শ্রদ্ধানত চিত্তে

উৎসর্গীকৃত

হইল

প্রণত

যতীন্দ্রনাথ

নিবেদন

স্বর্গত কর্ম্মবীর রসায়নাচার্য্য ডাক্তার রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্-বি, এফ্-সি-এস্, আই-এস্-ও, সি-আই-ই মহাশয়ের সহিত, মুখ্যতঃ সাহিত্য-সেবা-সূত্রে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে,—সে আজ প্রায় দুই যুগ পূর্ব্বের কথা। তখন তাঁহার প্রতিভার দীপ্ত বিভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত; প্রতিষ্ঠার পুনঃপুনঃ অভিনন্দনে তিনি সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন। ক্রমশঃ নানা কারণে আমি তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হই এবং তাহার ফলে, তাঁহার জীবনের বহু কাহিনী আমার কৌতূহলী চিত্তকে আকৃষ্ট করে। তাহা হইলেও, তখন আমি কল্পনা করিতে পারি নাই,—আমার অক্ষম লেখনী একদিন তাঁহার চরিত্র-চিত্রণে নিয়োজিত হইবে। তাঁহার অবসানের পর, শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু এম্-এ, বি-এল্, বার্-এট্-ল ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, এম্-বি, এফ্-সি-এস্ তাঁহার কৃতী পুত্রদ্বয় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী, তাঁহার জীবনী লিখিতে আমাকে প্রণোদিত করেন।

চুণীলাল অতিমানব বা মহামানব ছিলেন না,—তিনি ছিলেন মানুষ। অতিমানব বা মহামানবকে মানুষ শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়া, দূরে সরিয়া দাঁড়ায়,—আর মানুষকে মানুষ অনুকরণ বা অনুসরণ করে। সাধারণ মানুষ যে নিজ চেষ্টামূলে, জীবনকে স্বীয় প্রতিভার অনুপাতে সকলদিকে সুসমঞ্জভাবে গড়িয়া তুলিয়া, সার্থককাম হইতে পারে, চুণীলাল তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহার আদর্শ সম্মুখে পাইলে, যদি কোনও জীবন-যাত্রীর আত্মোন্নতির বিঘ্নবহুল পথ অতিবাহন-যোগ্য হয়, তাহা হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কিন্তু এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যপালন আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না, যদি ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত হীরালাল সিংহ বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত বাহাদুর এম্-এল্-সি, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্, এটর্ণী-এট্-ল, এম্-এল্-সি, রাঁচির প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত, কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত রাধিকাকান্ত চৌধুরী, কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার শাহ্, কলিকাতা জেলা-দাতব্য-সমিতির সভাপতি রাজা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিগণ এবং চুণীলালের আত্মীয়-বন্ধুবর্গ, তাঁহার কৃতিত্ব-সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহে, আমাকে তাঁহাদের অমূল্য সহায়তা দান না করিতেন। এতদ্ভিন্ন, আরও বহু সুধী সুহৃদের নিকট হইতে, আমি চুণীলালের বিষয়ে অনেক সংবাদ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। পরম-শ্রদ্ধাভাজন স্যার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া, গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি সহকারে, আমাকে অপরিশোধ্য

স্নেহ-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি

২২শে ফাল্গুন, ১৩৪১
বাজিতপুর, বসিরহাট,
২৪ পরগণা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

সদ্‌গ্রন্থে ভূমিকার প্রয়োজন হয় না,—সাধুচরিতেও ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। আলোচ্য গ্রন্থসম্বন্ধে উভয় উক্তিই প্রযোজ্য।

রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত লিখিয়াছিলেন। অন্যান্য নানা বিষয়ে তিনি যেমন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-আখ্যায়িকা লিখিয়াও তাহা করিয়াছেন। তাঁহার জীবন-আখ্যায়ক সুকবি ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। গ্রন্থে কৃতিত্বসম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

গ্রন্থকার বহুদিন রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত নানা কারণে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ থাকায়, এই গ্রন্থ রচনার ভার লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী ও শোভন হইয়াছে। বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি এই গুরুভার বহন করিয়াছেন।

অদম্য চেষ্টার ফলে রায় বাহাদুর সুধিসমাজে কি প্রকারে শীর্ষস্থানের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী করিয়া এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। নিজের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, শিক্ষা-জগতে,

সমাজ-সংস্কারে, আর্ত্তত্রাণ-চেষ্টায়, ধর্ম্মপ্রাণতায় ও চরিত্রের দৃঢ়তায় এবং দেশের আর্থিক, স্বাস্থ্যনৈতিক ও অন্যান্য নানাবিধ দৈন্য-মোচন-সঙ্কল্পে চুণীলালের স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। রায় বাহাদুরের উক্ত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ও নানা সদ্‌গুণের বিশ্লেষণ ও বিবরণ গ্রন্থকারকর্ত্তৃক সুখপাঠ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহার চরিত্র-চিত্র সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গ-সাহিত্যে চরিতাখ্যানের স্থান ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিতেছে। চুণীলালের দেহান্তে তাঁহার গুণকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, লোক-সমাজের মঙ্গলের জন্য, চুণীলালের জীবন-আখ্যায়িকার প্রয়োজন আছে। সুখের ও সৌভাগ্যের বিষয়, সেই দুর্দ্দিনে আমি যে সাগ্রহ ও সনির্ব্বন্ধ বাসনা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তাহা অতি শীঘ্রই সুষ্ঠুভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছে।

উপযোগী চরিতাখ্যানদ্বারা কেবল যে লোকান্তরিত মহাত্মার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করা হয়, তাহা নহে,—তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, পরযুগ যাহাতে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারে, তাহারও পথ প্রশস্ত হয়। ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৫২ সালে পূজ্যপাদ ঋষিকল্প জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার লোকশিক্ষা-বিষয়ক উপাদেয় ইংরাজি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"What pleasure to see in the pages of biography, examples of moral greatness! When we read of a Fenelon or of a Howard, what an enjoyment of bliss! If there be one whose parental solicitude for the wel-

fare of the youths of Bengal has been unequalled and who has spent the whole of a competent fortune for the education of Hindu youths ; if there be one again who is the benefactor of our country, who came down from his high position amongst the rulers to mix with the poor and the lowly, and to be concerned in their welfare, whose secret charities have enabled many a helpless youth to prosecute his collegiate studies, and who tried heart and soul to elevate our daughters from intellectual degradation, if there be such noble beings, who is there that will not feel interested in the study of their lives ? What educated natives' heart does not thrill with both sorrow and joy when he comes to know the particulars of the lives of David Hare and John Eliott Drinkwater Bethune ?"

চুণীবাবুর কৃতী চরিতাখ্যায়ক যতীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে উক্ত ঋষি-বাক্যের যাথার্থ্য ও সমীচীনতা বর্ণে বর্ণে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গের চরিতাখ্যান সাহিত্যে এই পুস্তক উচ্চস্থান অধিকারের সম্পূর্ণ যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে।

"প্রসাদপুর"
২০ নং সূরী লেন, কলিকাতা,
চুণীলালের জন্মতিথি,
২২শে ফাল্গুন, ১৩৪১

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সূচী

পরিচ্ছেদ			পত্রাঙ্ক
ক্ষণজন্মা	...	...	১
বংশপরিচয়	...	...	১০
বাল্যজীবন	...	...	১৬
বিদ্যারম্ভ	...	...	২২
ছাত্রজীবন	...	...	৩৪
উচ্চশিক্ষা ও কর্ম্মজীবন	...	...	৪৯
প্রতিষ্ঠার পথে	...	...	৬৫
সাহিত্য-সেবা	...	...	৮৩
সাংসারিক জীবন	...	...	১৪০
দেশের ও দশের সেবা	...	...	১৭০
চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন	...	...	১৯৮
শেষ যাত্রা	...	...	২৩৫
পরিশিষ্ট	...	...	২৬৫

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মমতার ফাঁসি (উপন্যাস)	১৲
আশমানতারা (ঐ)	২।০
আরত্রিক (কাব্য)	১৲
গীতি-কদম্ব (গীতি-কবিতা)	১।০

রসায়নাচার্য্য চুনীলাল

রসায়নাচার্য্য

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

ক্ষণজন্মা

মহৎ লোকের জীবন-চরিত পাঠ ও জন্ম-মুহূর্ত্ত পর্য্যালোচনা করিলে, 'ক্ষণজন্মা' অভিধানের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ সহসাই বড় হয় না,—জন্মান্তরবাদী হিন্দুর মতে, পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতির ফলে, মানুষ মানবতার আদর্শ-সীমান্তে উপনীত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যমতে, জীবজগতের ক্রম-বিকাশ বা ক্রম-পরিণতি উক্ত হিন্দু-মতের সমর্থক না হইলেও, মানুষের ক্রম-বিবর্দ্ধমান অবস্থার সহিত উক্ত দুই মতেরই যে একটা যোগসূত্র আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমাদের মধ্যে এ'টা প্রবাদ প্রচলিত আছে,—"জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে,—তিন বিধাতা নিয়ে।" অর্থাৎ মানুষের জন্ম-পরিগ্রহ, দেহাবসান ও বিবাহ-বন্ধন বি' বা দৈব-নির্দ্দিষ্ট। এই দৈব পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আত্মোৎকর্ষ-লাভের প্রচেষ্টা মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সে যে আজ সমস্ত জীব ও জড় জগতের উপর তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে, মূলে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার আকুল আগ্রহ,

একাগ্র সাধনা। বহু যুগ, বহু জন্ম ধরিয়া, সে এই কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছে। শত বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্য দিয়া, নৈসর্গিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাহার এই জয়যাত্রা। প্রতিমানবই যে সফলকাম হয়, তাহা বলি না,—প্রতিমানবই যে উন্নতি-মার্গে ক্রমাগতই অগ্রসর হইতেছে,—তাহা নহে। কাল-চক্রের আবর্ত্তনে, মানুষের কর্ম্মার্জ্জিত পাপ-পুণ্যের একটা মীমাংসা হইতেছে এবং তাহারই ফলে মানুষ নামিতেছে, উঠিতেছে। কিন্তু জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রবুদ্ধ অবস্থাতেই হউক, আর অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতেই হউক, মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্য মানবতায় সিদ্ধিলাভ। যতদিন না এই সিদ্ধি করায়ত্ত হয়, ততদিন তাহার বিরতি নাই।

, এই আত্মোৎকর্ষজন্য সাধনা মানুষের পরজন্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিত্য সংগ্রামের মধ্যে একের বীর্য্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা, এক কথায় কৃতিত্ব, তাহাকে শুভক্ষণে অথবা জ্যোতির্ব্বেত্তার মতে, তৎকালে উদিত গ্রহ-নক্ষত্রের আনুকূল্যপূর্ণ মুহূর্ত্তে জন্ম পরিগ্রহ করিবার অবসর দেয়, এবং অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহাকে অশুভ মুহূর্ত্তের মধ্যে এই জগতে টানিয়া আনে। এ ক্ষেত্রে একটা কথা উঠিতে পারে, প্রতিমুহূর্ত্তেই ত কোটী কোটী জীবের উদ্ভব হইতেছে, কিন্তু কোনও এক শুভ লগ্নে উদ্ভূত কোটী কোটী জীবের প্রত্যেকেরই ত উৎকর্ষ লক্ষিত হয় না! শঙ্করাচার্য্য যে পবিত্র ক্ষণে ধরাতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বা নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যে মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে মুহূর্ত্তে নিশ্চয়ই আরও কত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইতিহাস ত তাহাদের কাহাকেও মহামানবের অভিধানে অভিহিত করে নাই, বা

দিগ্বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করে নাই!—এ বৈসাদৃশ্যের হেতু কি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়,—ঐ পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মের তারতম্যেই এ তারতম্য নিহিত। উৎকর্ষ-সাধনের পথে পূর্ব্বজন্মে শঙ্কর বা নেপোলিয়ান যতটা অগ্রগামী হইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অন্যে তখন তাঁহাদের বহু পশ্চাতে অবস্থিত ছিল, সেজন্য তাহাদের প্রতিভা লোক-লোচনের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই। কিন্তু, না করিলেও, তাহারা যে অপেক্ষাকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, সর্ব্বত্র প্রণিধানযোগ্য না হইলেও, ইহা সত্য ও স্বাভাবিক।

সুতরাং, বুঝা যাইতেছে, ক্ষণজন্মার জন্ম আকস্মিক নহে। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের মূলধন সুকৃতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হন এবং সেই সুকৃতির জন্যই শুভযোগে জন্মগ্রহণ করেন। যে জাতকের শুভক্ষণে অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের অনুকূল অবস্থায় জন্ম, তিনি ক্ষণজন্মা। পৃথিবীর বহু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির কোষ্ঠী বিচার করিয়া জানা গিয়াছে, তাঁহাদের জন্ম-মুহূর্ত্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সেই বৈশিষ্ট্যই, উত্তরকালে তাঁহারা যে বড় হইবেন, তাহার ইঙ্গিত করিতেছে।

আজ আমরা যে মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিতে বসিয়াছি, তিনি যে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও তাঁহার জন্মতিথি এক ছিল। এইখানেই দেখিতে পাওয়া যায়, একের সুকৃতি তাঁহাকে পরম-যোগী সিদ্ধপুরুষ করিয়া তুলিয়াছে এবং অন্যের সুকৃতি তাঁহাকে বহু-জনমান্য কর্ম্মবীরে পরিণত করিয়াছে। অবশ্য, শুধু সুকৃতিই যে ইহ-জন্মের সম্বল, তাহা বলিতেছি না,—অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা

অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, পুরুষকারের সাহায্যে উভয়ে স্ব স্ব উদ্দিষ্ট পথে গমন করিয়া সার্থকতা অর্জ্জন করিয়াছেন, ইহাই আমাদের বক্তব্য। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি,—যে পুণ্যতিথিতে পরমহংসদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই তিথিতে চুণীলাল জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ-মাতৃকার কৃতী সন্তান আখ্যা লাভ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, নানা বিরুদ্ধযুক্তি থাকিলেও আমরা বলিব,—জন্মদিনের একটা মাহাত্ম্য আছে। হয়ত কেহ কেহ বলিবেন, ইহা ভিত্তিহীন সংস্কার মাত্র, কিন্তু উপায় নাই।*

ফলতঃ, কাহারও কাহারও মতে জ্যোতিষ অসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এমন বহুতর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যে ক্ষেত্রে তাহার ভবিষ্যদ্বাণী ফলপ্রসূ হইয়াছে,—ব্যর্থ যায় নাই। আরও কথা, উক্ত ব্যর্থতার জন্য জ্যোতিষের অসম্পূর্ণতাই যে শুধু দায়ী, তাহা নহে। সময়-নির্দ্দেশে ভ্রান্তি, গণনায় ভ্রান্তি ইত্যাদি ক্রটীর জন্য অনেক ক্ষেত্রে নানা ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয় ঘটে। সমগ্র জ্যোতিষের কথা ছাড়িয়া দিয়া, শুধু জন্মকোষ্ঠী সম্বন্ধে বলিব,—এমন দুই এক খানি কোষ্ঠী আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে, যাহাতে জাতকের সম্বন্ধে রাশিচক্র বিচার করিয়া যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা জাতকের জীবনে সংঘটিত হইয়াছে। অবশ্য, দুই এক স্থলে একটু আধটু বৈলক্ষণ্য যে নাই, তাহা বলি না। তবে আমাদের বোধ হয়, জন্মের ক্ষণ-নির্ণয়ে ক্রটী থাকার জন্য এবং জাতকের

* জন্ম-তিথি এক হইলেও, পরমহংসদেবের ও চুণীলালের জন্ম-লগ্ন এক নহে। সুতরাং, উভয়ের জীবনের ধারা বিভিন্নমুখিনী হইয়াছে।

জননী—ভগবতী

বর্ত্তমান জীবনে অনুষ্ঠিত কর্ম্মপরম্পরার পরিপাকস্বরূপ নানা ব্যাপারের জন্য, বৈসাদৃশ্য উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা জ্যোতির্ব্বিদ্ নহি, সুতরাং, অনধিকার চর্চ্চা না করিয়া, চুণীলালের কোষ্ঠিপত্রে লিখিত ও তাঁহার জীবনে সংঘটিত দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব।

এক কৌতুককর ঘটনার জন্য চুণীলালের জন্মমুহূর্ত্ত-নির্ণয়ে ত্রুটী হয় নাই। এস্থলে সেই ঘটনাটীর বিবৃতি বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১লা চৈত্র (ইংরাজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ, ১৩ই মার্চ্চ) বুধবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, তাঁহার মাতামহ ৺কাশীনাথ পাল মহাশয়ের শ্যামবাজারস্থ ২৪নং মহেন্দ্র বসু লেন ভবনে, বসুবংশ-গৌরব চুণীলাল ভূমিষ্ঠ হন। তখনও রাত্রির অন্ধকার পূর্ণভাবে অপগত হয় নাই, সবে-মাত্র পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ রক্তরাগরঞ্জিত। প্রসূতি আতুরগৃহে গেলেন ;— দুঃসহ প্রসব-বেদনার জন্য মাতাকে বেশী কষ্টভোগ করিতে হইল না,— এমন কি মৃৎপ্রদীপ পর্য্যন্ত জ্বালিয়া আনিবার অবসর সহিল না, সন্তান প্রসূত হইল! বোধ হয়, ইহাই বিধি-নির্দ্দেশ,—এখনই কুল-প্রদীপ উদ্ভূত হইয়া মাতার কক্ষ আলোকিত করিবে, মৃৎপ্রদীপের প্রয়োজনীয়তা কি! একদিকে নৈশ তমিস্রা অপসারিত করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন, অন্যদিকে বসুবংশ উজ্জ্বল করিবার জন্য আমাদের চুণীলাল অবতীর্ণ হইলেন, কি সুন্দর সমাবেশ!

কিন্তু এইখানেই দৈব-নির্দ্দেশের পরিসমাপ্তি হয় নাই। সময়-নির্ণয়ের সুবিধার জন্য কলিকাতায় বর্ত্তমানে মাত্র একবার বেলা এক ঘটিকার সময় তোপধ্বনি হয়। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দৈনিক

তিনবার করিয়া তোপ পড়িত,—ভোর সাড়ে চারিটায় একবার, বেলা একটায় একবার এবং ঋতুভেদে রাত্রি নয়টা বা সাড়ে নয়টায় একবার। গত মহাসমরের সময় হইতে, ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য ভোরের ও রাত্রির তোপ উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সেদিন সেই স্বর্ণমুহূর্ত্তে চুণীলাল ভূমিষ্ঠ হইলেন, আর দিগন্তের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া, প্রভাতের তোপধ্বনি তাঁহাকে অভ্যর্থিত করিল! তাঁহার মাতামহী তখন সেই সূতিকাগৃহে তাঁহার মাতার পরিচর্য্যা করিতেছিলেন, তোপধ্বনি শুনিবামাত্র সহসা বলিয়া উঠিলেন;—"ওরে তোর ছেলে নিশ্চয় রাজা হবে, ব'লে রাখ্ছি!" কল্যাণাকাঙ্ক্ষিনী মাতামহীর মুখ-নিঃসৃত এই রহস্যসূচক ভবিষ্যদ্বাণী হয়ত তখন তাঁহার ব্যথা-কাতরা কন্যার সান্ত্বনাচ্ছলে প্রযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু উত্তরকালে চুণীলালের উপর উপর্য্যুপরি বর্ষিত রাজসম্মান বৃদ্ধার সে ভবিষ্যদুক্তি সার্থক করিতে এতটুকু কার্পণ্য করে নাই। আমাদের বোধ হয়, বৃদ্ধার মুখ দিয়া বহির্গত হইলেও, ইহা দৈব-ইঙ্গিত; এই ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণী। তাই তাহা চুণীলালের আতুরা মাতার শুধু সাময়িক সান্ত্বনার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই,—তিনি যে স্বর্ণকুক্ষি তাহার প্রমাণ পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে গরিমাপূর্ণ পরম প্রসন্নতালাভের অবসর দান করিয়াছিল।

চুণীলালের কোষ্ঠিপত্রও তাঁহার মাতামহীর ভবিষ্যদুক্তিকে সমর্থন করিয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাঁহার কোষ্ঠীতে লিখিত সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা না করিয়া, পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, তাঁহার রাশিচক্র ও তন্নিহিত কতিপয় বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক লক্ষণের উল্লেখ করিয়া, আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

চুণীলালের
রাশিচক্র

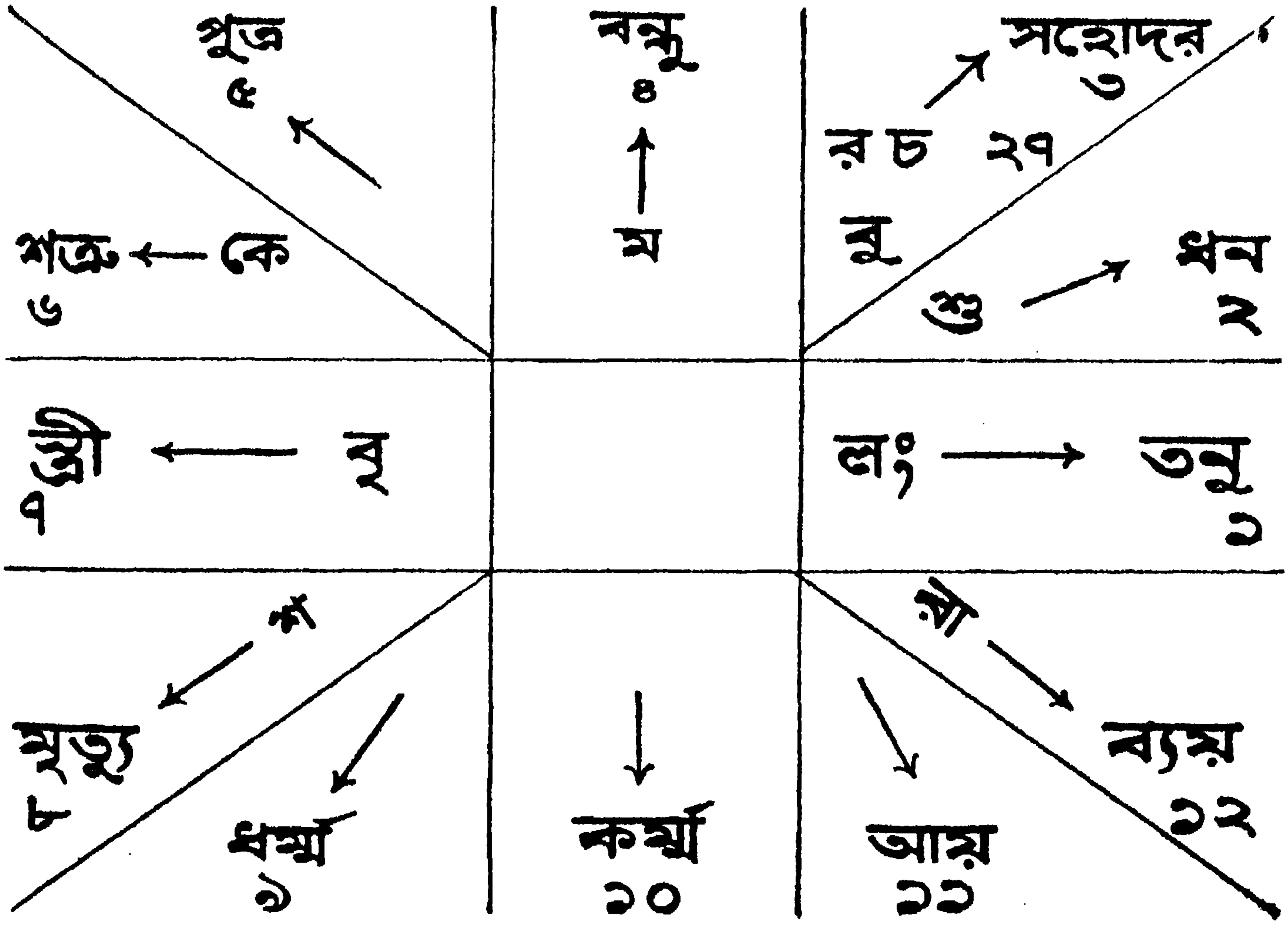

চুণীলাল রেবতী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাহাতে জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শত্রুজয়ী, বিদ্বান্, রাজ-সেবক ও তেজস্বী হয়। উক্ত রাশিচক্র মতে জাতকের বৃহস্পতি তুঙ্গী ও কেন্দ্রী, সুতরাং, জাতক সর্ব্বকার্য্যে অপরাঙ্মুখ, কুলোজ্জ্বলকারী, সুখী, শান্ত, সর্ব্বগুণযুক্ত, ধার্ম্মিক,

রাজা বা মন্ত্রীর ন্যায় শক্তিসম্পন্ন ও কর্ম্মের জন্য কিয়দ্দিন বিদেশ-বাসী হইবেন। অধিকন্তু, উক্ত গ্রহের লগ্নদৃষ্টি থাকায়, জাতকের পণ্ডিত, শান্তমূর্ত্তি, শাস্ত্রদর্শী, দীর্ঘজীবী, শুচিতাসম্পন্ন, সৎস্বভাব ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবার কথা। আবার কুজ বা মঙ্গল মূলত্রিকোণস্থ (স্বস্থানে অবস্থিত) হওয়ায়, জাতক শ্রীমান্, ধাতুবিদ্, রসায়নবিদ্, বহুবান্ধব ইত্যাদি হইবেন। দশমাধিপতি শুক্র ধনস্থানে মিত্রক্ষেত্রে আছেন, তাহাতে জাতক অশেষ কীর্ত্তিসম্পন্ন ও শক্তিশালী হন। আবার বুধ, চন্দ্র ও শুক্রের দৃষ্টি শত্রু (ষষ্ঠ) স্থানে থাকায়, শত্রুঞ্জয়-যোগ রহিয়াছে। তৃতীয় বা সহোদরস্থানাধিপতি বৃহস্পতি সপ্তমে কেন্দ্রী হওয়ায়, সহোদর স্থানে পূর্ণদৃষ্টি অতীব শুভসূচক। পুত্রস্থানে শুক্রের ত্রিপাদ দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া, জাতকের প্রথমে কন্যালাভ* এবং পুত্র বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইবার

---

* কোষ্ঠিপত্রের এই স্থানে গণনার একটু অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। চুণীলালের প্রথমে পুত্র হয় এবং ৮ মাস বয়সে মারা যায়। রাশিচক্রের ৫ম স্থান পুত্র ও বুদ্ধির স্থান। ইহার অধিপতি গ্রহ গুরু (বৃহস্পতি), কুজ ও ভৃগু (শুক্র) পুত্রকারক। যদি ঐ স্থান শুভগ্রহযুক্ত হয়, কিম্বা ঐ স্থানে কোনও শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে শুভ হয় অর্থাৎ সুবুদ্ধি ও সুপুত্র লাভ হয়। যদি ৫ম স্থানাধিপতি মিত্রবলযুক্ত হয় বা গুরুকর্তৃক দৃষ্ট হয় এবং ঐ গুরু নবম অর্থাৎ ভাগ্যস্থানকে দর্শন করেন, তবে নিশ্চিত সুপুত্র হয়। নচেৎ, প্রথমে কন্যালাভ ঘটে, অথবা ১ম পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাহু ও কেতুর দৃষ্টি পুত্রস্থানে পতিত হইলেও পুত্রনাশ হয়। চুণীলালের রাশিচক্রে রাহু ১২শ স্থানে ও কেতু ৬ষ্ঠ স্থানে অবস্থিত থাকায়, উভয় গ্রহের দৃষ্টি পুত্রস্থানে পড়িয়াছে, সেইজন্য তাঁহার প্রথম পুত্রের নাশ ঘটিয়াছে। চুণীলালের দ্বিতীয় সন্তান কন্যা। (পণ্ডিত শশধর বাচস্পতি-কৃত জ্যোতিষকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।)

লক্ষণ সূচিত হইতেছে। ভার্য্যাস্থানে বৃহস্পতির অবস্থিতিবশতঃ পত্নীভাগ্য সুন্দর এবং মৃত্যুস্থানে শনিগ্রহ অবস্থিত থাকায়, জাতকের বিদেশে সজ্ঞানে ধর্ম্মচিন্তা করিতে করিতে মৃত্যু নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবৃতি হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়, পূর্ব্ব-জন্মানুষ্ঠিত কতটা সুকৃতির অধিকারী হইয়া, কত মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে চুণীলাল ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে, কিরূপ অবস্থার মধ্য দিয়া, কিরূপ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, তাঁহার সুকৃতি-সঞ্জাত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে এবং মেঘ-মুক্ত রবি-দ্যুতির ন্যায় তাঁহার জীবন গরিমোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বংশপরিচয়

বীজ ভাল হইলেই বৃক্ষ ভাল হইবে বলিলে ঠিক বলা হয় না, মধ্যে একটু গলদ থাকিয়া যায়। ঊষর ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত হইলে অঙ্কুরোদ্গম হয় না,—সে বীজের উৎকৃষ্টতা সে স্থলে ব্যর্থ; পক্ষান্তরে, ক্ষেত্র যদি উর্ব্বর হয়, তাহা হইলে তাহাতে নিকৃষ্ট বীজেরও অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে। ফলতঃ, উৎকৃষ্ট বীজ যদি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে উপ্ত হয়, তবে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বৃক্ষ উদ্ভূত হইয়া থাকে, অবশ্য, তাহার সহিত প্রাকৃতিক আনুকূল্যেরও আবশ্যকতা আছে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, উৎকৃষ্ট বীজ সেখানেই সার্থক, যেখানে উৎপাদিকা শক্তি আছে।

বর্ত্তমান যুগে অবিসংবাদী সত্য বলিয়া বিবেচিত না হইলেও, অধিকাংশস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, মহৎ বংশেই মহতের জন্ম হয়। পাশ্চাত্য-সভ্যতাদৃপ্ত গণতান্ত্রিকতার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রুষ-সম্রাটের শোচনীয় পরিণাম এবং এই সেদিনকার ঘটনা, স্পেন-সম্রাটের রাজ্যচ্যুতি প্রভৃতি ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, আজ আমরা আভিজাত্যকে বড় একটা আমল দিতে চাহিতেছি না। শুধু আমরাই বা কেন,—জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই অভিজাত-ধ্বংসের প্রলয়-বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে! অবশ্য, এই বিপ্লবের জন্য অভিজাতবংশও যে দায়ী নহে, তাহা বলিতেছি না, বরং

বেশী দায়ী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আভিজাত্যে ব্যভিচার আরম্ভ হইলে, শক্তিমান্ শক্তির অপব্যবহার করিলে, ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া থাকে, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। তাহা হইলেও, আমরা বলিতে বাধ্য, আভিজাত্যের একটা মহিমা আছে। বনস্পতির বীজ হইতেই বনস্পতির জন্ম হয়। কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রম ঘটিলেও, আভিজাত্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

তবে মহৎ ও অভিজাত সংজ্ঞা দুইটীর তাৎপর্য্য ও তাহাদের মূলদেশ কোথায় গিয়া স্পর্শ করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিলে, অনেক গোল মিটিয়া যায়। মানবজাতি ক্রমোন্নতিশীল এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার মহত্ত্ব বা আভিজাত্য পরবর্ত্তী কালের ঘটনা। হীনতার মেঘাবরণ ভেদ করিয়া, কোন্ দিন কোন্ স্বর্ণমুহূর্ত্তে এক বা একাধিক জ্যোতিষ্ক সমুদিত হইয়া, কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই আজ অভিজাত বংশ বা বনিয়াদী ঘর বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং, সাধারণের মধ্যেই অসাধারণত্ব সুপ্ত অবস্থায় আছে; সুযোগ পাইলেই একদিন না একদিন হীন যে সে মহৎ হইতে পারে, নীচবংশও অভিজাত বংশে পরিণত হইতে পারে। সাধারণের সুপ্তি-ভঙ্গ একান্ত অসম্ভব নহে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা পাশ্চাত্যবাদ বলিয়া অনুমিত হইলেও, প্রাচ্যও ইহাকে অস্বীকার করে না। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগৎ ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া ধাবিত হইতেছে, পূর্ণ পরিণতির পানে। এই পূর্ণ পরিণতির পরিণাম ধ্বংস বা প্রলয় এবং এই প্রলয়ের পরবর্ত্তী অবস্থা নূতন সৃষ্টি। আমরা বলি, এই নূতন সৃষ্টিতেই ভাগ্যবান্ বা প্রতিভাশালীর উদ্ভব হয়, এবং তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ অভিজাত

বলিয়া কীর্ত্তিত হন ও সেই প্রতিভাশালী ভাগ্যবানের বংশ মহদ্বংশ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সে বংশে অকৃতীর উদ্ভব যে হয় না তাহা বলি না, তবু বনিয়াদ্ ভাল বলিয়া পরিবেষ্টনীর গুণে সাধারণতঃ সে বংশে কৃতীর উদ্ভবই স্বাভাবিক।

আমাদের চুণীলাল যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বংশ অতি প্রাচীন মহদ্বংশ,—বাঙ্গালার অন্যতম অভিজাত বংশ।* পঞ্চ-গৌড়াধিপতি আদিশূর বা শূরসেনকর্ত্তৃক পুত্রেষ্টিক্রিয়ার জন্য কান্যকুব্জ হইতে আনীত বেদবিধিজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণের অনুযাত্রী পঞ্চ কায়স্থের অন্যতম দশরথ বসু হইতে চুণীলাল অধস্তন ষড়্‌বিংশ পুরুষ। 'বসুবংশ দাতা' এ' খ্যাতি আজিকার নহে। দশরথ হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ মুক্তিরাম প্রথমে মাহিনগরে আসিয়া বাস করেন। এই মাহিনগর বর্ত্তমানে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত। মুক্তিরামের বংশধরগণ 'মাহিনগরের বসু' নামে খ্যাত। ইঁহার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ মহীপতি, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুবুদ্ধি রায় বলিয়া কোনও কোনও ঐতিহাসিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে, রাজা গণেশ-প্রমুখ যে সকল রাজনীতি-কুশল অমিত-শক্তিশালী হিন্দু বাদসাহ-দরবারে অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সুবুদ্ধি রায় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পৌত্র গোপীনাথ পুরন্দর খাঁ (প্রভাকর?) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি হুসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্র

* পরিশিষ্ট (ক)—বংশলতিকা দ্রষ্টব্য।

পিতা—ঃ দীননাথ বসু

হরিহর খাঁও পিতৃ-কৃতিত্বের অধিকারী হন। কিন্তু শুধু রাজকার্য্য-পরিচালনায় তাঁহাদের বা তাঁহাদের উত্তর পুরুষের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় নাই। মাহিনগরের বসুবংশ এক সময় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের মুখপাত্র বা সমাজপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের বদান্যতা, দেশ-হিতৈষণা, ধর্ম্ম-নিষ্ঠতাও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিয়াছে। হরিহর খাঁর অধস্তন বাসুদেব, রমানাথ, নয়ানচাঁদ (চাঁদ বসু) প্রভৃতি উক্তবিধ নানা সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া, প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের পানে নেত্রপাত করিলে দেখা যায়, প্রতিভার বরপুত্র ডাঃ জগদ্বন্ধু বসু, মনস্বী প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, অনারেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও রসরাজ অমৃতলাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই মাহিনগরের বসুবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমাদের পরম গৌরবস্থল, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সুসন্তান শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও ঐ মাহিনগরের বসুবংশসম্ভূত।

হরিহর খাঁর নিম্নতন অষ্টম পুরুষ রামকানাই বসু কর্ম্ম-সূত্রে কলিকাতায় আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথের পুত্র ভোলানাথ এবং এই ভোলানাথের পুত্র দীননাথ আমাদের চুণীলালের পিতৃদেব। দীননাথ শ্যামবাজার মহেন্দ্র বসু লেন নিবাসী ৺কাশীনাথ পাল মহাশয়ের একমাত্র কন্যা ভগবতীর পাণিগ্রহণ করেন। পাল মহাশয়ের পুত্রসন্তান ছিল না, সুতরাং, কন্যা ভগবতী তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হন। কাশীনাথ তৎকালে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ

ছিলেন। বহু পরিবার না থাকায়, একটু সচ্ছল ভাবেই তাঁহার দিনপাত হইত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মাহিনগরের বসুবংশের সে সুদিন আর নাই, কালক্রমে সংসারের বিরাটত্ব এবং তৎসূত্রে বৈষয়িক মনোমালিন্য ইত্যাদি নানা সংঘর্ষে মহাসৌধ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, সেইজন্য রামকানাই কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও সংসারের পতন আরম্ভ হইলে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার পুনরুত্থান সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। হয়ত, দীর্ঘ দিনের পর সৌভাগ্য-সূর্য্যের পুনরুদয় হয়, কিন্তু তাহা অতি বিরল। রামকানাই কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেও, অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন নাই; বরং, উত্তরকালে দৈন্য এত ভীষণ হইয়া উঠে যে, তাঁহার প্রপৌত্র দীননাথকে অবশেষে দালালীর কার্য্যে অতি কষ্টে জীবিকার্জ্জন করিতে বাধ্য হইতে হয়।

কিন্তু দীননাথের এই দীনতাই বোধ হয়, ভগবানের অভীপ্সিত ছিল, অথবা দীনতার ছদ্মবেশে ভগবানের আশীর্ব্বাদ দীননাথের ভাগ্যে বর্ষিত হইয়াছিল! যেমন তরঙ্গসঙ্কুল রত্নাকরের তিমির-গর্ভে রত্নরাজির সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহার অর্থকৃচ্ছ্রতার ভীম-ভ্রূকুটীর মাঝখানে তিনি সেইরূপ বংশোজ্জ্বলকারী পাঁচটী রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই পঞ্চরত্ন দীননাথের পঞ্চ পুত্র,—অমৃতলাল, চুণীলাল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ। অমৃতলাল গভর্ণমেণ্ট পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগে সামান্য কেরাণীর কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, স্বীয় কার্য্যকুশলতায় ক্রমে ক্রমে একাউণ্ট্যাণ্ট্ জেনারেলের পার্শন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট্ পদে উন্নীত হন

এবং 'রায় সাহেব' খেতাব লাভ করেন। চুণীলালের কৃতিত্বের বিষয় এ পরিচ্ছেদে বলিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চম্পারণ-জেলাস্থ মতিহারীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। গিরীন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী এবং কনিষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের অধীনে ডাক্তারী করিয়া, বর্ত্তমানে কলিকাতার নিজবাটীতে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইতেছেন। সুতরাং, দীনতাই যে দীননাথের সংসারে ভগবানের আশিস্-স্বরূপ হইয়াছিল, ইহা একেবারেই অত্যুক্তি নহে।

দীননাথের প্রথম সন্তান কন্যা। তৎপরে আরও দুইটী কন্যা পর পর জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যাবস্থায় মারা যায়। তৎপরে অমৃতলালের জন্ম হয়। চুণীলাল দীননাথের দ্বিতীয় পুত্র,—তিনি অগ্রজ অমৃতলাল অপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

দীননাথ বহু পুত্র-কন্যার পিতা হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাঁচপুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া স্বর্গগত হন।

বাল্যজীবন

পূর্ব্বে বলিয়াছি, চুণীলালের মাতামহ কাশীনাথ পাল মহাশয়ের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না এবং পরিবারের সংখ্যাল্পতাই সাচ্ছল্যের হেতু ছিল। তাহা হইলেও, তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি কন্যার জন্য একমাত্র বসতবাটী ব্যতীত বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং, সামান্য দালালী করিয়া, বহু সন্তানের পিতা দীননাথকে কায়-ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। এমন কি, অভাবের জন্য, পুত্রদের গায়ে দিবার একখানির বেশী শীতবস্ত্র কিনিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। শুনিতে পাওয়া যায়, শীতকালে অমৃতলাল, চুণীলাল ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ তিন ভাই ঐ একখানি মাত্র গরম চাদর গায়ে জড়াইয়া পড়াশুনা করিতেন। তৎকালে একযোগে একাধিক ভ্রাতার বাহিরে যাইবার উপায় ছিল না, একান্ত প্রয়োজন হইলে পালাক্রমে বাটীর বাহির হইতে হইত।

কিন্তু শত দৈন্য সত্ত্বেও, দীননাথ বা তাঁহার স্ত্রী ভগবতী একদিনের জন্য ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন নির্ব্বিরোধ ও চিরশান্তিময় ছিল। ফলতঃ, দৈন্যকে তাঁহারা এমনভাবে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন যে, সে যেন ইচ্ছা করিয়াই,

তাঁহাদের প্রসন্নতার উপর হস্তক্ষেপ করিত না! এরূপ আদর্শ দম্পতির আদর্শ সন্তান সর্ব্বত্র সম্ভবপর না হইলেও, একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদের ভাগ্যে কিন্তু ভগবানের করুণা অজস্রভাবেই বর্ষিত হইয়াছিল।

চুণীলাল আদর্শ মাতা পিতা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা অতি বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। শিশুর মাতা শুধু শিশুর গর্ভধারিণী নহেন,—তিনি শিশুর বাল্যজীবন-গঠনকারিণী। যদি শিশুর শৈশব-শিক্ষা মাতার অঙ্কে সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে সে শিশুর ভাবীজীবন সাফল্য-মণ্ডিত হইবার সমধিক সম্ভাবনা। চুণীলালের মাতা অতীব ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন,—তিনি শিশু চুণীলালের চিত্তে যে ধর্ম্মভাবের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও ফুল-ফলে সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন দিন গিয়াছে, আহার জুটে নাই,—তথাপি, তিনি সন্তানদের সংশিক্ষা ও বিদ্যার্জ্জনের পক্ষে যাহাতে কোনও প্রকার ক্রটী না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ছেলেদের পাছে অযত্ন হয়, পাছে তাহারা অসৎ সংসর্গে মিশিয়া অসৎ হইয়া যায়, তাহার প্রতিষেধ-কল্পে, শত দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও, তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি একটী ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভৃত্যের কায ছিল, সর্ব্বদা ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে থাকা, বিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দেওয়া ও ছুটীর পর তথা হইতে লইয়া আসা। সেজন্য তাঁহাকে সংসারের সমস্ত কায নিজ হস্তেই করিতে হইত। তিনি একযোগে সংসারের গৃহিণী ও পরিচারিকা ছিলেন এবং পরিচর্য্যায় তাঁহার একটি দিনের জন্যও আলস্য বা বিরক্তি ছিল না।

স্নেহশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও চরিত্রবান্ পিতাও চুণীলালের চরিত্র বিষয়ে

কম শক্তি সঞ্চার করেন নাই। দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট হইয়াও, তিনি কোনও দিন তাঁহার আভিজাত্যকে খর্ব্ব বা ভগবৎ বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই। তিনি যে মহৎ বংশের সন্তান এবং ভগবান যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্য, এই দুইটী কথা সকল সময় তাঁহার চিত্তে জাগরূক থাকিত। তিনি সত্যসন্ধ ছিলেন। সত্যের সরল পথে বিচরণ করিতেন বলিয়াই, বোধ হয়, দালালী-কার্য্যে তিনি বিশেষ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। হৃদয়ের দৃঢ়তার জন্য, ব্যর্থতাকে বরং আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, তবু কখনও উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। আমরা দেখিতে পাইব, চুণীলালের জীবনেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি অতি সুন্দর ভাবে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বাল্যে চুণীলাল বড় দুরন্ত ও একগুঁয়ে ছিলেন। তাঁহার মনে যখন যাহা খেয়াল হইত, শত বাধা সত্ত্বেও তিনি তাহা করিতে চেষ্টা করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, যখন তিনি দুরন্তপনায় বা একগুঁয়েমিতে একান্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেন, তখন নিবৃত্তির ভেষজরূপে, তাঁহার মাতামহী এই ঠাকুরের ছড়াটী আবৃত্তি করিতেন ;—

"ক কহেন কহ কহ কৃষ্ণ-কথা কহ,
কি কর্ম্ম করিলে ভাই পেয়ে মানব দেহ"— ইত্যাদি—

এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, বালক তন্মুহূর্ত্তেই দুষ্টামি ভুলিয়া গিয়া নিবিষ্টমনে এই ছড়া-পাঠ শ্রবণ করিত !

জীবে দয়া ছেলেবেলা হইতেই চুণীলালের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার মাত্র ৩।৪ বৎসর বয়স,—তাঁহার পিতা, মহাষ্টমীর দিনে বাগবাজারস্থ ৺নন্দলাল বসুর বাটীতে, তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া প্রতিমা

দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। সে সময় ঢোল-ঢক্কা-নিনাদে দিগন্ত মুখরিত করিয়া বলিদান হইতেছিল। বালক চকিত নেত্রে সমারোহ দেখিতেছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ছাগশিশুটীকে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া, শাণিত খড়্গে যে মুহূর্ত্তে তাহার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করা হইল,—অমনি বালক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং "ওকে কেটে ফেল্‌লে কেন—ওকে কেটে ফেল্‌লে কেন" বলিতে বলিতে হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া গেল! পূজাবাটীতে বালককে লইয়া মহা হুলস্থুল। প্রায় এক ঘণ্টা শুশ্রূষার পরে তাহার চৈতন্য সম্পাদিত হয়।

দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া, শৈশবেই চুণীলালের প্রাণে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির আভাস পাওয়া যায়! তাঁহার বয়স যখন ৪।৫ বৎসর, সেই সময় এক অতি দুঃস্থ গৃহস্থ তাঁহাদের মাতামহ দত্ত শ্যামবাজার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বালক তাঁহাদের অভাব দেখিয়া নিজেদের অভাব ভুলিয়া যাইত এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য মাতা ও দিদিমাকে এত উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিত যে, কিছু না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্থির হইবার উপায় থাকিত না।

চুণীলাল বাল্যজীবনে মাতৃ-কর্ত্তৃক মাত্র একবার প্রহৃত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ, মাতাকে না জানাইয়া পাড়ার একটী ছেলের সহিত তিনি ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিলেন এবং একটু বিলম্বে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। কুসঙ্গীর ভয় মাতার মনে অনুক্ষণ জাগ্রৎ থাকিত এবং ছেলেদিগকে নিজের মনের মত আদর্শ সন্তান করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, ইহাই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

অত্যধিক বা অসঙ্গত আদরে, অনেক সময় অনেক শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারময় হইয়া যায়। সাধারণতঃ, ঠাকুরমাতা, দিদিমাতাই এই ভাবের আদর বা আস্কারা দিয়া শিশুর পরকাল 'ঝর্‌ঝরে' করিয়া দেন। আমাদের সমাজে পিতামহী বা মাতামহীর সহিত পৌত্র বা দৌহিত্রের অতি মধুর সম্পর্ক। এই অতি মাধুর্য্যের সূত্র ধরিয়া, তাঁহারা তাহাদের শত আব্‌দার অনেক ক্ষেত্রে বিসদৃশ বা নীতি-বিরুদ্ধ হইলেও, তাহাদের পিতামাতার ইচ্ছার প্রতিকূলে, পূরণ করিয়া থাকেন। তাহার ফলে, তাহারা এমন 'আহ্লাদে' হইয়া উঠে যে, তাহাদের খেয়ালকে চরিতার্থ করা একান্ত কষ্টসাধ্য ও বিরক্তিকর হয়। অধিকন্তু তাঁহাদের রহস্যালাপের মধ্য দিয়া, শিশু নানা অশ্লীল কথা ও দুর্নীত আচরণ শিক্ষা করিয়া থাকে। কালক্রমে পিতৃ-মাতৃত্বের বা মাতৃ-মাতৃত্বের এই অপব্যবহার অচল হইয়া আসিলেও, আজিও পল্লীর কোনও কোনও সংসারে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

সে যুগে চুণীলালের বাল্যজীবনেও ঐ ভাবের ঠাকুরমাতার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয়া পিতামহীর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার যত কিছু আব্‌দার, অভিযোগ ঐ বৃদ্ধার সকাশেই হইত এবং বৃদ্ধাও প্রাণপণ চেষ্টায় নাতির তুষ্টি সম্পাদন করিতেন। কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার আদর অতিমাত্রায় নাতির উপর ন্যস্ত হইলেও, নাতির কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতামাতার ব্যক্তিত্বকে পরাস্ত করিতে পারে নাই ; বরং, নাতির একগুঁয়েমি তৎকর্ত্তৃক প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের তেজস্বিতার ইঙ্গিতে, ভবিষ্যতের শতবাধা-ব্যর্থকর অমিত-শক্তি-সঞ্চয়ের অবসর লাভ করিয়াছিল। তাহা হইলেও, চুণীলাল তাঁহার সেই নিঃস্বার্থ-মমতাময়ী

ঠাকুরমাতাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার অসমাপ্ত আত্মচরিতের একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন:—

"I must say with every respect and gratitude for the unselfish love she bore for me, that some of her loose lessons took a firm root in my young impressionable mind and in my after-life, I had sometimes to struggle hard to get myself freed from their thraldom."

অর্থাৎ আমার প্রতি তাঁহার নিঃস্বার্থ ভালবাসার জন্য, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমি বলিতে বাধ্য, তাঁহার কতকগুলি অসৎ শিক্ষা আমার সুকুমার চিত্তে এত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, উত্তরকালে তাহার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে আমাকে সময় সময় অতি কঠোর আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে।

বিদ্যারম্ভ

চুণীলালের বিদ্যারম্ভের ইতিহাস বিবৃত করিতে আমাদিগকে বেশী ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। কেন না, ইংরাজি ভাষায় লিখিত তাঁহার অসম্পূর্ণ আত্মজীবনীতে তদ্বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু, তাহা হইতে অতীত যুগে সহরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় রীতি-নীতি এবং তৎসূত্রে বহুতর জ্ঞাতব্য তথ্যের একটী সুন্দর বিবৃতি পাওয়া যাইবে। এজন্য এখানে তাহার মর্ম্মানুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ—

"পঞ্চমবর্ষ বয়সে হিন্দু সন্তানের বিদ্যারম্ভ হয়। পাশ্চাত্যের পিতামাতা সে বয়সে সন্তানকে খেলানা হইতে নিবৃত্ত করিয়া, শিক্ষালাভের ন্যায় দুরূহ বৃত্তিতে নিয়োজিত করেন না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে, শিশু চতুর্থ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে, দ্বাদশ মাসের মধ্যে কোনও শুভদিনে তাহার বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। সেদিন কুলপুরোহিত গৃহ-দেবতা ও বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতীর অর্চ্চনার পর, স্নান-পূত ও নববস্ত্র-পরিহিত শিশুকে হাতে-খড়ি দিয়া থাকেন। শিশুর হাতে ধরাইয়া খড়ি সাহায্যে গোময়লিপ্ত মেঝের উপর বর্ণমালার প্রথম পাঁচটী অক্ষর লিখাইয়া দেওয়া হয়। সে পবিত্র দিনে শিশুকে মাত্র পরমান্ন খাইতে হয়। ফলতঃ, এই দিনে শুচিতা-পালন খুবই

উচিত। কেননা, এই অনুষ্ঠান হইতে শিশুর কোমল চিত্তে এই ধারণা জাগিয়া উঠে যে, জীবনে সব চেয়ে লোভনীয় বস্তু বিদ্যা! হাতে খড়ির পরই সব শিশুকে অবশ্য পাঠশালায় দেওয়া হয় না,—ছয় মাস, এক বৎসর পরে প্রকৃতপক্ষে শিশুর বিদ্যারম্ভ হয়।

"হাতে খড়ির পর যথাকালে আমি পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইলাম। পাঠশালা বাঙ্গালার প্রাচীন প্রথানুযায়ী বিদ্যাগার। একমাত্র শিক্ষক বা গুরুমহাশয় হইলেন তাহার সর্ব্বেসর্ব্বা। শিক্ষা-বিষয়ক সব কিছু-কিছু তিনি জানেন বলিয়া সাধারণের ধারণা। সেকালে তাঁহারা কিন্তু প্রায়ই স্থূলবুদ্ধি ও ছাত্র-পিটানো পণ্ডিত ছিলেন। সহরে ইঁহাদিগকে আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে পাড়াগাঁয়ে অনেক স্থানে এখনও তাঁহারা বিরাজ করিতেছেন, যদিও পূর্ব্বের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তাঁহাদের আর নাই। গুরুমহাশয় সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-সন্তান,—ব্রাহ্মণেতর গুরু-মহাশয় খুব কম দৃষ্ট হইত। তিনি ছাত্রদের নিকট ছিলেন শিক্ষকের বেশে বিভীষিকা!

"আমাদের পাঠশালা সকালে ও বৈকালে বসিত। হাজিরার বিশেষ কিছু কড়াকড়ি ছিল না। গুরুমহাশয় যথাকালে উপস্থিত হইয়া, ছাত্রদের উপর গায়ের জোর দেখাইয়া ও গলাবাজি করিয়া আসর সরগরম রাখিতেন। নিকটে আর কোনও বিদ্যালয় না থাকায় আমাদের এই পাঠশালাটী ছিল 'সবেধন নীলমণি'! ছাত্রদের শ্রেণী হিসাবে এক আনা হইতে চার আনা অবধি দক্ষিণা ছিল এবং তাহাই কুড়াইয়া একুনে ১০৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা অবধি গুরুমহাশয়ের মাসিক পাওনা হইত। তবে তাঁহার এক প্রকার পোষাইয়া যাইত। পূজা-

পার্ব্বণ বা বিবাহাদি ব্যাপারে ছাত্রদের, বিশেষতঃ, অবস্থাপন্ন ছাত্রদের বাটী হইতে যে সিধা পাওনা হইত, তাহা মোটামুটী বেশ বলিতেই হইবে। আমাদের গুরুমহাশয় ভারি 'গুড়ুক-খোর' ছিলেন। হুকাটী প্রায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার বাম-হস্তে বিরাজ করিত,—আর দক্ষিণ হস্তে থাকিত একগাছি বেশ মোটা বেত্র-দণ্ড। বেচারা বালকদের পিঠে তাহার মধুর স্পর্শ-সুখ ন্যায়তঃই হউক, আর অন্যায়তঃই হউক, প্রভুর অভিরুচি-ক্রমে প্রায়ই অনুভূত হইত! আমার এই প্রথম গুরু ছিলেন, এক অতি ভয়ানক প্রকৃতির লোক। ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার সান্নিধ্য অতি বিপজ্জনক ছিল। সাধারণ অবস্থায় লোকটী কিন্তু নিতান্ত মন্দ ছিলেন না,—বেশ সদয় ব্যবহার করিতেন এবং আদরও করিতেন, যদিও কোন অবস্থাতেই ছেলেদের প্রীতিপাত্র বা প্রীতিযোগ্য হইতে পারেন নাই। শিক্ষকতাও তিনি মন্দ করিতেন না। কিন্তু নৈতিক চরিত্র তাঁহার সুবিধাজনক ছিল না,—সুরাদেবীর উপাসনা করেন বলিয়া তাঁহার নামে কাণা-ঘুষাও চলিত। আর ইহা কিন্তু খুব সত্য কথা, তিনি আমাদিগকে আমাদের পিতামাতার অজ্ঞাতসারে, তাঁহার সেবন জন্য তাম্রকূট উপঢৌকন আনিবার ইঙ্গিত করিতেন। বলা বাহুল্য, যাহারা তাঁহার এই তামাকু-সরবরাহ-ব্যাপারে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিত, তাহারা তাঁহার করুণার ছায়াতলে আশ্রয়লাভ করিয়া ধন্য হইত।

"মাদুরে জড়ানো তালপাতার পাততাড়ি বগলে আমরা পাঠশালায় যাইতাম। এখনকার মত তখন কাগজের এত প্রচলন ছিল না। হাতে তৈরী সাদা বা হল্‌দে রঙের তুলোট কাগজ তখন বাজারে পাওয়া যাইত এবং তাহাতে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররাই লিখিত। তালপাতায়, শরের

কলমে, বাঙ্গালা কালিতে আমি প্রথমে লিখিতে শিখি,—তাহা কিন্তু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে মোটেই বাধাস্বরূপ হয় নাই!

"আমাদের কোনও সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশীর পূজার দালানে আমাদের পাঠশালা বসিত,—তিনি সেজন্য কিছু ভাড়ার দাবি করিতেন না। মধ্যে আমাদের নিজের পূজার দালানে এই পাঠশালা বসে, সেজন্য আমি গুরুমহাশয়ের একটু কৃপাপাত্র ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে আমি কখনও তিরস্কৃত বা তাঁহার বেত্রের আঘাত দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। অবশ্য, গর্ব্বপ্রকাশ হইলেও, আমাকে সত্যের খাতিরে বলিতেই হইবে যে, আমি মন্দ ছেলে ছিলাম না—মন দিয়া পড়াশুনা করিতাম।

"সে সময়ে আমাদের প্রধান পাঠ্যপুস্তক ছিল,—'শিশুবোধক'। বর্ণপরিচয়ে ইহার আরম্ভ এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকটী সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে ইহার সমাপ্তি। এই পুস্তকে বর্ণিত দাতাকর্ণের উপাখ্যানে ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণুর ক্ষুন্নিবৃত্তি মানসে, কর্ণের একমাত্র পুত্র বৃষকেতুর মুণ্ডচ্ছেদ ইত্যাদি ব্যাপার পাঠ করিয়া, সেদিন প্রাণে যে স্পন্দন অনুভব করিয়া ছিলাম, আজ বৃদ্ধ বয়সে তাহার স্মৃতি আমার অন্তর হইতে মুছিয়া যায় নাই। হিন্দুর স্বর্ণযুগের আদর্শ আত্মত্যাগ ও অতিথি-সৎকারের ইহা যে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত,—ইহা জীবনে ভুলিবার নহে।

"সেকালে মানসাঙ্ক ও শুভঙ্করী শিক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। শতকিয়া, কড়াকিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত নামতা অবধি আমাদিগকে কণ্ঠস্থ করিতে হইয়াছিল। জমাবন্দী, মণকষা, কড়িকষা, মাসমাহিনা প্রভৃতি আর্য্যাসহ আমাদের আয়ত্তে ছিল। কোনও কোনও

বিষয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় না হইলেও, ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনে শুভঙ্করী-শিক্ষার সার্থকতা আছে। এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত অনেকেই বাজারের হিসাব রাখিতে গিয়া, অঙ্কপাতে এমন শোচনীয় ভুল করেন যে, দেখিলে দুঃখ ত হয়-ই, হাসিও পায়। শুভঙ্করী শিক্ষার সুযোগের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। বর্ত্তমান যুগে এই উপেক্ষিত বিষয়টীর পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ইহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষ্য স্থাপন গার্হস্থ্যজীবনের পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়।

"আমাদের সময়ে পাঠশালায় বেঞ্চির ব্যবহার ছিল না। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাদুরে বসিয়া লিখিতাম, পড়িতাম, অঙ্ক কষিতাম। অমিশ্র ও মিশ্র যোগ-বিয়োগ ছিল আমাদের পাটীগণিত শিক্ষার সীমা। এই পর্য্যন্ত অঙ্ক শিখাইতে পারেন, এরূপ গুরু লাভ তখনকার দিনে সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। ইতিহাস, ভূগোল পাঠশালায় পড়া হইত না। ২।৩ বৎসরের শিক্ষায় সাহিত্য, ব্যাকরণ ও গণিতে প্রাথমিক জ্ঞান জন্মিত। শ্রেণী-অনুযায়ী ছাত্রদের বসিবার কোনও বালাই ছিল না। সব ছাত্র একত্র ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া, একযোগে উচ্চ ও মধুর কণ্ঠে পড়া জুড়িয়া দিত এবং তাহাতে যে অবর্ণনীয় কোলাহলের সৃষ্টি হইত, এযুগের শিক্ষা-রীতিতে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহার ধারণা করা কঠিন। কিন্তু অভ্যাসবশে সেই কোলাহলের মধ্যে পড়া তৈরী করা কষ্টসাধ্য হইত না!

"তালপাতা লেখা শেষ হইলে, গুরুমহাশয়ের অনুজ্ঞাক্রমে, 'চিল্‌তা' বা কলাপাতায় লেখা আরম্ভ হইত। এই পাতা-লেখার ব্যবস্থাটা কিন্তু বেশ ভাল,—খুব অল্প ব্যয়সাধ্য। এক পাতায় পুনঃ পুনঃ লেখা চলে,

কেবল মাঝে মাঝে 'নেতি' বা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া পূর্ব্বের লেখা মুছিয়া লইতে হয়। কাগজে সে সুবিধা নাই। সেজন্য পাতা-লেখায় হাত পাকিলে সর্ব্বশেষে কাগজে লিখিবার ব্যবস্থা ছিল। সে যুগে ব্লটিং কাগজ আমরা চক্ষে দেখি নাই,—খড়ির গুঁড়ার পুঁটলী করিয়া আমরা শোষক কাগজের কায চালাইতাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তখনকার এত কষ্টসাধ্য ও অসুবিধাপূর্ণ লিখন-প্রণালীতে হস্তলিপি এত সুন্দর হইত যে, এখনকার বহু বি-এ, উপাধিধারীর হস্তাক্ষরকে লজ্জা দেয়!

"এই স্থলে দুষ্ট ছাত্রকে পাঠশালায় ধরিয়া আনার ইতিহাস একটু বলিয়া রাখি। গুরুমহাশয়ের দৌরাত্ম্যে পাঠশালা ভীতিকর স্থান ছিল। কাজেই, ছেলেরা একটু সুযোগ পাইলেই পাঠশালা কামাই করিত, দুষ্ট ছেলের ত কথাই নাই। কামাই করিলে অনুপস্থিত ছাত্রকে পাকড়াও করিয়া পাঠশালায় হাজির করিবার জন্য গুরুমহাশয় কর্ত্তৃক চারিজন ষণ্ডা-গোছের ছাত্রকে নিযুক্ত করা হইত। ইচ্ছাপূর্ব্বক গরহাজির বুঝিতে পারিলে এবং সহজে তাহাদের সহিত আসিতে না চাহিলে, তাহারা সেই ছাত্রকে জবরদস্তি পাকড়াও করিয়া পাঠশালায় আনিয়া উপস্থিত করিত। গুরুমহাশয় তখন তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। তখনকার শাসন-নীতিও ছিল ভীষণ। এক প্রকার শাস্তির নাম ছিল, "নাড়ুগোপাল"। অর্থাৎ ছাত্রকে নাড়ুগোপাল শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গিতে এক পা হাঁটু গাড়িয়া, অন্য পদ মাটীতে রাখিয়া এবং দুই হস্ত সম্মুখভাগে বিস্তার করিয়া বসিতে হইত। নাড়ু হিসাবে তাহার দুই হস্তে দুইখানি ভারী ইট দেওয়া হইত। সে এক লোমহর্ষক ব্যাপার! এই অবস্থায় অবস্থিতিকাল অপরাধের গুরুত্বানু-সারে গুরুমহাশয় কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হইত। তখনকার দিনে কথায়

কথায় শাস্তি, কথায় কথায় বেত্রাঘাত ব্যবস্থা ছিল। ছেলের বদমায়েসি সায়েস্তা করিতে, এ ভাবের শাস্তির ব্যবস্থা ত ছিলই,—তাহা ছাড়া, মাহিনা দিতে দেরী করিলে, এমনকি, গুরুমহাশয়ের জন্য তামাকু-সরবরাহে উদাস্য করিলে, রক্তনেত্র গুরুমহাশয়ের কঠোর বেত্র হইতে নিস্তার পাইবার উপায় ছিল না।

"পাঠশালাজীবনে একটী কিন্তু খুব লাভের বস্তু ছিল,—তাহা বালকদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি। সেরূপ অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এখনকার স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে দুর্লভ। বোধ হয়, শৈশব-সুলভ সরলতা ও সর্ব্বোপরি শিক্ষক মহাশয়ের ভীতি-উৎপাদক শাসন-নীতি তাহাদের মধ্যে এক-প্রাণতা স্থাপনের পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্য করিত। তাহা ছাড়া ছাত্ররা সকলে পরস্পরে প্রতিবেশি-সন্তান। তখনকার দিনে সহরেও প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে প্রাণের নৈকট্য ছিল। কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রতি প্রতিবেশীর মধ্যে, মামা, খুড়া, জ্যেঠা, দাদা ইত্যাদি মধুর আত্মীয়তাসূচক সংজ্ঞায় বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্বোধিত করা হইত। শুধু তাহাই নহে, বিপদে, সম্পদে, সর্ব্ব সময়েই সেদিনকার প্রতিবেশী বহু পরমাত্মীয় অপেক্ষা অধিকতর সহায়স্বরূপ হইত। সুতরাং, অন্তরঙ্গতা বলিতে যাহা বুঝায়, তখনকার দিনে তাহা আবাল-বৃদ্ধে সচ্ছলভাবেই পাওয়া যাইত,—এখন তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

"সাত বৎসর বয়সে পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের পল্লীতেই অবস্থিত এবং আমাদের বাটী হইতে ১০ মিনিটের পথ এক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমি ভর্ত্তি হইলাম। এই বিদ্যালয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত

হয়।* বর্ত্তমানে আমি ইহার প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। কারণ, আমার শিক্ষালাভের এই পুণ্য প্রতিষ্ঠানের সেবা ও উৎকর্ষ সাধন আমার জীবনের অন্যতম মুখ্য কর্ত্তব্য। আমাদের এই পাড়ার বহু প্রতিভাবান্ ও প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ে তাঁহাদের প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। সুশিক্ষার জন্য এই বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর দুই একটী ছাত্র পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত এবং গভর্ণমেণ্ট দত্ত বৃত্তি লাভ করিত। পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় এই বিদ্যাপীঠের প্রাণস্বরূপ।+ গত ৪৬ বৎসর ধরিয়া ইনি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারই আন্তরিক চেষ্টা, অক্লান্ত উদ্যম ও অতি উচ্চাঙ্গের সুন্দর শিক্ষাপদ্ধতির জন্য স্কুলটীর পরীক্ষাফল প্রতিবৎসর এত গৌরবজনক হয়। আমার ভর্ত্তি হইবার তিন বৎসর পরে তিনি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে প্রবেশলাভ করেন। প্রায় তিন বৎসর আমি তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করি। তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষাই আমার বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে প্রধান সহায়স্বরূপ হইয়াছে।

---

* বর্ত্তমান শ্যামবাজার এংলো ভার্ণাকুলার স্কুল।

+ পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় ইং ১৯২২ সালে স্বর্গগত হন। বাঙ্গালাভাষায় তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষক অতি বিরল। তাঁহার প্রণীত "সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ" আজিও বহু বিদ্যালয়ে পঠিত হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত স্থানীয় লোকে শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলকে "জগবন্ধু পণ্ডিতের বাঙ্গালা স্কুল" বলিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পণ্ডিত মহাশয়ের জীবিতাবস্থাতেই চুণীলাল এই আত্মজীবনী লিখিতে আরম্ভ করেন।

রসায়নাচার্য্য চুনীলাল

"প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় আমি দুই ক্লাশ উপরে উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু পুরস্কার পাইলাম না। সে বৎসরের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে গিয়া দেখি, অন্যান্য ছাত্রেরা রাঙা ফিতা বাঁধা কেমন সুদৃশ্য বইগুলি উপহার পাইল! আমি কিছু পাইলাম না,—কাঁদিতে লাগিলাম। আমার পিতা বলিলেন, আগামী বৎসর পরীক্ষাফল আরো ভাল হইবে এবং আমি পুরস্কার পাইব। কিন্তু তাঁহার সান্ত্বনাবাক্যে তখন আমার শান্ত হইবার উপায় ছিল না, বরং, কি এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখাবেগ আমাকে উত্তরোত্তর অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। আমার অবস্থা দেখিয়া সভাপতি মহাশয়ের দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বোধোদয়ের একখানি অর্থপুস্তক আমাকে ডাকিয়া উপহার দিলেন। সে সময় তিনি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা আজও আমার মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—বালকটীর পুরস্কার পাইবার জন্য এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ইহার ভবিষ্যৎকে মঙ্গলপূর্ণ করিবে, সুতরাং, উৎসাহ-দানের জন্য ইহাকে একটা কিছু উপহার দেওয়া দরকার। এই বইখানি হইল, আমার প্রথম পুরস্কার-লাভ, গুণানুসারে নহে, করুণার অভিজ্ঞানস্বরূপ। অবশ্য, পরবর্ত্তীকালে আমি বহু পুরস্কার পাইয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয়ের উক্তি আমার জীবনে ফলপ্রসূ হইয়াছিল এবং তাঁহার সেই কৃপাদত্ত পুরস্কারই যে প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে আমার পাথেয় স্বরূপ হইয়াছিল,—ইহা অস্বীকার করিবার অবকাশ নাই।

"আমাদের বাড়ীতে রামচরণ নামে এক বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল. জাতিতে 'কাহার'। সে ছিল আমার বাহন,—আমাকে কাঁধে করিয়া স্কুলে লইয়া

যাইত ও স্কুল হইতে লইয়া আসিত। সে যখন আমাকে তাহার বাম স্কন্ধে বসাইয়া, এক হাতে আমাকে ধরিয়া এবং অন্য হস্তে আমার শ্লেট ও বইগুলি লইয়া পথ চলিত, তখন রাস্তার লোক আমাদের গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত, কেহ বা হাসিয়া উঠিত। আমিও ভারী আমোদ অনুভব করিতাম। রামচরণকে আমার বড় ভাল লাগিত। আমাদের বাড়ীতে দিন কতক থাকার পর, বেচারী মারা যায়। আমার বেশ মনে পড়ে, তাহার মৃত্যুতে আমি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলাম। এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারি নাই। বয়ঃপ্রবীণ হইলেও সে যেন আমার বাল্যসখা ছিল!

"আমাদের ৫ম শ্রেণীতে একজন আধ-পাগলা পণ্ডিত ছিলেন, ছেলেরা তাঁহাকে মোটেই গ্রাহ্য করিত না। তাঁহার নাম ছিল সরস্বতী-প্রসাদ, তাই সকলে তাঁহাকে 'সরস্বতী পণ্ডিত' নামে অভিহিত করিয়াছিল। শিক্ষকতায় যত না থাকুক্, বেত্র-ব্যবহারে তাঁহার বেশ দক্ষতা ছিল। ক্লাশে বসিয়া তিনি হরদম নস্য টানিতেন। মাথাটী নেড়া,—একটী লম্বা টিকি,—কপালে চন্দন। পরিচ্ছদের মধ্যে ধুতি আর একখানি চাদর কাঁধের উপর। জুতা তিনি কখনও ব্যবহার করিতেন না। স্কুলে তাঁহার পদ-ধাবনের জন্য একটী ঘটী রক্ষিত ছিল। তাহাকে অন্য কেহ ব্যবহার করিতে পারিত না। কাজেই ঘটীটী তাঁহার চরণ-মার্জ্জনা করিলেও, তাহাকে কেহ মার্জ্জনা করিত না। ফলে, তাহার বর্ণ এত সমস্যাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে যে কোন্ ধাতু-নির্ম্মিত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ছিল। ছেলেরা কিন্তু বেশ মজা করিত। নূতন কোনও ছেলে স্কুলে প্রবিষ্ট হইলে, পণ্ডিত মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে,

তাহারা সেই ঘটীর জল বালককে পান করাইয়া দিত ও 'সরস্বতী পণ্ডিতের পাদকজল খেলে' বলিয়া উচ্চ হাসির সহিত হাততালি দিতে থাকিত। ক্লাশে আসিয়া বসিলেই, পণ্ডিত মহাশয়ের নাসাগর্জ্জন শ্রুত হইত। ছেলেরাও ছিল তেমনই দুর্ব্বৃত্ত! একদিন কোথা হইতে কয়েকটী ছাত্র একটী দড়ি সংগ্রহ করিয়া, সুষুপ্ত পণ্ডিত মহাশয়ের শিখা ও চেয়ারে মিলন-বন্ধন ঘটাইল। যাই নিদ্রাভঙ্গ ও মস্তকোত্তোলন, অমনই শিখাকর্ষণের মধুর অনুভূতি। পণ্ডিত মহাশয় ত একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! কিন্তু দুষ্কৃতের সন্ধান মিলা ভার। অগত্যা তিনি ক্লাশ-শুদ্ধ ছাত্রকে শাস্তি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। নিরুপায় নির্দ্দোষ ছাত্রগণ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের শরণাগত হইল। তিনি আদ্যোপান্ত ব্যাপার শুনিয়া ছাত্র-দিগকে মিষ্টমধুর ভৎর্সনা করিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়কে একান্তে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—'ছেলেদের এই দুর্ব্বৃত্তির প্রতিকারের একমাত্র উপায়,—ক্লাশে আপনার নিদ্রা-নিবৃত্তি!'

"ছাত্রজীবনে আমি নিতান্ত শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালকটী ছিলাম, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। দুষ্ট সতীর্থগণের সহিত মিশিয়া আমিও মধ্যে মধ্যে অনেক দুষ্টামি করিয়াছি। মনে পড়ে, সেজন্য আমি একবার উত্তম-মধ্যম শাস্তি পাইয়াছিলাম। গাধার টুপী পরাইয়া দুইটী ছাত্রদ্বারা আমার কাণ ধরাইয়া, সমস্ত শ্রেণীতে আমাকে প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। স্বীকার করিতে বাধ্য, আমার জীবনে সে শাস্তির সুফল ফলিয়াছিল। সেভাবের অপরাধ আমি আর কখনও করি নাই।

"এই বিদ্যালয়ে পাঠকালে আমি কাশিমবাজারের বর্ত্তমান মহারাজা

বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সতীর্থরূপে পাইয়াছিলাম।* আজিও বহু কার্য্যব্যপদেশে আমি এই দুই ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। ইহারা এখন এই বিদ্যালয়ের (বর্ত্তমানে এ, ভি, স্কুল, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়) ট্রাষ্টি। কুমারটুলীর বিখ্যাত মিত্র বংশের সন্তান সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত ধনদাচরণ মিত্র আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল, সেজন্য তাঁহার দ্বারা বইয়ের উপরে আমরা আমাদের নাম লিখাইয়া লইতাম। তিনি ক্লাশের প্রথম ছাত্র ছিলেন।

"আমি উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে পারি নাই, তাহার কারণ, পরীক্ষার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে পীড়িত হইয়া পড়ি। বয়স হইয়া যাইতেছে বলিয়া আমার পিতৃদেব আমাকে আর এই বিদ্যালয়ে না পড়াইয়া ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বাল্যে এই ভাবের প্রাথমিক শিক্ষায় আমার ভাবী শিক্ষাজীবনে খুব উপকার দর্শিয়াছিল। শুধু আমার কথাই বা বলি কেন, সে যুগের যে সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ঐরূপ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা পাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাহাতে সত্য সত্যই লাভবান্ হইয়াছেন। উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালার ছাত্রেরাই সাধারণতঃ গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতে পাকা হইয়া থাকে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কেহ কেহ বলেন বটে, ইহারা প্রায় ইংরাজিতে কাঁচা হয়, কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে সে উক্তিকে সমর্থন করা যায় না।"

---

* প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও অনারেবল্ মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু। চুণীবাবুর জীবিতাবস্থায় দুইজনই স্বর্গগত হন।

ছাত্রজীবন

চুণীলালের অসমাপ্ত আত্মজীবন-চরিতে, তাঁহার স্কুলের ছাত্রজীবনের কিয়দংশও লিপিবদ্ধ আছে। সহৃদয় পাঠকবর্গের কৌতূহল-নিবৃত্তি-মানসে তাহার মর্ম্মানুবাদ দিলাম :—

"আমি ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। স্কুলটী আমাদের ঐ বাঙ্গালা বিত্যালয়ের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল। তাহাতে এণ্ট্র্যান্স্ ক্লাশ অবধি পড়া হইত। আমাদের সময়ে এ ভাবের স্কুল অনেক ছিল। বাবু বামাচরণ দত্ত ছিলেন সে স্কুলের মালিক। অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার চেহারাও ছিল বেশ সুন্দর। লম্বা-চওড়া পুরুষ, মাথার চুলগুলি যত্নের সহিত বিন্যস্ত, নাতি-দীর্ঘ দাড়ি ও গোঁফ,—সুগঠিত সবল বাহু। হাতে প্রায়ই একগাছি লম্বা বেত,—কিন্তু তাহার ব্যবহার হইত কদাচিৎ। বেতখানি তাঁহার বসিবার ঘরেই থাকিত,—এবং মাত্র এই অবস্থিতিতেই ছাত্রদের ভীতি উৎপাদন করিত। ঘরে চেয়ারও ছিল না, টেবিলও ছিল না। মেঝের উপর সাদা ধব্ধবে বিছানা। তাহার উপর একটী তাকিয়া ঠেশ্ দিয়া বসিয়া তিনি স্কুলের খাতাপত্র দেখিতেন। ভারী গম্ভীর লোকটী ; যেমন দেহ,—তেমনই মন। খুব অল্প কথা কহিতেন, কিন্তু ঐ দুই-একটী কথাতেই শিক্ষক বা ছাত্র সকলেই তটস্থ হইত।

"ছাত্রসংখ্যা নিম্ন শ্রেণীতেই ছিল বেশী,—উচ্চ শ্রেণীতে খুব কম, দু'টী কি একটী। আমি এই স্কুলে চারি বৎসর পড়ি। আমাদের সময়েই ইহা শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসে এবং তদানীন্তন বড় লাট লর্ড নর্থব্রুকের নামানুযায়ী ইহার নর্থব্রুক স্কুল নামকরণ হয়। এই স্কুলে পাঠকালে বিচারপতি নর্ম্ম্যান ও তৎপরে লর্ড মেয়োর হত্যাকাণ্ড ঘটে। আমার বেশ মনে পড়ে, এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে সমগ্র সহরবাসীর মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয়। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক্ অফ্ এডিনবরার ও ১৮৭৫ অব্দে আমাদের মৃত সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের যুবরাজরূপে ভারতাগমন উল্লেখযোগ্য। তদুপলক্ষে আলোক-সজ্জা ও আমোদ-প্রমোদের স্মৃতি আজও আমার মনে বেশ জাগরূক আছে।

"এই স্কুলে আমি তিনজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তিকে শিক্ষকরূপে পাইয়াছিলাম। তাঁহারা উত্তরকালে শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া, রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন ও প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করেন। শুধু তাহা বলিলে যথেষ্ট হয় না, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালীর নাট্যজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন ইহলোকে নাই। দেবরাজ ইন্দ্রের রঙ্গালয়ে বোধ হয়, অভিনয়-পরিচালন-দক্ষ চিত্র-শিল্পী ও হাস্যরসিক অভিনেতার অভাব হইয়াছিল, তাই কালের আহ্বানে অমরধামে নীত হইয়াছেন এবং অননুকরণীয় কলা-কৌশলে দেব-দেবীকে মুগ্ধ করিতেছেন। প্রথম ব্যক্তি বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ-সজ্জাকর ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়। তাঁহার হস্তাক্ষর ছাপার অক্ষরকে লজ্জা দিত। প্রচ্ছদ পত্রে তাঁহার স্বর্ণাক্ষরযুক্ত আমার পুরাতন বইগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে। সে যুগে তাঁহার ন্যায় নাট্যাভিনয়ের শক্তিমান্ ব্যবস্থাপক আর ছিল না।

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

"দ্বিতীয় প্রখ্যাত ব্যক্তি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়। তিনি যেরূপ সরস ভঙ্গিতে শিক্ষাদান করিতেন, তাহাতে তিনি যে হাস্যরস অভিনয়ে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবেন, তাহা অনুভব করা অসম্ভব হইত না। অর্দ্ধেন্দুবাবুর ঘণ্টা কখন আসিবে ভাবিয়া, আমরা উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করিতাম। তাঁহার ঘণ্টা বেশ স্ফূর্ত্তিতে কাটিবে বা একটী ঘণ্টা বেশ ফাঁকি দেওয়া যাইবে, সেজন্য এ প্রতীক্ষা নহে; তাঁহার বুঝাইবার ভঙ্গি এত মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী ছিল যে, তন্ময়তার মধ্যে সময়টা অতি দ্রুত চলিয়া যাইত এবং নীরস বিষয় আয়ত্ত করিতে একটুও শ্রান্তি বোধ হইত না।

"তৃতীয় ব্যক্তি এখনও আমাদের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। তিনি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন্।* আমি ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই, রঙ্গালয়ের এরূপ তিনজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সান্নিধ্যে, সংসর্গে ও শিক্ষায়, রঙ্গভূমিকেই কেন আমি আমার জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লই নাই! এইখানেই বিশ্বাস করিতে হয়, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ-প্রদর্শক,—পরিচালক। অমৃত বাবু আমাদের ইংরাজি ভাষার শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের নিকট হইতে পড়া আদায় করিয়া লইতে

---

* পাঠক জানেন, রসরাজ অমৃতলাল আর ইহজগতে নাই। চুণীলালের জীবদ্দশায় ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি অমরধামে তত্রত্য রঙ্গালয়ে তাঁহার যোগ্য শূন্য স্থান পূরণ করিতে চলিয়া গিয়াছেন।

অতিশয় পরিপক্ক ছিলেন। কিন্তু ছেলেদের উপর তিনি ভারি সদয় ব্যবহার করিতেন। সত্য সত্যই তিনি তাহাদিগকে বড় ভালবাসিতেন এবং তাহাদের হিতসাধনে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি ছাত্রদের শাস্তির বা ছেলে-ঠেঙ্গানর পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার শিষ্ট ও সরস ব্যবহারে ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট ছিল যে, তাহাদের দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের জন্য বেত্রাঘাত ব্যবস্থার অবসর একদিনও আসিত না। অমৃতবাবু বর্ত্তমানে শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলের সেক্রেটারী। স্কুলটীর উন্নতির জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত নাই। আমার ছাত্রজীবনের উপদেষ্টাকে উক্ত বিদ্যালয়ের সেবাকল্পে পরম প্রার্থনীয় সহকারীরূপে পাইয়া, আজ আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু এবং স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর মৈত্র ও তাঁহার পুত্র দিগম্বর মৈত্র উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। আজ তাঁহাদের সেই সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের একনিষ্ঠতায় পরিপুষ্ট প্রতিষ্ঠান নব আদর্শে নব কলেবরে তাঁহাদের কীর্ত্তিকে অমর করিয়া বিরাজ করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটীর উৎকর্ষ ও সৌষ্ঠব সাধনের জন্য, পিতৃপদাঙ্কানুসারী অমৃতলালের প্রাণপাত পরিশ্রম ও একাগ্র সাধনার কাহিনী বিস্মৃত হইবার নহে। বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চ ষ্টার থিয়েটার তাঁহার নিকট যেরূপ ঋণী, শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলও সেইরূপ ঋণী।

"১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিট্যান্ ইন্‌ষ্টিটিউসানের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবিষ্ট হই ও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্র্যান্স্ ক্লাশে উঠি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাবু গিরীন্দ্রনাথ

মিত্র বি, এ, ইংরাজির অধ্যাপনা করিতেন। প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু ভবানীশঙ্কর দে এম, এ, মহাশয় আমাদিগকে অঙ্ক কষাইতেন! ভবানী বাবু বড় শান্ত ও ভীরু-প্রকৃতির লোক ছিলেন, সেজন্য সাধারণ ছাত্রেরা তাঁহাকে বড় গ্রাহ্য করিত না। তাহা হইলেও, গণিতে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন, স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় মহাশয়। তিনি অত্যন্ত দুরূহ শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন, সেজন্য শিক্ষকতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু, তিনি ভারি বাবু ছিলেন। তাঁহার বেশ-বিন্যাস ও বিলাসিতার জন্য ছাত্রেরা তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছিল।

"আমাদের ক্লাশে ছাত্রদের একটী সঙ্ঘ ছিল এবং কতকগুলি ছাত্র তাহার নেতৃত্ব করিত। কোনও ছাত্র তাহাদের নেতৃত্ব অস্বীকার করিলে, তাহার দুর্গতির সীমা থাকিত না, তাহার ক্লাশে তিষ্ঠান দায় হইত। এই দলের প্রধান পাণ্ডা ছিল, চারুচন্দ্র ঘোষ। চারুর পিতা রায় দীননাথ ঘোষ বাহাদুর Government of India, Finance Department এর একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি Hindu Family Annuity Fundএর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। চারু ক্লাশের প্রথম ছাত্র ছিল,—গুণে ও ক্ষমতায়। অঙ্ক ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে সে সুদক্ষ ছিল। হাতের লেখাও ছিল যেমন, লিখিতও তেমনি সুন্দর। সে বাঙ্গালায় অতি চমৎকার কবিতা রচনা করিতে পারিত। দেখিতে ছিল, কাকের মত কালো, কিন্তু তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবে লাবণ্য ও প্রতিভার দ্যুতি প্রকাশ পাইত।

"আমাদের দ্বিতীয় পাণ্ডা ছিল, রাধারমণ কর। রাধারমণ বাঙ্গালা মেটিরিয়া মেডিকা প্রণেতা স্বর্গীয় ডাঃ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের পুত্র এবং বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ ও এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা। ভাল ছেলে বলিয়া রাধারমণের বিশেষ খ্যাতি না থাকিলেও, সে ভারি বুদ্ধিমান্ ও ফন্দিবাজ ছিল। চারুর সহিত তাহার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল এবং চারুর দৌলতেই সে পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। সে চারুর চিরসঙ্গী ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চারুর পিতা ছিলেন ভারী কড়া-প্রকৃতির লোক, – তিনি একমাত্র স্কুলে যাওয়া ব্যতীত অন্য সময় চারুকে বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না। সুতরাং, রাধারমণই চারুদের বাড়ী যাইত ও অধিক সময় থাকিত।

"এই চারু বেচারীর জন্য আমার ভারি দুঃখ হয়। পিতার অত্যধিক শাসনের ফলে তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছিল। স্বাধীনতা-স্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। বিশেষতঃ, কিশোর বয়সে তাহা অতি প্রবল থাকে এবং নিষ্ঠুর ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলে, দুর্দ্দম্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিশোর বালক তখন মিথ্যাবাদ, প্রতারণা প্রভৃতি কুকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং, কৈশোরের এই স্বাধীন বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে, অভিভাবকগণকে অতি সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বক্ষণ খড়্গহস্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। তাহার সে আকাঙ্ক্ষাকে অসৎ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সৎপথে পরিচালিত করিতে হইবে, শাসনের ভ্রূকুটী ও বেত্রদণ্ডে নহে,—শিষ্ট ও মিষ্ট ব্যবহারে। চারুর

প্রতি চারুর পিতার কঠোর নৈতিক শাসন, তাহার কারা-জীবনকে বীতশ্রদ্ধ ও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। পলাতকা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সে প্রায়ই থিয়েটারে যাইত এবং অসৎ সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া নীতি-বিগর্হিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকিত। অল্পবয়সেই সে তাহার চরিত্র হারাইয়া ফেলে। আমার বোধ হয়, তাহার এই চরিত্রহীনতা তাহার পিতার অতিমাত্র শাসন-নীতির প্রতিবাদ! মেধাবী বলিয়া চারু সরকারী অফিসে উচ্চ চাকরী পাইয়াছিল, মাহিনাও পাইত বেশ মোটা। কিন্তু একমাত্র চরিত্রহীনতাই তাহার কাল হইল। স্ফূর্ত্তির ইন্ধন যোগাইতে, সে অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ে এবং আত্মহত্যা করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

"চারু ও রাধারমণের আর একজন সঙ্গী ছিল,—অগাধ পণ্ডিত ও নীরবকর্ম্মী স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। আনন্দকৃষ্ণ প্রাতঃস্মরণীয় রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার জীবিতকালের শেষ কুড়ি বৎসর তিনি এক প্রকার পঙ্গু অবস্থায় কাল যাপন করেন। তিনি দুশ্চিকিৎস্য হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন এবং ডাক্তারেরা তাঁহাকে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ হইতে একেবারে নিবৃত্ত থাকিতে উপদেশ দেন। তিনি শোভাবাজার রাজবাটীতেই থাকিতেন এবং প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগস্থ সুদীর্ঘ বারাণ্ডায় সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহাকে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিতে শুনা যাইত। সমগ্র ভগবদ্গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত, অথচ এমন অনাড়ম্বর সরল প্রকৃতির লোক আমি আর কখনও দেখি নাই। প্রকৃতপক্ষে, সাদাসিধা জীবনযাপন ও সৎচিন্তায় কালাতিপাত যেন

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

মনীষী—৺আনন্দকৃষ্ণ বসু

[৪০ পৃঃ]

তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি বহু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ইংরাজি ভাষার অতি শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তাঁহার এক বিরাট্ লাইব্রেরী ছিল এবং তাহার প্রায় সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার অধিগত ছিল। তাঁহার মাতামহ রাজা রাধাকান্তের মৃত্যুর পর, তাঁহার মাতুল রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা হন। বহুতর সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানে, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে গভর্ণমেণ্ট নিষ্ঠাবান্ হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিমত গ্রহণ করিতেন। বাহিরে প্রচার না থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে আনন্দকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী। ভাগিনেয় তাঁহার মনীষাসম্পন্ন মস্তিষ্ক চালনা করিয়া, অকাট্য-যুক্তি-বহুল অভিমত লিখিয়া দিতেন, আর মাতুল তাহাতে স্বাক্ষর করিতেন। বড় লাট লর্ড রিপণের শাসন-সময়ে ইলবার্ট বিলের প্রতিবাদকল্পে ওজস্বিনী ভাষায় তিনি যে সারগর্ভ আবেদন পত্র লিখিয়াছিলেন,—তাহাতে বিরুদ্ধ-বাদীদিগকে মূক হইতে হইয়াছিল। সত্যই তাহা অতুলনীয়। আমি তাহার উপসংহারে লিখিত কবিতার দুইটী Stanza মুখস্থ করিয়াছিলাম এবং তৎপরে তাঁহার এক আত্মীয়াকে দিয়া কার্পেটে সুরম্যভাবে গ্রথিত করিয়া, চিত্রাকারে আমার পাঠ-কক্ষের সৌষ্ঠবরূপে সাজাইয়া রাখিয়াছি। এস্থলে সেই পংক্তি কয়টী উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

> "Perish policy and cunning,
> Perish all that fears the light ;
> Whether losing, whether winning,
> Trust in Gcd and do the right.

রসায়নাচার্য্য চুনীলাল

Some will hate thee, some will love,
Some will flatter, some will slight ;
Cease from man and look above,
Trust in God and do the right."*

" মনীষী আনন্দকৃষ্ণকে প্রায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেই গ্রন্থ-সম্ভার-সমৃদ্ধ নির্জ্জন লাইব্রেরী কক্ষে পাঠ-নিরত অবস্থায় চেয়ারে উপবিষ্ট দেখা যাইত। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার সেই বিরাট্‌ লাইব্রেরী কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র গ্রহণ করেন। আনন্দকৃষ্ণ সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন,—মাত্র আহার ও শয়নকালে অন্দর মহলে যাইতেন। কি সামাজিক, কি শিক্ষানৈতিক, কি রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ জটিল সমস্যার সমাধান জন্য, তৎকালীন প্রায় সমুদয় দেশপ্রাণ ব্যক্তি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে আসিতেন। তাঁহার মন্তব্য অতি যুক্তিপূর্ণ ও সুফলপ্রসূ ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা

---

* ধ্বংস হোক্‌ কূটনীতি, ধূর্ত্ততানিচয়,
ধ্বংস হোক্‌ ডরে যাহা সত্যের কিরণ ;
হয় হোক্‌ পরাজয়, কিম্বা হোক্‌ জয়,
ঈশ্বরে বিশ্বাসি কর সত্যের সাধন।

কেহবা করিবে ঘৃণা, কেহ প্রীতিদান,
কেহ তোষামোদ, কেহ বিদ্রূপ বর্ষণ ;
উচ্চে চাহ,—লোকমতে নাহি দিয়া কাণ,
ঈশ্বরে বিশ্বাসি কর সত্যের সাধন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ মহাত্মাগণ উক্ত উদ্দেশ্যে তাঁহার সান্নিধ্য গ্রহণ করিতেন। তদানীন্তন বহু জননায়কের বক্তৃতা তৎকর্তৃক লিখিত হইয়া সভাস্থলে পঠিত হইত। কিন্তু তিনি কখনও কোনও সভায় যোগদান করেন নাই। স্কুলে পাঠকালে আমি তাঁহাকে ঠিকভাবে বুঝিতে পারি নাই,—মেডিকেল কলেজে পাঠশেষের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয় এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাকে বড় বিশ্বাস করিতেন,—স্নেহ করিতেন। কিছুদিনের জন্য আমি তাঁহাদের গৃহ-চিকিৎসক ছিলাম। তিনি রহস্যচ্ছলে আমাকে "The Good Samaritan and the Presiding Deity" অর্থাৎ গৃহ-দেবতা নামে অভিহিত করিতেন। আনন্দকৃষ্ণ গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু-সমাজের জনমান্য নেতা ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ঘোর বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দকৃষ্ণের ইহাই বিশেষত্ব,—সমাজ-সংস্কারে তিনি উদারনীতিক ছিলেন। তিনি ও আরও চারিজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থসন্তান মিলিয়া, হিন্দু-বিধবা-বিবাহ সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি বাবু সারদাচরণ মিত্র ছিলেন সে সমিতির সেক্রেটারী। বাকি তিন ব্যক্তি,—কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেয়ারম্যান্ বাবু গোপাললাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণের ভ্রাতা বাবু জয়কৃষ্ণ বসু এবং রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের অন্যতম দৌহিত্র, হাইকোর্টের উকিল বাবু শ্যামলাল মিত্র। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, গোঁড়া হিন্দু সমাজের ভীষণ

প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও, উক্ত জয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের এক বালবিধবা নাতিনীর বিবাহ-কার্য্য সমাহিত হয়। আমার বোধ হয়, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া হিন্দু-পরিবারে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বিধবা-বিবাহ। উক্ত বিবাহ-ব্যাপারে যাঁহারা উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরিশেষে সরিয়া পড়িয়াছিলেন ; এমন কি, কেহ কেহ বিধবা-বিবাহের বিরোধিতাও করিয়াছেন। কিন্তু আনন্দকৃষ্ণ স্বীয় সমাজ ও আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াও, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নিজ মত ও বিশ্বাসে অচল অটল ছিলেন। আমার পারিবারিক জীবনেও ঠিক এই ভাবের ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল, সেজন্য এস্থলে উক্ত প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলাম।

"পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আনন্দকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র যোগেন্দ্রকৃষ্ণ আমার সহপাঠী ছিল। সে পিতার প্রতিভার বিশেষ কিছু অধিকারী হইতে পারে নাই। লেখাপড়ায় ভারি উদাসীন ছিল,—তবে তাহার বিশেষত্ব ছিল এইটুকু, সে সুন্দর পত্রলেখক ছিল। ইংরাজিতে উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় লিখন-ভঙ্গি সে তাহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সে পিতার কতিপয় চরিত্রগুণের অধিকারী হইয়াছিল। সে অতিশয় অমায়িক, স্নেহপ্রবণ ও স্বার্থশূন্য ছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মম্ভরিতা তাহার মোটেই ছিল না। সতীর্থগণের উপকার-সাধনে সে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিত। ব্যক্তিত্ব না থাকায়, সে চারু ও রাধারমণের হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ হইলেও, তাহাদের প্ররোচনায় কোনও হীনকার্য্যে তাহার উৎসাহ ছিল না,—সে সময় সে দূরে সরিয়া পড়িত। এই মহত্ত্বের জন্য তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব সূচিত

হয় এবং আজ ৪২ বৎসর সে প্রীতি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে। যোগেন্দ্রকৃষ্ণ কলিকাতা কর্পোরেশনে লাইসেন্স্ ইন্স্পেক্টরের কর্ম্ম করিয়া এক্ষণে পেন্সনভোগী।

"এই সময়কার আর একজন সহপাঠী বন্ধুর নাম ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। ভূপেন্দ্রকুমার নিমতলার বিখ্যাত দত্ত বংশের সন্তান। আমাদের বাটীর নিকটে শ্যামবাজারে তাহাদের একটী সুন্দর বাগানবাড়ী ছিল। ভূপেন তাহার বিধবা মাতা ও দুই ভ্রাতা সহ এই বাড়ীতে বাস করিত। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার ভাই দুইটী কলেরায় মারা যায়। ভূপেন তিনতলার একটী ঘরে থাকিত। সে ঘরে বাড়ীর আর কেহ বড় যাইত না। কাজেই, এই কক্ষটী আমাদের সহপাঠিগণের বেশ একটী আড্ডাস্থল ছিল। আমাদের ছুটীর দিন আমরা প্রায়ই এই ঘরে বসিয়া আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া কাটাইতাম। তবে নিয়মিত উপস্থিতি আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না;—তাহার কারণ, আমার পিতা স্কুলে যাওয়া ব্যতীত অন্য সময় আমাকে প্রায় বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না। সেজন্য কোন কার্য্যের জন্য তিনি বাড়ীর বাহির হইলে, আমি বাড়ী হইতে সোজাসুজি ভূপেনের এই ত্রিতল কক্ষে আসিয়া হাজির হইতাম। ভূপেন ছিল আমাদের এই ক্লাবের কর্ত্তা,—আমাদের তোয়াজও করিত খুব। সে যখন সেকেণ্ড্ ক্লাশে পড়ে, সেই সময় তাহার বিবাহ হয়। সুতরাং, অবিবাহিতের দল আমরা তাহাকে সাবালক ভাবিয়া একটু সমীহ করিতাম। অঙ্কে তাহার খুব মাথা ছিল। যে অঙ্কের অর্থ বুঝিতে আমাদের বেশ আয়াস স্বীকার করিতে হইত, সে এক নিমিষে তাহা কষিয়া দিত। বিবিধ প্রশ্নে সে ছিল সিদ্ধ। কিন্তু অঙ্ক ছাড়া অন্যান্য

বিষয়ে ভাল ছিল না। তাহার কারণ, অন্য কিছু নহে,—মনঃসংযোগের অভাব। অঙ্কে ব্যুৎপত্তি থাকায়, ছেলেবেলা হইতে ব্যবসায়ের দিকে তাহার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। ক্রমে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সে নানাবিধ ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনও ব্যবসায়ে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অতি সরল বিশ্বাসী ও উদার স্বভাবের লোক ছিল বলিয়া, অংশীদার বা অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা তাহাকে ফাঁকি দিতে খুবই সুযোগ পাইত। ফলে, প্রতি কারবারই তাহার ফেল্ হইয়াছে এবং ঋণজালে জড়িত হইয়া নানা কষ্টের মধ্যে তাহার দিন কাটিয়াছে। তবে বর্ত্তমানে ভূপেন বেশ সুখী। ছেলেগুলি শিক্ষিত ও মানুষ হইয়াছে; কোনও ঝঞ্ঝাট বা উদ্বেগ নাই। তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব আজও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে।

"আমার আর একজন সহপাঠী বন্ধু ছিল, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। চন্দ্রকুমার টালার সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তান। লেখাপড়ার বিষয়ে তাহার বৈশিষ্ট্য কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য ছিল অটুট্। বাড়ীতে পালোয়ান বা কুস্তিগীর রাখিয়া সে ব্যায়াম-ক্রীড়া করিত। সে ছিল স্কুলের দুর্ব্বল ছেলেদের পরম সহায়। দেহে শক্তিও ছিল প্রচুর। অধুনা লুপ্ত National Paperএর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মেলায় একবার মুসলমান গুণ্ডারা ভারি গোলমাল করে। চন্দ্রকুমার নিজের অমিত শক্তি সাহায্যে তাহাদিগকে আশ্চর্য্যরূপে নিবৃত্ত করে। অতি অল্প বয়সে কালাজ্বরে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অক্ষয়কুমার বর্ত্তমানে কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী।

"এখনও আমার বেশ মনে আছে, এই চন্দ্রকুমারদের বাড়ীতে ম্যাজিক দেখাইয়া, আমাদের বন্ধু রাধারমণ খুব বাহবা লইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে ভারি ফন্দিবাজ ছিল। ইন্দ্রজাল বিদ্যা সে বেশ আয়ত্ত করিয়াছিল। সেদিনকার সভায় রায় বাহাদুর ডাঃ এ, এন, মিত্র ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ বহু প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাধারমণ তাহার ১০।১২ বৎসর বয়স্ক ছোট ভাইয়ের চোক্ বাঁধিয়া তাহাকে সম্মোহিত (Hypnotised) করিয়া ফেলিল এবং দর্শক মণ্ডলীর যত কিছু প্রশ্নের উত্তর তাহার মুখ দিয়া বলাইতে লাগিল। এমন কি, ডাঃ মিত্র চিকিৎসা-সংক্রান্ত কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তৎসমুদয়ের উত্তরও নির্ভুলভাবে ঐ বালকের মুখ হইতে নির্গত হইল! সে অদ্ভুত ব্যাপারে ডাঃ মহেন্দ্রলাল অবধি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, অন্য দর্শকের ত কথাই নাই। পরিশেষে রাধারমণ একটী ঘড়ি লইয়া, বালককে তাহাতে কয়টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিল, বালক তৎক্ষণাৎ ঠিক সময় বলিয়া দিল। রাধারমণ ঘড়ির কাঁটা যৎপরোনাস্তি ঘুরাইয়া পুনরায় বালককে তাহাতে কয়টা বাজিল জিজ্ঞাসা করিলে, বালক মায় মিনিট সেকেণ্ড্ ঠিক উত্তর করিল। বহু দর্শক কিন্তু ভাবিয়াছিল, ইহা ভৌতিক কাণ্ড! ফলতঃ, তাহা নহে। সমস্তটাই আমাদের বন্ধু চারুচন্দ্র ও রাধারমণের কারসাজি। কেবল কতকগুলি সাঙ্কেতিক পন্থা উদ্ভাবনের বাহাদুরী।

"শরৎচন্দ্র সোম নামে আমার আর একজন সহপাঠী বন্ধু বর্ত্তমানে কলেজ প্রেসের স্বত্বাধিকারী। শরৎ নন্দনবাগানের বিখ্যাত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের দৌহিত্র। সে মাতামহের বাড়ীতে থাকিত। মিত্র মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে পরিচালিত আদি ব্রাহ্ম সমাজের

সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁহার বাটীতে বহুবার গিয়াছি। তাঁহার বাটীতে প্রায়ই উপাসনা-সভার অধিবেশন হইত এবং আমি তাহাতে যোগদান করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতাম। শরতের মাতুল কেদারনাথ মিত্র মহাশয় ভারি সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন। উক্ত উপাসনা-সভায় এবং অন্যান্য আনন্দোৎসবে তাঁহার সঙ্গীত সাধারণের প্রীতি উৎপাদন করিত। "নরাণাং মাতুলক্রমঃ,"—শরৎও ভারি সুকণ্ঠ ছিল। আমাদের ছাত্র-সঙ্ঘের সে ছিল গায়ক। তাহার সঙ্গীতে আমরা আমাদের অবসর বিনোদন করিতাম। উপাসনা-সঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য গানও সে চমৎকার গাহিত। তন্মধ্যে একটী গান সে এত মধুর গাহিত যে, আজও আমি সে গানটীকে ভুলিতে পারি নাই। এই গানটী আমাদের ছাত্র-সঙ্ঘের একটী প্রিয় সঙ্গীত ছিল। তৎকালে গানটীর বহুল প্রচারও ছিল। গানটীর কিয়দংশ এই :—

বালিকা-বয়সে ছিলাম স্ববশে,
কোনো জ্বালা সখি জানিনে,
মনে যা এসেছে তখনি ক'রেছি,
কারো কথা কভু শুনিনে। ইত্যাদি।"

উচ্চশিক্ষা ও কর্ম্মজীবন

চুণীলালের আত্মজীবনী হইতে জানিতে পারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিট্যান্ ইন্‌ষ্টিটিউসানের (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং পর বর্ষে এণ্ট্র্যান্স্ ক্লাশে উঠেন। এই শ্রেণীতে উঠিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজিয়েট্ স্কুলে চলিয়া যান এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তৎপরে এল্, এ, বা এফ্, এ, (তৎকালীন First Examination in Arts) পড়িবার জন্য জেনারেল এসেম্ব্লিস্ ইন্‌ষ্টিটিউসানে (বর্ত্তমান স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ) প্রবেশ লাভ করেন এবং যথাসময়ে (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত কৃতকার্য্য হন। ঐ সময় পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দও (তখনকার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত) ঐ কলেজে অধ্যয়ন করিতেন,—তাঁহার সহিত চুণীলালের সৌহৃদ্য সূচিত হয়। উত্তর কালে এই ধর্ম্মবীরের বন্ধুত্ব এই কর্ম্মবীরের জীবনে বিশেষরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চুণীলালের জীবন-যাত্রার মধ্যে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামীজীর একাধিক মৃত্যু-বার্ষিকী উৎসব-সভার সভাপতিত্বে তিনি সে বন্ধুত্বের ও ধর্ম্মপ্রভাবের স্বীকারোক্তিও করিয়া গিয়াছেন।

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বাল্যকাল হইতেই চুণীলালের লোকহিতৈষণা বৃত্তি জাগরিত হইয়াছিল। স্কুল বা কলেজে শিক্ষার সময় তাঁহাদের সংসারে আর্থিক অসচ্ছলতা বিলক্ষণ ছিল এবং তাহারই ফলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমৃতলালকে এণ্ট্র্যান্স্ পাশ করিয়াই, বিদ্যার্জ্জনে অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া, কর্ম্মের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই অর্থকৃচ্ছ্রতাই চুণীলালকে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলে। এজন্য দেখা যায়, ছাত্রজীবনে তিনি বহু দুঃস্থ সহপাঠীকে পাঠসমাপ্ত পুস্তক দিয়া, এমন কি, নিজের জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া, সতীর্থের স্কুলের মাহিনা দিয়া সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাকে নিজের কাপড় বা জামা দিয়াও বহু দরিদ্র বন্ধুর লজ্জা নিবারণ করিতে শুনা গিয়াছে।

উক্ত লোক-হিতৈষণা বৃত্তিই তাঁহার উচ্চশিক্ষালাভের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। জ্ঞান-লিপ্সা তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। মানুষ হইতে হইবে, দশজনের একজন হইতে হইবে,—দীন-দুঃখীর অশ্রু মুছাইতে হইবে,—ইহা তাঁহার জীবনের একমাত্র সঙ্কল্প ছিল। দৈন্যের নিষ্পেষণ তাঁহার সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটাইতে পারে নাই। এফ, এ, পাশ করিয়া চুণীলাল দেখিলেন, উচ্চতর শিক্ষার মার্গে আশানুরূপ জ্ঞানার্জ্জনের বিশেষ কোনও বিঘ্ন ঘটে না বটে, কিন্তু জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইতে হইলে, যে সামর্থ্যের আশু প্রয়োজন, তাহা উক্ত পথে সহজলভ্য নহে। কলেজে পাঠকালে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলন তাঁহার চিত্তকে সমধিক আকৃষ্ট করে। বিশেষতঃ, রসায়ন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী হয়। বলা বাহুল্য, তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা ভিন্নমুখিনী হইলেও, তিনি যে ভাষা-সাহিত্যের চর্চ্চায় উদাসীন হন, তাহা নহে,—তাঁহার ন্যায় মেধাবী

ছাত্রের পক্ষে তাহা সম্ভবপর ছিল না। শুধু তাহাই নহে।—তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজিভাষাকে ধ্যান-জ্ঞান করিয়াছিলেন, মাতৃভাষাকে তাঁহারা প্রায় আমল দিতেই চাহিতেন না। কিন্তু চুণীলালের কথা ছিল স্বতন্ত্র,—তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, পাশ্চাত্য চিন্তায় অনুভাবিত হইয়াও, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে মাতৃভাষার ছাঁচে ঢালিয়া তিনি অভিনব সৎ-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, জ্ঞানসঞ্চয়ের দিনে বিজ্ঞানের পানে তাঁহার লোলুপ-দৃষ্টি নিপতিত হইলেও, তিনি ভাষা-সাহিত্যকে উপেক্ষা করেন নাই।

যাহা হউক, এই বিজ্ঞান-জ্ঞানলিপ্সাই হিতৈষিণী বৃত্তির পরিপোষক-রূপে চুণীলালকে ডাক্তারী শিক্ষায় প্রণোদিত করে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে পিতা দৈন্য-পীড়িত অবস্থাতেও অমত করিতে পারিলেন না,—জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃতলালের সামান্য চাকরী ও নিজের স্বল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া, পুত্র চুণীলালের বহুব্যয়সাধ্য চিকিৎসা-বিদ্যার প্রাথমিক ব্যয়ভার অতি কষ্টে বহন করিয়া চলিলেন। বিলাস চুণীলালকে অভিভূত করিতে পারে নাই,—দৈন্যও তাঁহাকে লজ্জিত করিতে সমর্থ হয় নাই। অতি সামান্য পরিচ্ছদে, প্রায় অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় একান্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি সাধনা আরম্ভ করিলেন। প্রথম বর্ষ হইতেই তিনি কলেজের উত্তম ছাত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন। এইরূপে তিনি ১৮৮৪ সালে প্রাথমিক এম, বি, পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন ও ১৮৮৬ সালে শেষ এম, বি, পরীক্ষায়

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

বহু প্রশংসাপত্র, পুরস্কার ও স্বর্ণপদক উপহার সহ প্রথম বিভাগে অতি গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হন।*

এম, বি, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরেই, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে চুণীলাল অস্থায়ীভাবে মেডিকেল কলেজে এসিণ্ট্যাণ্ট্ সার্জ্জনের পদে নিয়োজিত হইলেন এবং অতি অল্প দিন মধ্যে স্বীয় অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ সার্জ্জন মেজর ওয়ার্ডেন্ সাহেব (Dr. C. J. H. Warden, I.M.S.) তাঁহার ধীশক্তি ও কর্ম্মতৎপরতায় সাতিশয় প্রীত হন এবং তাহার ফলে ছয় মাসের মধ্যেই তিনি তাঁহাকে তাঁহার স্থায়ী সহকারীরূপে গ্রহণ করেন। এইরূপে চুণীলাল বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সহকারী রসায়ন পরীক্ষক (Asstt. Chemical Examiner to the Government of Bengal) এবং কলিকাত মেডিকেল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রতিভা ভারত

---

*1. *Gold Medals* in Botany, Pathology and Medicine.

2 *Certificates of Honour* in Anatomy, Surgery, Midwifery, Medical Jurisprudence and Hygiene.

3. *Prizes* in Clinical Medicine and Clinical Surgery.

১। স্বর্ণপদক—উদ্ভিদতত্ত্ব, রোগ-নিদান-তত্ত্ব ও ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

২। প্রশংসাপত্র—শরীর-তত্ত্ব, অস্ত্র-চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, চিকিৎসাবিষয়ক আইন ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

৩। পারিতোষিক—রোগিচর্য্যাঘটিত ঔষধ ও অস্ত্রচিকিৎসা।

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

বর্ম্মাযাত্রার সময়

[৫২ পৃঃ]

গভর্ণমেণ্টেরও গোচরীভূত হইল,—তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যোগ্য কর্ম্মচারী বলিয়া, তাঁহার নাম Imperial Service এর তালিকাভুক্ত হইল।

কিন্তু এই সময়ে এক মহাবিভ্রাট ঘটিল। এই স্থায়ী পদ প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই, অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে হুকুম আসিল,—চুণীলালকে অবিলম্বে বর্ম্মায় রওনা হইতে হইবে এবং ২৭শে মার্চ্চ তারিখে মান্দালয়ে উপনীত হইয়া, তত্রত্য সার্জ্জন জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে,—তিনি তাঁহাকে কোনও সিভিল হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসকের পদে নিয়োজিত করিবেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সম্প্রতি তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ থিবো ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। সমগ্র ব্রহ্মদেশ এই যুদ্ধে ইংরাজরাজের অধিকারে আসিয়াছে। কিন্তু তখনও সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হয় নাই। এই সময় ভারত গভর্ণমেণ্ট কতিপয় উপযুক্ত মেডিকেল অফিসারকে হাসপাতালের চার্জ্জে প্রেরণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত নজীরেই চুণীলাল বর্ম্মায় যাইতে আদিষ্ট হন।

এই সংবাদ পাইয়া ডাক্তার ওয়ার্ডেন্ সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি চুণীলালকে বুঝাইলেন,—এই কর্ম্মের পরিণামে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন সাফল্যমণ্ডিত হইবে। তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইয়াছেন বলিয়া, সরকার হইতে এই আহ্বান এক প্রকার অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন,—পুরুষকে নানা বিঘ্নের মধ্য দিয়া পৌরুষ ও সার্থকতা অর্জ্জন করিতে হয়। আর যদিও ব্রহ্মদেশ বর্ত্তমানে সুনিয়ন্ত্রিত নহে, তাহা হইলেও, প্রকৃত বীর্য্যবান্ ব্যক্তির তাহাতে ভীত ও পশ্চাদ্‌পদ হইলে চলিবে না। উপরিতন

কর্ম্মচারী স্নেহশীল হিতৈষী বন্ধুর উৎসাহ-বাণীতে উত্তমী তরুণ চুণীলাল বর্ম্মা-গমন স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া সব বৃত্তান্ত বলাতে মহা-অন্তরায় উপস্থিত হইল। চুণীলালের মাতা পুত্রদিগকে কখনও দূরদেশে পাঠান নাই। আজ পুত্রকে "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" পাঠাইতে হইবে ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। পুত্র অনেক করিয়া বুঝাইলেন এবং না গেলে তাঁহার চাকরীর ক্ষতি হইতে পারে, তাহাও জানাইলেন। কিন্তু মাতা কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। বরং, বলিলেন,—"যদি এজন্যে তোমার চাকরী ছেড়ে দিতে হয়, সেও স্বীকার,—আমি তোমাকে অত দূর দেশে অত বিপদের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে স্থির থাক্‌তে পার্‌বো না। তুমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ব'সে ডাক্তারী করো, যা ভাগ্যে জোটে, তাই যথেষ্ট।"

চুণীলাল ওয়ার্ডেন্ সাহেবের নিকট মাতার অভিমত জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহাও ব্যক্ত করিলেন,—মাতার বিনা-সম্মতিতে কোনও কার্য্য করিতে পারেন না। চুণীলালের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইবে, সহৃদয় সাহেব ইহা যেন সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না! তিনি চুণীলালকে বলিলেন,—"হয়ত তুমি তোমার মাকে ঠিক বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারছ না,—অথবা তিনি ভুল বুঝ্‌ছেন। তুমি তাঁকে আর একবার বেশ ভাল ক'রে বুঝাবার চেষ্টা করো। বোধ হয়, তুমি তোমার জীবনের ভয় ক'র্‌ছ। কিন্তু এইটুকু জেনো, মানুষকে ম'র্‌তেই হবে স্থির জেনে, যাতে বীরের ন্যায় ম'র্‌তে পারা যায়, তার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর আমি ত সেখানে বিশেষ ভয়ের কারণ দেখ্‌ছি না। যদি একান্তই কোনও বিপদ ঘটে,—তোমার মাকে ব'লো এবং তুমিও জেনে রাখ,—তোমার সংসারের

ভার আমি বহন ক'র্‌বো। তুমি যাও, মাকে আবার বুঝিয়ে বলো। মানুষের জীবনে সুযোগ একবার আসে,—আমি নিশ্চিত বুঝ্‌ছি,—সেই সুযোগ আজ তোমার সম্মুখে উপস্থিত,—হারালে শেষে অনুতাপ ক'র্‌তে হবে। কেননা, যদি তুমি না যাও, তা হ'লে এই অবাধ্যতার জন্য তোমার চাকরী যাবে,—না হয়, অন্ততঃ তোমাকে বাধ্য হ'য়ে চাকরী ছেড়ে দিতে হবে।"

অনন্যোপায় হইয়া চুণীলাল আবার মাতার নিকট আসিলেন এবং ডাক্তার সাহেবের যুক্তিপূর্ণ উক্তি বিবৃত করিলেন। ডাক্তার সাহেব তাঁহার উপর যে ভীরুতার শ্লেষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,—তাহা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং, তিনি স্নেহময়ী মাতাকে নানা-প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন এবং ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহাকে বর্ম্মা যাইবার অনুমতি দিতে প্রার্থনা জানাইলেন। অবশেষে মাতা বুঝিলেন,—পুত্রের একান্ত ইচ্ছা বর্ম্মা যাইবে। তিনি তাহার উন্নতির পথে কণ্টক দিবেন কেন? তিনি স্বীকৃতা হইলেন।

মাতার অনুমতি পাইয়া চুণীলালের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে বর্ম্মা যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। সব ঠিক্-ঠাক্। ক্রমে যাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। দ্রব্যাদি গাড়ীতে উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। চুণীলাল সজ্জিত হইয়া মাতাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। সম্মতি দিবার পর হইতে কিন্তু মাতার বদনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে! মাতৃভক্ত চুণীলাল তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজ বিদায়-ক্ষণে সেই মেঘে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। মাতা একান্ত আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে অশ্রু-বন্যায়

চুণীলালেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাসিয়া গেল। মায়ের চোকের জল চুণীলাল মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি অশ্রুসিক্তা মাতার সম্মুখে বসিয়াই কার্য্যে ইস্তফা-পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। কোথায় গেল কর্ম্মোদ্যম, ভাবী উন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা! গাড়ী হইতে দ্রব্যাদি নামান হইল। চুণীলাল বর্ম্মা-যাত্রার পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, সেই পদত্যাগ পত্র সঙ্গে লইয়া ওয়ার্ডেন্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাহেব চুণীলালকে দেখিয়া স্তম্ভিত। চুণীলাল বলিলেন;—না সাহেব, আমার বর্ম্মা যাওয়া হ'ল না।

সাহেব। কেন? আবার কি হ'ল?

চুণী। মায়ের অমত।

সাহেব। সে কি! তিনি ত সম্মতি দিয়েছিলেন?

চুণী। হাঁ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সম্মতির অন্তরালে যে এত অশ্রু সঞ্চিত ছিল, তা জান্তাম না।

সাহেব হাসিলেন। বলিলেন,—তা হ'লে তুমি এই অশ্রুর বিনিময়ে তোমার অমূল্য সুযোগ নষ্ট ক'র্তে চাও!

চুণী। কি ক'র্বো সাহেব! আমি ভেবে দেখ্লাম,—আমার এ চাকুরীর চেয়ে, আমার মায়ের চোকের জল অনেক মূল্যবান্।

সাহেব আবার হাসিলেন,—হাসিয়া বলিলেন,—সে ত সে যুগের আলেকজাণ্ডারের উক্তি! তারপর গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—চুণী, তুমি কি পাগল হ'য়েছ?

চুণীলাল দৃঢ়তার সহিত বলিলেন;—না সাহেব! আমি প্রকৃতিস্থ।

স্থির ক'রেছি,—মায়ের আমার চোকের জলে আমার উন্নতির পথ পরিষ্কার ক'র্‌বো না। এই নিন্‌ আমার ইস্তফা-পত্র।

এই বলিয়া চুণীলাল মায়ের সম্মুখে লেখা পদত্যাগ পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া সাহেবের হস্তে দিলেন। সাহেব অবাক্‌ হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

* * * *

মাতার মনস্তুষ্টির জন্য চুণীলাল এক কথায় এমন সম্মানজনক পদ ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং মাতার চরণে প্রণত হইয়া, পরম চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিলেন। কর্ম্মত্যাগের কাহিনী শুনিয়া মাতা পুত্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যধিক বাৎসল্যের জন্যই এত বড় একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল ভাবিয়া, নিজে একটু লজ্জিতাও হইলেন। বুদ্ধিমান্‌ পুত্র মাতাকে তদবস্থ দেখিয়া আশ্বাসসূচক কণ্ঠে বলিলেন ;—"মা, তুমি ভেবো না, তোমার আশীর্ব্বাদের জোরে আমি যে কোনো স্থানেই উন্নতি ক'র্‌তে পার্‌বো।"

বাস্তবিক, চুণীলাল কোনও অবস্থাতে নিরুৎসাহ বা নিশ্চেষ্ট হইবার লোক ছিলেন না। কর্ম্মত্যাগের দুই এক দিন পরেই তিনি তাঁহার বাল্য-বন্ধু ও সহপাঠী, উত্তরকালে লোক-প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সহিত একযোগে বরাহনগরে এক ডিস্‌পেন্‌সারি খুলিয়া দিলেন ও প্র্যাক্‌টিস্‌ আরম্ভ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

কিন্তু নিয়তি বোধ হয় অলক্ষ্যে হাসিতেছিলেন! চুণীলালের সৌভাগ্যের মণি-মঞ্জুষা কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহা একমাত্র তিনিই

জানিতেন। আজ কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র মাতার আহ্বানে ভিন্নপথানুবর্ত্তী,—সার্থকতার স্বর্ণদেউলের সন্ধানে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছেন,—ইহাও বোধ হয়,—ঐ নিয়তিরই ইঙ্গিতে। বোধ হয়, মাতৃগতপ্রাণ পুত্রের শিরে মাতার আশিস্‌রাশি আরও পুঞ্জীভূত করিয়া, পুত্রকে অক্ষত কল্যাণের অক্ষয়কবচ ধারণের উপযুক্ত করিবার জন্যই, পূর্ব্ববর্ণিত স্নেহ-ভক্তির লীলানাট্যের অবতারণা,—এই অঘটনঘটনপটীয়সী নিয়তিরই নির্দ্দেশ !

সুতরাং, নিয়তি-চক্র আবার চুণীলালকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মার্গে ফিরাইয়া আনিল। ডিস্‌পেনসারি খুলিবার এক মাস পরেই সংবাদ আসিল, ভারত গভর্ণমেণ্ট চুণীলালের পদত্যাগ পত্র বিশেষ কোনও কারণে নামঞ্জুর করিয়াছেন। চুণীলাল তাঁহার পদে বহাল আছেন এবং চুণীলালকে বর্ম্মায় যাইবার জন্য পুনরায় অনুরোধপত্র আসিয়াছে। অবশ্য, ইহার মধ্যে চুণীলালের একান্ত শুভার্থী সার্জ্জন মেজর ওয়ার্ডেন্ সাহেবের কোনও সংশ্রব ছিল কিনা, তাহা ঠিক জানা যায় নাই।*

* তবে এই মাত্র জানিতে পারা যায়, ওয়ার্ডেন্ সাহেব চুণীলালের পদত্যাগ পত্র ও তাঁহার বর্ম্মায় যাইবার Passage ticket সিভিল হাসপাতালের ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেলের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল ঐ Passage ticket ফেরৎ পাঠাইয়া ৭ই এপ্রিল (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে (Dr. Warden) লিখেন,—চুণীলাল ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে মনোনীত হইয়াছেন,—সুতরাং, তাঁহার পদত্যাগ পত্র মঞ্জুর করিবার অধিকার তাঁহার নাই। চুণীলাল যদি বর্ম্মায় যাইতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে, এ বিষয় ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিতে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে নামঞ্জুর পত্র আসিতে প্রায় এক মাস বিলম্ব হয়। আমাদের বলিয়া বোধ হয়, চুণীলালের প্রতি স্নেহশীল ওয়ার্ডেন্ সাহেব চুণীলালের পদত্যাগ পত্র recommend করিয়া পাঠান নাই।

যাহা হউক, ভারত গভর্ণমেণ্টের এই পুনরাহ্বানে চুণীলাল সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না এবং বিস্ময়ের বিষয়, চুণীলালের মাতাও এবার আর অমত করিতে পারিলেন না। যখন পুত্রের ছাড়িয়া-দেওয়া চাকরী ফিরিয়া ঘুরিয়া তাহার হাতে আসিয়া ঠেকিল, তখন মাতা বুঝিলেন, ইহা ভগবানের ইচ্ছা। বিশেষতঃ, চুণীলালের কর্ম্মত্যাগের পর একদিন এক বিশ্বস্ত জ্যোতিষী তাঁহার কোষ্ঠী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাঁহার সমুদ্রযাত্রা অনিবার্য্য। আজ তাহা স্মরণ হওয়াতে, মাতা ইহা বিধির লিখন বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন। তিনি আর বাধা না দিয়া শুধু পুত্রকে বলিলেন ;—"তবে তুই তোর খুকীকে আমার কাছে এনে দিয়ে যা, তাতেই না হয় তোর অভাব কতকটা ভুল্‌বো। কি আর হবে? বার বার যখন ডাকৃছে, না যাওয়াটা ভাল নয়।"

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন, মেডিকেল কলেজে পঠদ্দশায়, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারি (বাং ১২৮৮ সাল, ১১ই ফাল্গুন, রবিবার) তারিখে, হুগলী জেলাস্থ ব্রাহ্মণপাড়ার স্বনামধন্য জমীদার ৺রামকৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের* তৃতীয় পুত্র ৺গৌরকিশোর সরকার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী তিলোত্তমার সহিত চুণীলালের শুভ বিবাহ হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরযূবালা জন্মগ্রহণ

* এই রামকৃষ্ণ সরকার মহাশয় ডাঃ সুরেশপ্রসাদ, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রভৃতির মাতামহ। তিনি হরিভক্তিপরায়ণ, প্রতিপালক জমীদার ছিলেন।

করেন। চুণীলাল যখন বর্ম্মা-যাত্রা করেন, তিলোত্তমা তখন পিত্রালয়ে ব্রাহ্মণপাড়াতে ছিলেন। মাতাঠাকুরাণীর সান্ত্বনার জন্য, তাঁহার ইচ্ছাক্রমে চুণীলাল তাঁহাদিগকে তথা হইতে মায়ের নিকট রাখিয়া, বর্ম্মায় গমন করেন।

স্নেহময়ী মাতার প্রসন্নতাপূর্ণ আশিস্‌রাশি মস্তকে ধারণ করিয়া, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ, ২৭শে এপ্রিল, বেলা ৯১/২ ঘটিকায় "আর্কট" (Arcot) নামক জাহাজে চুণীলাল রেঙ্গুনে রওনা হইলেন। এই সময় পাথেয় ও অন্যান্য খরচপত্র জন্য তৎকালীন কেমিক্যাল একজামিনার ওয়াডেল্ সাহেব (Lt.Col. L. A. Waddell, C.I.E.) নিজের পকেট হইতে চুণীলালকে ৫০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করেন। অবশ্য, পরে চুণীলাল ঐ ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, মেডিকেল কলেজে কর্ম্মপ্রাপ্তির সামান্য অবসরে তিনি তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারিগণের স্নেহদৃষ্টি ও বিশ্বাস কতটা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১লা মে তিনি নিরাপদে রেঙ্গুনে উপনীত হন। পথে সামুদ্রিক-পীড়ায় একটু কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল,—অন্য বিশেষ কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। সেখানে গিয়া সংবাদ পাইলেন, তাঁহাকে টংডুইংজি (Taungdwingi, বর্ত্তমান নাম Magwe) গিয়া, তথাকার সিভিল ডিস্‌পেন্‌সারি ও জেলের ভার গ্রহণ কবিতে হইবে। ঐ স্থান উত্তর ব্রহ্মে,—রেঙ্গুন হইতে বহু শত মাইল দূরে অবস্থিত। রেঙ্গুন হইতে প্রোম,—প্রোম হইতে মান্দালয় যাইবার ষ্টীমারে মিন্‌লায় নামিয়া, ৪০ মাইল স্থলপথে টংডুইংজি পৌছিতে হয়। তৎকালে উক্ত পথে যান-

বাহনের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, পথিমধ্যে চুণীলালকে নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল।

বর্ম্মায় অবস্থিতি কালে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জীবন-সঙ্কট অবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছিল। একবার কোনও কর্ম্ম উপলক্ষ্যে নৌকা-যোগে ইরাবতী নদীর উপর দিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হওয়াতে নৌকা জলমগ্ন হয়। নদীর উভয়তীরে ভীষণ জঙ্গল,—অতি কষ্টে সন্তরণ সাহায্যে তাঁহাকে সেই জঙ্গলেই আশ্রয় লইতে হয়। সেই দুর্য্যোগে সিক্ত বস্ত্রে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে সেই জনহীন স্থানে লোকালয়ের সন্ধানে ছুটিতে হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে তখন ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সিপাহী থাকিত। বহুক্ষণ খুঁজিতে খুঁজিতে একটী ঘাঁটির সন্ধান পান। সিপাহীরা তাঁহাকে নিজেদের বস্ত্র ও খাদ্য বণ্টন করিয়া দেয় এবং ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে খবর পাঠায়। এই স্থানে তাঁহাকে এই অবস্থায় ২।৩ দিন অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল।

একদিন রাত্রিতে তিনি বাসায় নিজ কক্ষে নিদ্রামগ্ন আছেন। ঘরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। গৃহমধ্যে শয্যাপার্শ্বে একটা বাঁশের মাচান ছিল। তথা হইতে এক প্রকাণ্ড বিষাক্ত সর্প লাফাইয়া পড়িয়া, তাঁহাকে দংশনের উপক্রম করে। সর্পের পতন ও ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে অদূরে শায়িত তাঁহার বিশ্বস্ত ও সতর্ক ভৃত্য উমেদ রায়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে তৎক্ষণাৎ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত ভোঁজালীর দ্বারা সর্প টাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। ভৃত্যটীর নিদ্রাভঙ্গ না হইলে উভয়েরই জীবন বিনষ্ট হইত।

আর একবার তিনি ও জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে ভ্রমণে

বহির্গত হন। কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে, তাঁহারা এক ভীষণ অরণ্যের মধ্যে আসিয়া পড়েন। তখন ব্রহ্মদেশ অশাসিত দস্যুর লীলাভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঘটনাক্রমে তাঁহারা একদল দস্যুর আড্ডাস্থলে উপনীত হন। দস্যুরা তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া সঙ্কেত ধ্বনি করে এবং আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। ভাগ্যবলে তাঁহাদের ঘোড়া দুইটী খুব তেজস্বী ও ক্ষিপ্রগামী ছিল। বিপদ আসন্ন বুঝিয়া তাঁহারা বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দেন এবং অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করেন।

তৎকালে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ইংরাজের অধীনে আসিলেও, বর্ম্মীরা সহজে বশ্যতা স্বীকার করে নাই। তাহারা সুবিধা পাইলেই ইংরাজ বা তাঁহাদের নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিত।—এমন কি, প্রাণ-সংহার পর্য্যন্ত করিতে ইতস্ততঃ করিত না। এইরূপে বিঘোরে পড়িয়া এই সময় বহু ইংরাজ ও কর্ম্মচারী উহাদের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। এই অরাজক অবস্থায় সকলকে অতি অস্বস্তির সহিত প্রাণ হাতে করিয়া দিনপাত করিতে হইত। ফলতঃ, তখন বর্ম্মীদের বিশ্বাস করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল, বলিলেই হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শত্রু-পুরীতেও চুণীলালের বর্ম্মী-বন্ধুর অসদ্ভাব হয় নাই। কর্ম্মসূত্রে যে সকল বর্ম্মী তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছে, তাহারা তাঁহার সদয় ব্যবহারে তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে,—তাঁহাকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখা ত দূরের কথা। তিনি মাত্র ৭।৮ মাস ব্রহ্মদেশে অবস্থিতি করেন এবং এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সদ্যস্বাধীনতাহীন অসন্তুষ্ট দুর্দ্ধর্ষজাতি তাঁহাকে এত ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিল যে, তাহারা তাঁহার বিদায়-দিনে অশ্রু

সম্বরণ করিতে পারে নাই এবং নানা উপহারে উপঢৌকনে তাঁহার প্রতি তাহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল।

এই স্থলে আরো একটী বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এইটুকু যে, এই বিঘ্নসঙ্কুল সুদূর প্রবাসে কঠোর কর্ত্তব্যের নিষ্পেষণেও, বঙ্গমাতার সুসন্তান চুণীলাল জননী জন্মভূমির কথা ভুলিতে পারিতেছেন না। আত্মীয়-স্বজন-বর্জ্জিত বিস্বাদময় জীবনেও তিনি দেশের দুর্গতির কথা ভাবিতেছেন। নিজের উন্নতি-প্রচেষ্টায় তাঁহার এই দূর প্রবাস-নির্ব্বাসন।—নির্ব্বাসন নয় ত কি? কিন্তু তাঁহার এই প্রাণপাত প্রচেষ্টার অন্তরালে এই আকাঙ্ক্ষা চির-জাগরূক,—তিনি মানুষ হইতে পারিলে আরও দশজনকে মানুষ করিতে পারিবেন—তিনি যদি বনস্পতি হইতে পারেন ত তাঁহার ছায়াতলে বহু দৈন্য-নিদাঘ-পীড়িত আশ্রয় লাভ করিবে। তাই তিনি এত দূরে আসিয়া এত বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও, সাধারণ মানুষের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন না,—মানুষকে মানুষের মত থাকিতে হইলে, যে ভাবে জীবন যাপন করিতে হয়, তিনি তাহার উপায় উদ্ভাবন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চুণীলাল ভাষা-জননীকে উপেক্ষা করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করেন নাই,—অধিকন্তু, মাতৃভাষার সাধনা তাঁহার পরম প্রীতিকর ছিল। টংডুইংজিতে এই অল্পদিন অবস্থিতির ফলে, তাঁহারই ন্যায় কর্ম্মসূত্রে আগত কতিপয় বাঙ্গালী বন্ধু মিলিয়া তাঁহারা তথায় এক বান্ধবসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্ষুদ্র সমিতিতে বসিয়া অবসরক্রমে তাঁহারা সে যুগে ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির আলোচনা করিতেন। আমরা এস্থলে চিন্তাশীল চুণীলাল কর্ত্তৃক উক্ত বান্ধবসমাজের বিজয়া-দশমীর উৎসব উপলক্ষ্যে

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

রচিত ও পঠিত একটী সুললিত কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি :—

বিজয়া

হৃদয়ের জ্বালা, মরম বেদনা
আজিকার মত রাখিয়া দূরে,
এস এস ভাই, প্রাণে প্রাণে মিশি
ক্ষণেকের তরে এ দূর পুরে।
হৃদি-মন্দিরে সবার মূরতি
প্রীতির প্রসূনে পূজিব আজ,
স্নেহ ও ভকতি চন্দনে আজি
পরাব সবারে নূতন সাজ।
সবার পরশে মানস-সরসে
হরষ-কমল উঠিবে ফুটি,
কে আছ মরতে অমৃতের আশে,
মাতোয়ারা হ'তে এসগো ছুটি।

*　　　　*　　　　*

জাতি-গৌরব লুপ্ত সকলি,
ভারত-আকাশে জলদ-লেখা,
একটী কেবল 'বিজয়া-তারকা'
আঁধারে আঁকিছে উজল রেখা।
ভারত-গগনে ধ্রুবতারা ওই
জীবনে লক্ষ্য করগো সবে,
জীর্ণ ভগন জাতীয় জীবন
নূতন করিয়া গঠিত হবে।

প্রতিষ্ঠার পথে

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমে চুণীলাল বর্ম্মা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। গৃহে উৎসবের সমারোহ পড়িয়া গেল। তিনি মেডিকেল কলেজে তাঁহার পূর্ব্বের স্থায়ী পদে যোগদান করিলেন এবং অধিকতর যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তখন রায় তারাপ্রসন্ন সেন বাহাদুর এফ, আই, সি,—এফ্, সি, এস্, অতিরিক্ত রসায়ন পরীক্ষক (Additional Chemical Examiner to the Government of Bengal) ছিলেন। তাঁহার অবসরপ্রাপ্তি ঘটিলে, ১৮৯৪ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে চুণীলাল ঐ পদে উন্নীত হন। এই পদোন্নতি তাঁহার বর্ম্মা-কৃতিত্বের প্রথম পুরস্কার। নচেৎ, এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য একজন মাত্র তেত্রিশ বর্ষ বয়স্ক দেশীয় যুবকের হস্তে অর্পণ করা সম্ভবপর হইত না। এই কার্য্য-পরিচালনে শুধু রসায়ন শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান থাকিলে চলে না, উক্ত বিষয়ে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতারও বিশেষ প্রয়োজন। এমন কি, এই সূত্রে বহু ক্ষেত্রে অনেক ত্যাগ-স্বীকারও করিতে হয়,—ভূয়োদর্শন, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির ত কথাই নাই। সৎসাহস ও নিরপেক্ষ বিচারজ্ঞান না থাকিলে, এই কার্য্যে নানা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনাও আছে। বর্ম্মায়

কার্য্যকালে তিনি উক্তবিধ গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছিলেন। তত্রত্য দুইজন সিভিল সার্জ্জন (Lt. Col. E. R. W. Carroll I.M.S. and Lt. Col. F. W. Wright, I.M.S.) একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করেন। চুণীলালের এই কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে এবং পরেও তৎকালীন একাধিক রসায়ন পরীক্ষক (Surgeon Major George Ranking, Surgeon Major Waddell, Dr. Bedford, Surgeon Captain J. F. Evans M.B., I.M.S.) শত মুখে তাঁহার কর্ম্মপটুতা, উদ্ভাবনী শক্তি, রসায়ন বিভাগের উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধন-কল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্ম্মতৎপরতা প্রভৃতির শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। পাঠকগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য পরিশিষ্টে ডাঃ ইভান্সের একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* চুণীলাল যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হন, সেই সময় উক্ত নির্ব্বাচন-প্রস্তাব সমর্থনের জন্য, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে তিনি এই পত্রখানি দেন।

এক্ষণে চুণীলাল অতিরিক্ত রসায়ন পরীক্ষক, রসায়ন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক এবং ভৈষজ্য আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (In-Charge of the Medico-legal Section of the Department) হইলেন। শেষোক্ত পদে তিনি ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বহাল থাকেন। ১৮৮৯ হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তিনি অস্থায়ী-ভাবে প্রধান রসায়ন পরীক্ষক এবং রসায়ন অধ্যাপকের কর্ম্ম করেন এবং

---

* পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য।

১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে তৎকালীন রসায়ন পরীক্ষক ওয়াডেল্ (Lt. Col. Waddell) সাহেবের সমর্থনে ১ম শ্রেণীর এসিষ্ট্যাণ্ট্ সার্জ্জন বলিয়া গণ্য হন।*

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তৎকালীন প্রধান রসায়ন পরীক্ষক উইণ্ড্সর্ সাহেব (Lt. Col. F. N. Windsor, I.M.S.) বিগত মহাযুদ্ধে সামরিক চিকিৎসক হইয়া চলিয়া যান এবং ২৮শে এপ্রিল তারিখে আমাদের চুণীলাল এই পরম গৌরবজনক পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী বা ভারতীয় এই পদ † অলঙ্কৃত করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন নাই। বিশেষতঃ, বিলাত হইতে আই, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যতীত অন্যের এই পদে উপবিষ্ট হইবার অধিকার ছিল না। সুতরাং, চুণীলালের এই পদপ্রাপ্তি বাঙ্গালীর অতীব শ্লাঘার বিষয় এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ গুণগ্রাহিতার পরিচয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। চুণীলাল এই পদে ও প্রধান রসায়ন অধ্যাপকরূপে প্রায় ছয় বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া, ১৯২০ সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে ছয় মাসের ছুটী (Privilege Leave Preparatory to Retirement) লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি মেডিকেল কলেজ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। তাঁহার অবসর

---

* In accordance with the orders as conveyed in the Government of India, Home Department letter No. 352, dated the 8th July, 1881.

† An appointment only open to commissioned officers.

উপলক্ষ্যে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত সভা কর্ত্তৃক যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"The Council desire to place on record their regret at the retirement from Government service of Rai Chunilal Bose Bahadur, I.S O., M B., F C.S., who has for many years been connected with the College as a teacher, was for six years Professor of Chemistry and also a Member of the Council of the Medical College. During all these years, this officer has been untiring in his devotion to everything pertaining to the highest interests of the College and the welfare of the students. The Council trust that he may long be spared to enjoy his well-earned retirement.—অর্থাৎ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের অবসর গ্রহণে এই সভা তজ্জনিত দুঃখ স্মরণীয় রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া শিক্ষকরূপে এই কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন,—ছয় বৎসর এই কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিয়াছেন এবং এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এই কলেজের গৌরবকর স্বার্থ-সংরক্ষণ বা ছাত্রগণের মঙ্গল-সাধন সর্ব্ববিষয়ে সকল সময়েই ইনি অক্লান্তভাবে আন্তরিকতাসম্পন্ন ছিলেন। এই সভার বিশ্বাস, ইনি সুদীর্ঘ দিন ইঁহার সদুপার্জ্জিত অবসর ভোগ করিবেন।"

চুণীলালের অবসর দিনে, রসায়ন-পরীক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ পরীক্ষা-গৃহে (Laboratory), তাঁহার পরবর্ত্তী রসায়ন পরীক্ষক মেজর লয়েড.

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

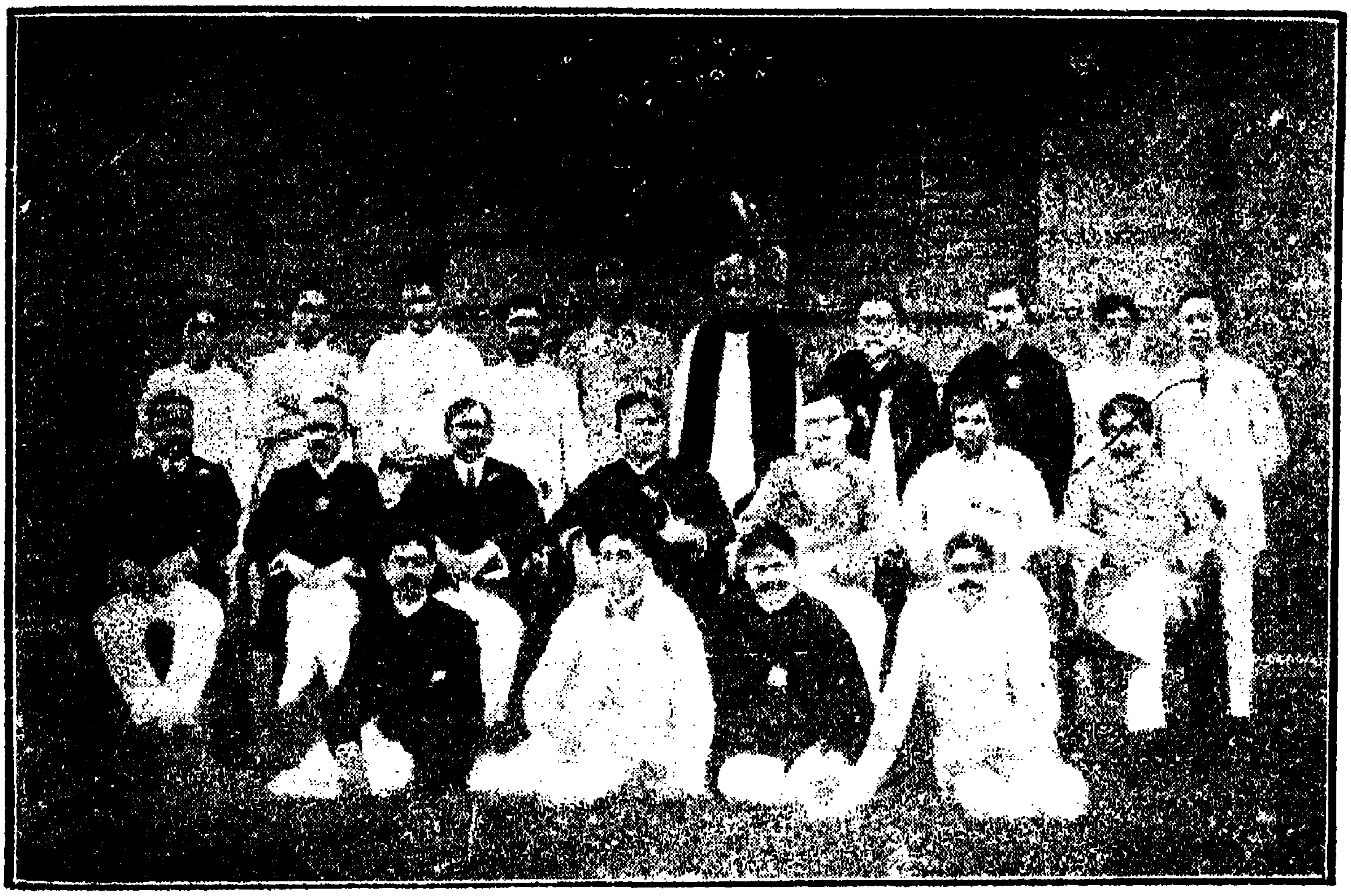

মেডিকেল কলেজ হইতে অবসর গ্রহণে

১। ক্ষিতীশ রায়, ভূপেন্ ঘোষ, ধীরেন্ ঘোষ, বিনয় মিশ্র, বিষাদ মিত্র, চারু বসু, বাবুলাল চক্রবর্ত্তী, ডাঃ হীরালাল সিংহ, কুঞ্জ পাল, ডাঃ সুধাময় ঘোষ।

২। ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী, ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী, প্রফেসার তুলসীদাস কর, রায়বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু, মেজর আর, বি, লয়েড্, ডাঃ সত্যেন্দ্র সেন, ডাঃ হেমনাথ অধিকারী।

৩। মিঃ এস্, মুখার্জ্জি, ডাঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, ডাঃ জে, বটব্যাল, মিঃ এইচ্, চক্রবর্ত্তী।

[৬৮ পৃঃ]

সাহেবের (Major R. B. Lloyd, I.M.S.) সভাপতিত্বে, চুণীলালকে এক অভিনন্দন দান করেন এবং তৎপ্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শনসূচক মন্তব্য খোদিত করিয়া, তাঁহাকে একটী রৌপ্যনির্ম্মিত চা-পাত্র উপহার দেন।

চুণীলালকর্তৃক প্রদত্ত রসায়ন-পরীক্ষা-বিভাগের ১৯১৯ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট পর্য্যালোচনা কালে, গভর্ণমেণ্ট চুণীলালের সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

"This is the last report that will be issued by Rai Chunilal Bose Bahadur, I.S O.; M.B., F.C.S , as this valued officer is now proceeding on leave pending retirement. Rai Chunilal Bose Bahadur has served for nearly 34 years in the Chemical Examiner's Department and during his arduous life, has acted as Chemical Examiner and Professor of Chemistry on no less than 13 occasions, and has continuously held this high important post for almost 6 years. With the Rai Bahadur's retirement, Government loses the service of one of the ablest and most popular officers serving under the Medical Department, a highly scientific chemist, a popular teacher and a man of many talents blessed with a spirit of intense application. No officer could have rendered Government more faithful and loyal service.—অর্থাৎ রায় চুণীলাল

বসু বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইহাই শেষ রিপোর্ট। এই সুদক্ষ কর্ম্মচারী অবসর গ্রহণের পূর্ব্ববর্ত্তী ছুটীতে যাইতেছেন। প্রায় ৩৪ বৎসর রায় বাহাদুর রসায়ন-পরীক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন এবং এই দায়িত্ব-পূর্ণ কর্ম্মজীবনে তিনি অন্যূন ত্রয়োদশ বার রসায়ন পরীক্ষক ও রসায়ন অধ্যাপকের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত সম্মানার্হ ও গুরুত্ব-বহুল পদে তিনি প্রায় ৬ বৎসর কাল স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রায় বাহাদুরের অবসরে, গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-কুশল ও জনমান্য কর্ম্মচারীকে হারাইতেছেন। তিনি অতি উচ্চাঙ্গের রসায়নবিদ্ ও লোকপ্রিয় শিক্ষক। তাঁহার বহুমুখিনী প্রতিভা একাগ্র সাধনায় সার্থক। এরূপ বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত কর্ম্মচারী অতীব বিরল।"

এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় চিকিৎসা-বিভাগের ১৯২০-২১-২২ সালের ত্রৈবার্ষিক রিপোর্টেও তাঁহার অবসর-সম্পর্কে বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বহু প্রশংসা-বাণী ঘোষিত হইয়াছিল। ৩৪ বৎসর ৫ মাস ১৩ দিন কর্ম্মান্তে চুণীলাল ১৯২০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে পেন্সন পান।

১৮৯৪ সালে কলিকাতায় ভৈষজ্য-আইন-সংক্রান্ত ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয় এবং তিনি তাহার সহকারী সভাপতি (Vice-President) নির্ব্বাচিত হন। তথায় তিনি ডাঃ ইভান্স্ (Capt. J. F. Evans, I.M.S.) সাহেবের সহযোগিতায় লিখিত বাঙ্গালায় অবাধ-বিষ-বিক্রয় নিষেধ-বিধির প্রয়োজনীয়তা (The Necessity for an Act to restrict the Free Sale of Poisons in Bengal) সম্বন্ধে একটী অতি মূল্যবান্ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত সভা কর্ত্তৃক ঐ প্রবন্ধ ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয় এবং তাহার

ফলে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে Poison Act বা অবাধ-বিষ-বিক্রয় আইন পাশ হয়।

এই ১৮৯৪ সালেই তিনি বিলাতের কেমিকেল সোসাইটীর ফেলো বা সভ্য (F.C.S.) নির্ব্বাচিত হন এবং ১৮৯৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন। তদবধি তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্‌টিস্ অফ্ সায়েন্স্ এণ্ড্ মেডিসিন্ (Faculties of Science and Medicine) এবং বোর্ডস্ অফ্ ষ্টাডিস্ ইন্ মেডিসিন্, কেমিষ্ট্রী, ফিজিওলজি, জুলজি ও বটানির (Boards of Studies in Medicine, Chemistry, Physiology, Zoology and Botany) সভ্য ছিলেন। তিনি কলা (Arts), বিজ্ঞান (Science) ও ভৈষজ্যবিষয়ের (Medicine) পরীক্ষকও ছিলেন। এতদ্ভিন্ন পোষ্টগ্রাজুয়েট্ (Post Graduate) বিজ্ঞান শিক্ষা-সমিতির ও তত্রত্য কার্য্যকরী কমিটীর সভ্য ছিলেন। ১৮৯৬ সালে তিনি কলিকাতা কাম্বেল মেডিকেল স্কুলের রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক পদে বৃত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে Indian Association for the Cultivation of Science নামক ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় রসায়ন শাস্ত্রের বক্তৃরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, পরিশেষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি ও ট্রাষ্টি হন। তিনি তিন বৎসর কাল কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের মুখপত্র Calcutta Medical Journal এর সম্পাদকতা করেন এবং বহুদিন এই ক্লাবের সহকারী সভাপতিও ছিলেন। তিনি বহুবর্ষ ধরিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি এবং সাহিত্য-সভা ও শোভাবাজার হিতসাধনী সভার

(Sobhabazar Benevolent Society) সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি কলিকাতার ডিষ্ট্রীক্ট্ চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর (District Charitable Society) অন্যতম সহকারী সভাপতি,—ইহার ইণ্ডিয়ান কমিটির সভাপতি, কলিকাতা অনাথ-আশ্রম (Calcutta Orphanage) ও অন্ধ বিদ্যালয়ের (Blind School) অন্যতম সেক্রেটারী, কলিকাতা টেম্পারেন্স্ ফেডারেশানের (Calcutta Temperance Federation) অন্যতম সহকারী সভাপতি, ইণ্ডিয়ান প্রভিন্সিয়াল্ মেডিকেল সার্ভিসেস্ এসোসিয়েসানের (Indian Provincial Medical Services Association) সহকারী সভাপতি ও তত্রত্য বঙ্গ-শাখার সভাপতি ছিলেন। বহু বৎসর সেণ্ট্রাল টেক্সট্ বুক কমিটি (Central Text-Book Committee of Bengal) ও ইন্‌ডিজেনাস্ ড্রাগস্ কমিটির (Indigenous Drugs Committee) সভ্য ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগঠিত শ্রমিক সমস্যা-মীমাংসক সমিতির (Conciliation Panel) এড্ভাইসরি বোর্ড অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রীস্ (Advisory Board of Industries, Bengal) ও সেনিটারী বোর্ডের (Sanitary Board) তিনি সভ্য-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস্ লীগেরও (Bengal Social Service League) তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। বেথুন কলেজ ও স্কুল এবং সংস্কৃত কলেজিয়েট্ স্কুলের পরিচালক সঙ্ঘেরও তিনি মেম্বর ছিলেন। তাঁহার বাল্য শিক্ষাপীঠ বর্ত্তমান শ্যামবাজার এ, ভি, (Anglo-Vernacular) স্কুল তাঁহাকে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত (প্রায় সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর) পরিচালক সভার সভাপতিরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছে। বেলগাছিয়ার কারমাইকেল কলেজ

পূর্ব্বে যখন আর, জি, করের (ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর) স্কুল নামে খ্যাত ছিল, তখন চুণীলাল উহাতে শিক্ষকতা করিতেন, পরে উহা কলেজে পরিণত হইলে, প্রথমে তিনি উহার কার্য্যকরী সমিতির সভ্য এবং পরিশেষে আজীবন সভ্য হন।

এতদ্ভিন্ন, চুণীলাল বাঙ্গালার ও বাঙ্গালার বাহিরের বহুতর শিক্ষা-বিষয়ক, সামাজিক ও দেশ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯২৩ সালে কলিকাতায় যে প্রদর্শনী হয়,—তাহাতে তিনি রসায়ন বিভাগের অন্যতম কর্ম্মসচিব হন। বাঙ্গালার গৌরব বেঙ্গল কেমিক্যাল্ ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কসের পরিচালক সঙ্ঘের তিনি চেয়ারম্যান এবং কলিকাতা কেমিক্যাল্ কোং ও কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের ডিরেক্টার ছিলেন।

১৮৯৬ সালে চুণীলাল পরিশোষিত লবণ-দ্রব (Saturated Solution of Common Salt) সাহায্যে, বিষপানে মৃত মানুষের ও গোমেষাদির অন্ত্রসমূহ (Viscera, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি) পচন অবস্থা হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া, এক যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। তদনুযায়ী বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের শাসন-বিভাগে, মৃতদেহ রক্ষাকল্পে উক্ত লবণ-দ্রব ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি করবী পুষ্পবৃক্ষের রাসায়নিক ক্রিয়া ও বিষ-ক্রিয়া (The Chemistry and Texicology of Nerium Odorum) সম্বন্ধে এক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। তাহাতে তিনি করবীর অজ্ঞাতপূর্ব্ব ক্রিয়া বা ধর্ম্ম আবিষ্কার করেন এবং তৎসম্বন্ধীয়

পরীক্ষা-পদ্ধতি বিবৃত করেন। ইতঃপূর্ব্বে জগতের আরও দুই একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক করবী সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের আবিষ্ক্রিয়ায় উক্ত দ্রব্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। চুণীলাল যে নীতি অবলম্বন করিয়া উক্ত আবিষ্কার লোকলোচনের সমক্ষে আনয়ন করেন,—তাহাকে তিনি এতদ্দেশীয় ভাষানুযায়ী "করবীন্" সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার এই অভিনব আবিষ্ক্রিয়ামূলক প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে "কোট্‌স্ মেমোরিয়াল" পুরস্কার (Coates Memorial Prize) প্রদান করেন।* যখন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার রোজার্স (Sir Leonard Rogers) কুষ্ঠরোগবিষয়ক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় ইন্‌জেক্‌সানের জন্য Gynocardic Acid হইতে পরিশুদ্ধ দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া, চুণীলাল তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

১৯১৭ সালে কলিকাতায় সমগ্র ভারত মাদক-নিবারণী সভার (All India Temperance Conference) অধিবেশন হয়,—তিনি তাহার সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯২২ সালে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য

* ১৮৮৯ সালের ২৯শে মে তারিখে কোট্‌স্ মেমোরিয়াল ফণ্ডের সেক্রেটারী ভেষজ-সংক্রান্ত গবেষণার উৎসাহ দানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২৭০।/০ অর্পণ করেন। ঐ টাকার বার্ষিক আয় হইতে উক্ত বিষয়ে মৌলিক গবেষণাকারীকে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। চুণীলাল সর্ব্বপ্রথম ঐ পুরস্কার পান।—Calcutta University Calendar.

এই প্রবন্ধ ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৯০১ সালের Annual Scientific Memoirsএ মুদ্রিত হয় এবং চুণীলালের The Scientific & Other Papers Vol. I গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সম্মেলনের অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হন। উক্ত দুই সভায় পঠিত তাঁহার মূল্যবান্ অভিভাষণ সভার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; ১৯১৭ ও ১৯১৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিজ্ঞান-জনসঙ্ঘের (Science Convention) অধিবেশনে তিনি ইংরাজিতে অতি সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। প্রথম বর্ষের বক্তব্য ছিল,—বাঙ্গালীর খাদ্য-সংক্রান্ত উৎকর্ষ সাধনের কতিপয় উপায় নির্দ্দেশ (Some Practical Hints to improve the Dietary of the Bengalis)। দ্বিতীয় বর্ষে তিনি দুইটী লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন,—(১) The Science Association and its Founder (বিজ্ঞান সভা ও তাহার প্রবর্ত্তক ও (২) Some Common Food-Stuffs (কতিপয় সাধারণ খাদ্য)। প্রত্যেক বক্তৃতা উক্ত সভার কার্য্য-বিবৃতি পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯২০ সালে নাগপুরে সায়েন্স কংগ্রেসের (Science Congress) সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে তিনি Choice of Food (খাদ্যের রুচি) ও ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শিল্প ও সমাজ প্রদর্শনীতে (Industrial and Social Exhibition) Food (খাদ্য) শীর্ষক বক্তৃতা দেন। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে সাহিত্যসভা, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিজ্ঞানসভা, Y. M. C. A. ও University Institute প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে জল, বায়ু, খাদ্য, চা, কাগজ প্রভৃতি বহুতর স্বাস্থ্য ও শিল্প বিষয়ক বক্তৃতা দান করেন। ১৯২০ সালে এপ্রিল মাসে কলিকাতা টাউন হলে যে স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে তিনি Impure Air and Infant Mortality (দূষিত বায়ু ও শিশু-মৃত্যু) শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অমূল্য বক্তৃতাবলী ও

প্রবন্ধরাজি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ The Scientific and Other Papers নামক বিরাট্ গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে।

চুণীলাল যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থসম্ভার লিখিয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন ও তৎসূত্রে শুধু দেশবাসীর নহে, সমগ্র জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

বাঙ্গালা গ্রন্থ

	নাম		প্রকাশ কাল
১।	ফলিত রসায়ন	...	১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ
২।	রসায়ন-সূত্র	...	১৮৯৭ ,,
৩।	জল	...	১৯০০ ,,
৪।	বায়ু	...	১৯০৩ ,,
৫।	পুরী যাইবার পথে	...	১৯০৩ ,,
৬।	কাগজ	...	১৯০৬ ,,
৭।	চা	...	১৯০৮ ,,
৮।	খাদ্য	...	১৯১০ ,,
৯।	শারীর স্বাস্থ্য-বিধান	...	১৯১৩ ,,
১০।	পল্লী-স্বাস্থ্য	...	১৯১৬ ,,
১১।	পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন	...	১৯১৯ ,,
১২।	নীলাচল	...	১৯২৬ ,,
১৩।	স্বাস্থ্য-পঞ্চক	...	১৯২৮ ,,

ইংরাজি গ্রন্থ

	নাম		প্রকাশ কাল
১।	A Lump of Coal	...	১৯০২ খৃষ্টাব্দ
২।	Combustion	...	১৯০৫ ,,
৩।	A Pinch of Common Salt.	...	১৯০৬ ,,
৪।	The Tip of a Match	...	১৯০৭ ,,
৫।	The Health of Indian Students.	...	১৯১৩ ,,
৬।	Marriage Dowry	...	১৯১৪ ,,
৭।	Prevention of Small Pox	...	১৯১৫ ,,
৮।	Milk-Supply of Calcutta, its Hygienic, Social and Commercial Aspects.	...	১৯১৮ ,,
৯।	A Few Hints on Sanitary Reconstruction.	...	১৯১৯ ,,
১০।	Sir Gooroodass Banerjee	...	১৯২১ ,,
১১।	The Scientific and Other Papers Vols. I and II	...	১৯২৪ ,,
১২।	Food	...	১৯৩০ ,,

উক্ত গ্রন্থতালিকা হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে, এই অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ দৈনন্দিন কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও, কি অক্লান্ত ভাবে—শুধু সাহিত্যসাধনা নহে, বহুতর জনহিতকর সৎসাহিত্যের

সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আমরা উক্ত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দিতেছি। আবার তিনি যে শুধু বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষার সুলেখক ছিলেন, তাহা নহে, উক্ত দুই ভাষাতেই তাঁহার বক্তৃতা শক্তি ছিল বিপুল। সাহিত্যিক, সামাজিক বা বৈজ্ঞানিক বহু সভাতে আমরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। তাঁহার বলিবার ভঙ্গিতে ভাবের উচ্ছ্বাস্ ছিল খুব কম ;—ভাষা অতি সরল, প্রাঞ্জল, অতি সহজেই প্রাণস্পর্শী। বাজে কথা বলিতে, অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিতে, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। যাহা বলিতেন, সমস্তই কাজের কথা, ভাবিবার কথা,—ভাবিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া, জাতীয় জীবনের কৃষ্টি সাধন করিবার জন্য ঋষিবাক্যের ন্যায় অমূল্য অবদান-বাণী।

যাহা হউক, এতক্ষণ আমরা দেখিয়া আসিতেছি, চুণীলাল তাঁহার প্রতিভার রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া, প্রতিষ্ঠার পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতেছেন ; এক্ষণে দেখিব, এই প্রতিষ্ঠার পথ অতিবাহন করিতে করিতে, তিনি কি কি সম্মানের রত্নরাজি আহরণ করিয়াছেন।

১৮৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে চুণীলাল রাজদত্ত প্রথম সম্মান 'রায় বাহাদুর' উপাধি* লাভ করেন এবং ১৯১৫ সালের ৩রা জুন তারিখে I.S.O. (Companion of the Imperial Service

---

* তখন তিনি মাত্র ৩৭ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে উক্ত সম্মানজনক উপাধিলাভ তৎকালে খুব কম ব্যক্তিই করিয়াছিলেন।

Order) পদবীতে সম্মানিত হন। শেষোক্ত সম্মানলাভ বিশিষ্ট গুণ-সম্পন্ন রাজকর্ম্মচারীর ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ডাঃ চুণীলাল কলিকাতার সেরিফ্ নিয়োজিত হন। চিকিৎসকের মস্তকে এই সম্মান-বর্ষণ মাত্র দুইবার ঘটিয়াছে। মহামনীষী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি,—সি, আই, ই, প্রথম এই সম্মান লাভ করেন। দ্বিতীয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি চুণীলাল। চুণীলাল যখন কলিকাতার সেরিফ্ সেই সময়, পুনর্গঠিত ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন সূত্রে, রাজখুল্লতাত মহামান্য ডিউক্ অফ্ কনট্ (Duke of Connaught) এবং তৎপরে আমাদের মহামান্য বর্ত্তমান যুবরাজ (Prince of Wales) ভারতে আগমন করেন। তখন জাতীয় আন্দোলন পূরা দমে চলিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সে আন্দোলনের কর্ণ ধারণ করিয়া আছেন। যুবরাজের ভারত-আগমনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সন্দর্শনের বিরুদ্ধে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। এই সময় সেরিফ্ চুণীলালকে তাঁহার অনিবার্য্য কর্ত্তব্য পালন করিতে সাতিশয় বেগ পাইতে হয়। একান্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, সেদিনকার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাণ্ডারসন্ (Hon. Sir Lancelot Sanderson, Kt., K.C.) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ;—"Dr. Bose had occupied this very important office with dignity and credit and had held it during a period when difficult questions had arisen, and in this sense, the duties of his office had been more responsible than those which were ordinarily attached

to it and which he had discharged in a way which was satisfactory to the citizens of Calcutta.—অর্থাৎ ডাঃ চুণীলাল সমস্যাসঙ্কুল সময়ে এই সেরিফের পদে যোগ্যতার সহিত অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সেরিফের সাধারণ কর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ হইয়াছিল এবং তিনি তাহা কলিকাতা নগরবাসীর পক্ষে সন্তোষজনক ভাবেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।”

সেরিফ হইবার পর বৎসর, ১৯২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমাদের ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষ্যে চুণীলাল সি, আই, ই, (Companion of the Order of the Indian Empire) এই গৌরবময় উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপাধি-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা স্থান, এমন কি, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশ হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার মহত্ত্ব, মনীষা ও নানামুখী কর্ম্মশক্তির প্রশস্তিবাচক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। এই সূত্রে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল জার্ণালের (Indian Journal of Medicine) জুন সংখ্যায় যে মন্তব্য বাহির হয়, তাহা এবং বাহুল্য ভয়ে, মাত্র দুই একখানি পত্র পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।*

চুণীলাল মাত্র ১০০৲ টাকা মাসিক বেতনে মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং যখন বহু সম্মানের জয়মুকুট পরিয়া অবসর গ্রহণ করেন,—তৎকালে তাঁহার বেতন ও অন্যান্য বৃত্তি সর্ব্বসাকল্যে সার্দ্ধ সহস্র মুদ্রায় দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার এই পদোন্নতি, অর্থসংস্থান ও রাজদ্বারে পুনঃ-

* পরিশিষ্ট (গ) দ্রষ্টব্য।

সেরিফ্ রূপে

পুনঃ সম্মানলাভের কথা উঠিলে, স্বতঃই মানসপটে উদিত হয়,—চুণীলালের ভূমিষ্ঠ হইবার দিনের কথা,—তাঁহার মাতামহীর ভবিষ্যদ্বাণী। প্রভাতী তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জন্ম,—তাই তিনি তাঁহার প্রসব-ব্যথাতুরা কন্যাকে "তোর ছেলে রাজা হবে" এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। আমরা দেখিতেছি, অতি শুভক্ষণেই উক্ত মঙ্গলবাণী তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল,—তাঁহার কথা ত ব্যর্থ হয় নাই! যে দুঃস্থ অবস্থা হইতে চুণীলাল ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে, তিনি রাজাই হইয়াছিলেন বলিলে নিতান্ত হাসির কথা হয় না। বিশেষতঃ, লোকমুখে প্রচারিত তাঁহার খ্যাতি ও রাজদত্ত সম্মান যে তাঁহাকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অবশ্য, চুণীলালের মাতা চুণীলালের সৌভাগ্য-শশী ষোলকলা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন;—তবে পুত্রের ললাটে প্রথম রাজটীকা অঙ্কনের দিনে তিনি জীবিতা ছিলেন। ১৮৯৯ সালের নববর্ষে চুণীলাল "রায় বাহাদুর" হন, আর চুণীলালের মাতা ঐ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি (২৮শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ) তারিখে, তাঁহার সেই রাজকল্প পুত্রের অঙ্কে মস্তক ন্যস্ত করিয়া, পরমসুখে চির-নিদ্রায় নিদ্রিতা হন। চুণীলালের পিতৃদেবের ভাগ্যে সে অবসরটুকু ঘটে নাই,—তবে তিনি সুখের মুখ দেখিয়া গিয়াছেন, চুণীলালের তখন ক্রমোন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। চুণীলালের পিতা দীননাথ ১৮৯৫ সালের ১৩ই মার্চ্চ (৩০শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩০১ বঙ্গাব্দ) তারিখে স্বর্গারোহণ করেন।

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া চুণীলালের রাজদ্বারে সম্মানলাভের কথা বলিয়া আসিয়াছি এবং তাহাতে তিনি যে একজন অতি উচ্চশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী

ছিলেন, তাহাই সমধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে। অবশ্য, তাহাতে যে তাঁহার মনস্বিতার গুণগান নাই, তাহা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এইটুকু, যে ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দিক্ দিয়া, চুণীলাল অনন্য-সাধারণ ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন,—সে দিকে আলোকসম্পাত করিয়াছে, তাঁহাকে প্রদত্ত আর একটী বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উপাধি,—"রসায়নাচার্য্য"। কাশীর ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে ১৯১৭ সালে * তাঁহাকে এই মহাসম্মানকর উপাধিতে অলঙ্কৃত করা হয়। ইহা দেশবাসীর দেওয়া সম্মান,—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের ন্যায়ই" পরম আদরের, পরম গৌরবের পরিচয়। আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলিলে তাঁহাদিগকে যত শীঘ্র আপনার বলিয়া চিনিতে পারি, ডাঃ বা স্যার রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র বা জগদীশচন্দ্র বলিলে তত শীঘ্র পারি না। কেমন যেন তফাৎ-তফাৎ বলিয়া বোধ হয় এবং সম্ভ্রমের সঙ্কোচে একটু দূরে-দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে! তদনুযায়ী রায় বাহাদুর চুণীলালকে "রসায়নাচার্য্য" অভিধানে অভিহিত করিয়া, প্রাণে একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। চুণীলাল যে আমাদের আপনার জন, তাহা যেন ঐ সংজ্ঞায় সম্যক্ অভিব্যক্ত। আরও কথা,—বাপ, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি,—পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতির যে নামকরণ করিয়া থাকেন, তাহাই বহুল পরিমাণে গৃহীত হয় এবং সেই নামই সাধারণতঃ অমরতার স্পর্দ্ধা করে। কেন না, তাহা যে আত্মীয়তার অমৃত-নিষেকে সার্থক,—সে যে অন্তরের—প্রাণের আহ্বান!

---

* সম্বৎ ১৯৭৩, পৌষ, শুক্লাদ্বিতীয়া। পরিশিষ্ট (ঘ) মানপত্র দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সেবা

রসায়নাচার্য্য চুণীলালের গ্রন্থরাজির দুই একখানি ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থই বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক,—তিনি তাঁহার সেই সাধনা-লব্ধ ফল দেশবাসীকে বণ্টন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। দেশপ্রাণ, কর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মী তিনি, দেশের দুর্গতির পানে চাহিয়া, কিসের অভাবে দেশের এই দুর্গতি, তাহা তিনি অনুধাবন করিতেন এবং তাহার নির্দ্ধারণ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। শুধু অবসর-বিনোদনের জন্য তাঁহার গ্রন্থরচনা নহে; শুধু পুঁথিগত কাল্পনিক-জ্ঞানসঞ্চয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের মনের খোরাক জোগাইবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিতেন না। শুধুই কাজের কথা, দেশের দুঃখহরণের কথা, দেশের স্বাস্থ্য ও শিল্পনৈতিক উন্নতির কথা, ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভাবপ্রবণ দেশকে কর্ম্মপ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। কেন না, অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতাই এ দেশকে অলস, নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। বলিতে কি, এই আত্যন্তিকী ভাবপ্রবণতাই এই জাতিকে শৃঙ্খল পরাইয়া রাখিয়াছে! বলিতে চাহিনা,

ভাবপ্রবণতা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, বরং বলিব, ভারতের এই ভাবপ্রবণতা জগতের বহু সভ্যজাতির পরম কাম্য বস্তু। তবে যতটা ভাব লইয়া আমরা ভাবুক হইয়া বসিয়া আছি, জগতে থাকিতে হইলে, সংসারী হইতে হইলে, ততটা ভাবুকতার প্রয়োজন নাই। উক্ত ভাব-প্রাচুর্য্যের ফলে, ধনশালীর অপদার্থ পুত্রের ন্যায় আমরা সেই বহুজন-বাঞ্ছিত ভাব-ধনের অপব্যবহার করিতেছি মাত্র। বস্তুতঃ, ভাবে পেট চলে না, কর্ম্ম চাই। শুধু ভাব দেখাইয়া, ভাবের ঘরে চুরি করিয়া কোনও লাভ নাই, উহাতে দৈন্য ঘনীভূত হয় মাত্র। হইয়াছেও তাই,—আজ আমাদের স্বর্ণপ্রসূ দেশে আমরা অন্নের কাঙ্গাল, স্বাস্থ্যের কাঙ্গাল। প্রতিভার আমাদের অসদ্ভাব নাই, তবু আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। তাহার প্রধান হেতু, আমরা কর্ম্মপ্রবণ নহি। অবশ্য, চিরকালই যে আমরা এইরূপ ছিলাম, তাহা বলিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে দীর্ঘদিন হইতেই যে আমরা সুপ্ত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। চুণীলালের প্রচেষ্টা ছিল, জাতির কর্ম্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। কর্ম্মপ্রেরণাকে সার্থক করিতে হইলে, চাই স্বাস্থ্য। দৈহিক তথা মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পাদনকল্পে দেশবাসীর যাহা যেমনটী হওয়া দরকার, তিনি তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের উপাসক এবং সেই বিজ্ঞানই বর্ত্তমান যুগে দীপবর্ত্তিকা হস্তে জগতের প্রগতির পথ নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং, তাঁহার বৈজ্ঞানিক-গবেষণা-প্রসূত গ্রন্থসমূহ বর্ত্তমান যুগের অমূল্য সম্পদ বলিতেই হইবে। এই অধ্যাত্মবাদের দেশে এখনও হয়ত অনেকে এমন আছেন, যাঁহারা বলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা কতিপয় উর্ব্বর মস্তিষ্কের নিষ্ফল

কণ্ডূয়নমাত্র। তাঁহাদের অবগতির জন্য রসায়নাচার্য্যের উক্তি * কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"অনেকে মনে করেন যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা সাধারণের বিশেষ কিছু লাভ হয় না। ইহাতে বিস্তর অর্থব্যয় হয় এবং এই সকল গবেষণার ফল কেবল মতবাদ (Theory) রূপেই থাকিয়া যায়, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে ইহাদিগের উপযোগিতা দেখা যায় না। বলা বাহুল্য যে, এই মত নিতান্ত সংকীর্ণতাজ্ঞাপক। একটু ধীরভাবে অনুসন্ধান করিলেই এই মতের ভ্রম সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যে প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার আদিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠিত। আজ আমরা তাপ, তাড়িত ও আলোককে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়া, জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে যে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছি এবং কাল ও দূরত্বের ব্যবধান নাশ করিয়া, দিন-দিন জীবনযাত্রার পথ সুগম হইতে সুগমতর করিতেছি, তাহার মূলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিদ্যমান। যখন তাড়িত-তরঙ্গের প্রকৃতি সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন কে মনে করিয়াছিল যে, এই গবেষণা দ্বারা বার্ত্তাবহন-ব্যাপারে পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্-বৃদ্ধি নির্ণয়ের জন্য যে অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, কে বলিতে পারে যে, ভবিষ্যতে উহা ভারতবর্ষের প্রত্যেক কৃষকের ঘরে ধনাগমের পথ সুগম করিয়া দিবে না?

---

* মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ। ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ।

রসায়নাচার্য্য চুনীলাল

নিউটন যখন সূর্য্য-কিরণ বিশ্লেষণ দ্বারা বর্ণছত্রের (Spectrum) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন কে জানিত যে, তাঁহার আবিষ্কারের সাহায্যে, মানুষ যে কেবল সুদূরস্থিত ব্যোমচারী গ্রহ-নক্ষত্রাদির গঠনোপাদান ও গতি-বিধি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে, তাহাই নহে, উহা দ্বারা কত নূতন মূল পদার্থের আবিষ্কার এবং ভূগর্ভস্থ বিবিধ পদার্থের উপকরণ সহজে অভ্রান্তরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহাদিগকে তাহার কাযে লাগাইতে সমর্থ হইবে ? মহাত্মা পাষ্টুরের জীবাণু সম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রোগ-প্রতিষেধকতত্ত্ব এবং কতিপয় নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক কুরী এবং তাঁহার বিদুষী পত্নী মাদাম্ কুরী রেডিয়াম্ (Radium) ধাতু আবিষ্কার করিয়া, ডল্টনের যে পরমাণুবাদ বৈজ্ঞানিক জগতে এ পর্য্যন্ত অকাট্য সত্য বলিয়া গৃহীত হইত, তাহা ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, কেবল তাহাই নহে, এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের ফলে, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, জাগতিক যাবতীয় পদার্থের মূলে ইলেক্ট্রন্ নামে একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ অবস্থিত এবং ইহা জড় নহে, তাড়িত শক্তির সূক্ষ্ম কণা মাত্র। ইহার গতি ও শক্তি অপ্রতিহত। ইহা সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরমাণুর দেহ হইতে অবিরাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, অপরিমেয় তাপ উৎপাদন করিতেছে এবং এই বিক্ষেপণের ফলে, যে সকল পদার্থকে আমরা অপরিবর্ত্তনীয় মূল পদার্থ (Elements) বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের রূপান্তর হইয়া, তাহারা ভিন্ন পদার্থে পরিণত হইতেছে। লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার আশায়, যে স্পর্শ-মণির আবিষ্কারের জন্য মানুষ প্রাণপাত করিয়া, যুগযুগান্তর-

ব্যাপী নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, কুরী-দম্পতির রেডিয়াম্ ধাতু আবিষ্কারের ফলে, তাহা এতদিন পরে সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে। এতদিনের পর বৈজ্ঞানিকেরা আশা করিতেছেন যে, তাঁহারা একদিন পরীক্ষাগারে নিকৃষ্ট ধাতুসমূহকে সুবর্ণে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবেন। আর্য্য ঋষিগণ যোগবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে জড় বলিয়া কোনও বস্তু নাই,—সমস্তই এক অদ্বিতীয় শক্তির রূপান্তর মাত্র! নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে কেবল একই শক্তি প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছে।

"রসায়নী বিদ্যার গবেষণার ফলে, জড় ও জৈব জগতের প্রভেদ দিন দিন লোপপ্রাপ্ত হইতেছে। এতদিন যে সকল পদার্থ প্রাণশক্তির সাহায্য ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বলে সেই সকল পদার্থ এখন পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতেছে। সুরা, শর্করা, নীল প্রভৃতি রঞ্জন দ্রব্য, নানা প্রকার সুগন্ধি এবং উদ্ভিজ্জ ঔষধাদি নিত্যব্যবহার্য্য বিবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু, যাহাদিগের উৎপত্তি কেবল প্রকৃতির পরীক্ষাগারেই সম্ভব বলিয়া মানুষ এতদিন বিশ্বাস করিত, এখন সেই সকল পদার্থ মানুষের পরীক্ষাগারে উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে বস্ত্ররঞ্জনের জন্য উদ্ভিজ্জ বর্ণ ব্যবহৃত হইত। স্বনামখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ্ পার্কিনের গবেষণার ফলে, পরীক্ষাগারে বহুসংখ্যক বিবিধ বর্ণের এনিলিন্ (Aniline) নামক রঞ্জন দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ কদাকার পাথুরে কয়লা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। এই রঞ্জন দ্রব্য এখন লোকে এত সস্তাদরে পাইতেছে যে, উদ্ভিজ্জ রঞ্জন দ্রব্যের ব্যবহার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধ-সরঞ্জামের যাবতীয় রাসায়নিক স্ফোটক দ্রব্য (Explosives) বহুশ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে পরীক্ষাগারে উৎপন্ন হইতেছে। ফল-শস্যাদিকে ব্যাধি ও কীটাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহা সমস্তই বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসূত। অস্ত্র-চিকিৎসায় এবং সংক্রামক রোগ-নিবারণকল্পে মানুষ যে সাফল্যলাভ করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাহার মূলে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহ এত সমৃদ্ধিশালী। সুতরাং, গবেষণাকার্য্য স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ ফলপ্রদ না হইলেও, ভবিষ্যতে উহা যে সমগ্র মানবসমাজের ধনবৃদ্ধির সহায় ও অশেষ কল্যাণের আকর, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

"বিজ্ঞান যে কেবল মানুষের পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির সহায়, তাহা নহে, ইহার অন্য একটী মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্যলাভই বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানই মানব মনকে সর্ব্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া, ভাব ও কর্ম্মজগতে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করিয়া থাকে। কেবলমাত্র সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কত শত মহানুভব ব্যক্তি বিজ্ঞানের সেবায় স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই কার্য্য দ্বারা তাঁহারা যে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন, তাহার মূল্য নাই। সে কেবল তাঁহাদেরই অনুভূতির বিষয়, অপরের নহে। আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় বৈজ্ঞানিক ঋষিগণও কায়মনোপ্রাণ সমস্তই তাঁহাদের উপাস্য দেবতার আরাধনায় নিয়োজিত করিয়া থাকেন, সাংসারিক বিষয়ে

তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না, আর্থিক চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, তন্ময় হইয়া সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্টদেবতার সাধনা করিয়া থাকেন। যখন দেখি, আর্কিমিডিস্ তাঁহার অভীপ্সিত বিষয়ের সন্ধানলাভ করিয়া, স্নানাগার হইতে আনন্দের আতিশয্যবশতঃ জ্ঞানহারা হইয়া, উলঙ্গাবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে, 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' (Eureka) মাত্র শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনই বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য্যে তন্ময়ত্বের পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই। যখন দেখি যে, যিনি চীনাবাসন (Porcelain) প্রথম প্রস্তুত করেন, * ইন্ধনের অভাবে নিজের বাক্স, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু দাহ্য সামগ্রী গৃহে ছিল, পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, তিনি সেই সকল পদার্থ চুল্লীতে নিক্ষেপ করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণ তাপ উৎপাদনকরতঃ স্বীয় অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখনই আবার আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তন্ময়ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হই। গবেষণা জীবনের যে একটী প্রকৃষ্ট সাধনা, ইহা যেন আমরা কখন বিস্মৃত না হই।"

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল শুধু গবেষক বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সংস্কারপন্থী বৈজ্ঞানিক। দেশের দুঃস্থতার সংস্কার করিতে তিনি গবেষণা করিতেন। দুঃস্থতার সংস্কার করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রথমে স্বাস্থ্যের জন্য সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার মূলে বিশুদ্ধ জল, বায়ু, খাদ্য প্রভৃতির অনিবার্য্য প্রয়োজন। তাই তিনি তৎসমুদয়ের

* Bernard Palissy.

আলোচনায় মস্তিষ্ক চালনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি গভীর জলের মাছ হইয়াও, সমুদ্রের তলে শুধু ডুবিয়া থাকিতেন না, সমুদ্র-তরঙ্গের উপরও ভাসিয়া বেড়াইতেন। গিরিগুহাবাসী তপস্বীর ন্যায় সংসারের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া, নির্জ্জনে তপস্যা করিতেন না,—তিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় গৃহী, লোকশিক্ষক তপস্বী ছিলেন। তাই তাঁহার সাধনা ছিল, অতি সাধারণ, অতি প্রয়োজনীয়, নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুগুলি লইয়া। যাহাতে জাতির আশু মঙ্গল, যাহাতে জাতি সমগ্রভাবে উঠিতে পারে, যাহা জাতি স্বল্প আয়াসে অধিগত করিয়া, প্রগতির ও কৃষ্টির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে, তাহাই ছিল তাঁহার গবেষণার বিষয়বস্তু। তিনি তাঁহার গবেষণাপ্রসূত বা অভিজ্ঞতালব্ধ ফল কৃপণের ধনের ন্যায় সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না, 'লোকহিতায়' চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেন। লেখার মধ্য দিয়া, বক্তৃতার মধ্য দিয়া, তিনি তৎসমুদয় সকলের সমক্ষে আনয়ন করিতেন। আবার শুধু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, লোকহিতকর বহু অমূল্য প্রবন্ধ বহুল প্রচারের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। পাছে তাঁহার বক্তৃতা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য না হয়, পাছে তাঁহার মঙ্গলময় অবদান-বাণী সকলের চিত্তকে সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ করিতে অক্ষম হয়, সেজন্য ছায়াচিত্রসাহায্যে বক্তৃতাদান করিতেন। আমরা এস্থলে তাঁহার গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ফলিত রসায়ন। রচনা কাল—১৮৯৫ সাল। ডাঃ আর, জি, কর মহাশয় পরিচালিত কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে যখন ফলিত রসায়নী বিদ্যার শিক্ষকতা করিতেন, সেই সময়ে চুণীলাল উক্ত বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব

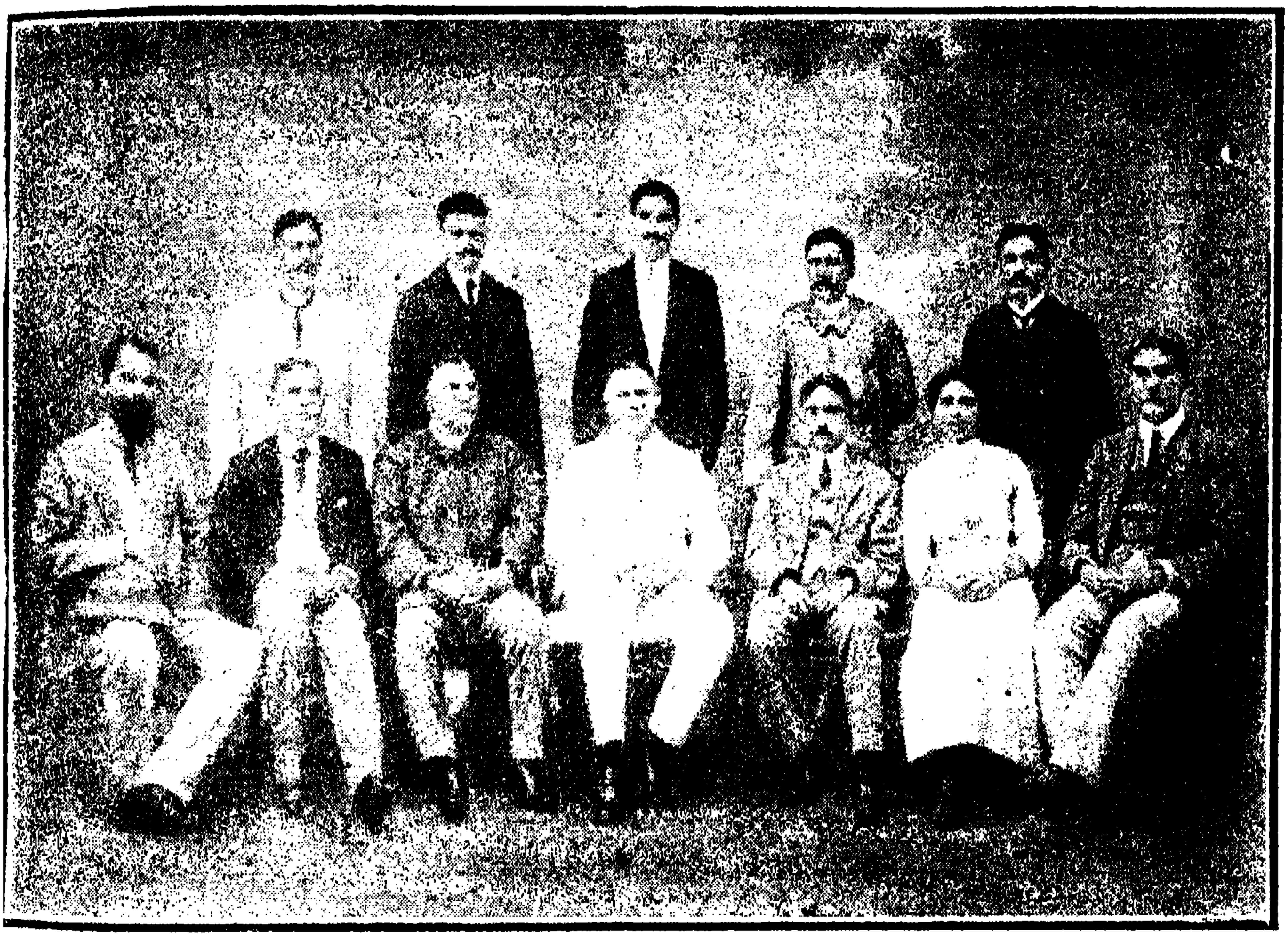

ক্যাম্বেল স্কুল ও হাসপাতালে

দণ্ডায়মান—ডাঃ উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ডাঃ তারক সুর, ডাঃ বিধান রায়,
ডাঃ ননীলাল পান, ডাঃ লালবিহারী গাঙ্গুলী ;
উপবিষ্ট—ডাঃ হরিনাথ ঘোষ, কর্ণেল সার্‌পল্‌স্‌, ডাঃ চুণীলাল বসু, মেজর রেট্‌,
ডাঃ করুণা চ্যাটার্জ্জি, মিস্‌ কক্‌স্‌, ডাঃ কেদার দাস।

করেন এবং ডাঃ কর মহাশয়ের উৎসাহে বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই ভাবের গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম লিখিত হয়। তৎকালে পাশ্চাত্যভাষায় লিখিত রসায়নগ্রন্থ মন্থন করিয়া, যথাযথ পরিভাষা সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করা কত দুরূহ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদিও এই গ্রন্থ ব্যবহারিক রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকরূপে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও, ইহাতে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এম্, বি, ও এল্, এম্, এস্ পরীক্ষার বিষয়গুলিও চুণীলাল সহজবোধ্য করিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। সেজন্য উক্ত বিষয়ে পরীক্ষার্থী বাঙ্গালী ছাত্রগণের পক্ষে ঐ গ্রন্থ অতীব প্রয়োজনীয় ও পরম সহায়ক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই পুস্তকে রাসায়নিক মূল সূত্র, রাসায়নিক পরীক্ষা-প্রণালী এবং ধাতু, দ্রাবক, মূত্র, প্রস্তর ও উদ্ভিজ্জ উপক্ষার পরীক্ষা বিশদ-রূপে বিবৃত হইয়াছে। চুণীলাল তাঁহার এই প্রথম ও মহামূল্য গ্রন্থ তাঁহার ছাত্রজীবনের শিক্ষক এবং কর্ম্মজীবনের পরম হিতৈষী বন্ধু ওয়ার্ডেন্ সাহেবের (Leut. Col. Warden M.D.) নামে উৎসর্গ করিয়া, তৎপ্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

রসায়ন-সূত্র। রসায়নী-বিদ্যা-বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। চুণীলাল যখন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে অধ্যাপনা করিতেন, সেই সময় বাঙ্গালা ভাষায় সহজঅধিগম্য পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থের আশু আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন। তৎকালে ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক্ ইন্‌স্‌ট্রাক্‌সান্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রগণের পক্ষে উক্ত বিষয় অধ্যয়নের বিশেষ অসুবিধা ছিল। সেই অভাব মোচনের জন্য, চুণীলাল ক্যাম্বেল

মেডিকেল স্কুলে প্রদত্ত বাঙ্গালাভাষায় লিখিত তাঁহার বক্তৃতাবলীর সমন্বয়ে প্রথমে এই গ্রন্থ রচনা করেন। পরে ক্রমান্বয়ে এই গ্রন্থের ছয়টী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি সংস্করণে ইহাতে নব নব বিষয়ের সন্নিবেশ হওয়ায়, বর্ত্তমানে উহা একখানি বিরাট্ ও শিক্ষার্থীর পক্ষে অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থরূপে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হিসাবে এইখানি প্রথম গ্রন্থ বলিতে পারা যায়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে গভর্ণমেণ্ট এই গ্রন্থ ক্যাম্বেল, ঢাকা ও কটক মেডিকেল স্কুলের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করেন। বর্ত্তমানেও বহু বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ছাত্র উক্ত গ্রন্থ-সাহায্যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

জল। জলের উপাদান ও ধর্ম্ম, পানীয় জল এদেশে কি প্রকারে দূষিত হয় এবং তাহা পরিষ্কৃত করিবার উপায়, পানীয় জল দ্বারা বিসূচিকা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তিকায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের দেশে সাহিত্যসভাই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চ্চার পথ প্রদর্শন করেন এবং এই গুরুতর কার্য্যের ভার চুণীলালের হস্তে ন্যস্ত হয়। তৎসূত্রে তিনি উক্ত সভায় 'জল' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ঐ প্রবন্ধই পরিশেষে পুস্তিকাকারে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায় এমন কি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আশাতীত ভাবে সমাদৃত হয়।

বায়ু। ১৯০৩ সালে মুদ্রিত হয়। এ প্রবন্ধটীও সাহিত্যসভায় পঠিত হয়। বায়ুর উপাদান, রাসায়নিক ও ভৌতিক ধর্ম্ম, কি কি কারণে বায়ু দুষিত হয়, বায়ুর সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ কি, দূষিত বায়ু সেবন দ্বারা

রোগ ও মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য এবং দূষিত বায়ু কি উপায়ে পরিষ্কৃত হইতে পারে ইত্যাদি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ এই গ্রন্থে অতি মনোজ্ঞভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থোক্ত তত্ত্বসমূহ প্রায় সবই পুরাতন। কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকে সরল বাঙ্গালা ভাষার পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া, চুণীলাল এমন সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন যে, পড়িতে বসিলে বিরক্তির পরিবর্ত্তে পড়িবার আগ্রহ বাড়িয়া যায়। চুণীলালের নীরসকে সরস করিবার, পুরাতনকে নূতন করিয়া বলিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি তাঁহার এই গ্রন্থখানি প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে উৎসর্গ করিয়াছেন।

কাগজ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও সাহিত্যসভায় পঠিত। দেশী ও বিলাতী কাগজ কি উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে, এই পুস্তিকাখানিতে তাহার বিশদ বিবরণ আছে। তাহা ছাড়া পুরাযুগের প্রস্তর ও ইষ্টক লিপি হইতে আরম্ভ করিয়া, বর্ত্তমান যুগের কাগজ পর্য্যন্ত একটী ধারা-বাহিক ইতিহাস চুণীলাল এই পুস্তিকায় প্রকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক দক্ষতার সহিত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই নিবন্ধ তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ৺নলিনবিহারী সরকার মহাশয়কে উৎসর্গ করেন।

খাদ্য। এই গ্রন্থখানি বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে রসায়নাচার্য্যের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান বলিতে পারা যায়। এই গ্রন্থনিহিত প্রবন্ধাবলী সাহিত্যসভা, রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাব প্রভৃতি বহু সভায় ধারাবাহিকভাবে পঠিত হয় এবং প্রথমে ১৯১০ সালে সাহিত্যসভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর প্রথম সংখ্যারূপে মুদ্রিত হয়। পরে একাল পর্য্যন্ত ইহার আরও চারিটী সংস্করণ হইয়াছে। প্রতি সংস্করণে নব নব উদ্ভাবিত, সুচিন্তিত ও

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

সুপরীক্ষিত আহারতত্ত্ব-বিষয়ক নিবন্ধের সংযোজনা করিয়া, গ্রন্থকার যে শুধু এই গ্রন্থখানির আকৃতিগত ঋদ্ধি সাধন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, বহু নিত্য প্রয়োজনীয় ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশে গ্রন্থখানিকে প্রতি হিসাবী-গৃহস্থের নিকট গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় আদর ও শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানাবিধ ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রবল দেখা যায়। এ সম্বন্ধে আবশ্যক জ্ঞানের অভাবও একান্ত বিরল নহে। তাহার ফলে, বাঙ্গালী জাতি ভারতের অন্যান্য শক্তিশালী জাতি অপেক্ষা ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। অবশ্য, আরও বহু হেতু আছে, যাহাতে বাঙ্গালা স্বাস্থ্যহীনতার গালি বহন করে। যাহা হউক, বাঙ্গালীর উক্ত দুর্ণাম দূরীকরণোদ্দেশ্যে চুণীলালের এই গ্রন্থ প্রণয়ন। আহারতত্ত্ব বিষয়টী অতি বিপুল এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র ও রসায়ন-বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মেডিকেল কলেজের রসায়ন-পরীক্ষক ছিলেন বলিয়া, এই জটিল বিষয়ের আলোচনা ও তৎসূত্রে খাদ্যোপাদানসমূহের বিশ্লেষণ প্রভৃতি চুণীলালের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা কৃপণের ধনের ন্যায় নিজের জন্য লুক্কায়িত রাখিতেন না, লোকশিক্ষার জন্য, দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য অকাতরে বিলাইয়া দিতেন। বিশেষতঃ, আমাদের দেশের ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সতত নিবদ্ধ থাকিত। কিসে তাহাদের দেহ সবল, সুস্থ ও শ্রমশীল হয়, তজ্জন্য তাঁহার চিন্তার অন্ত ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাহাদের খাদ্য সম্বন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এজন্য এই গ্রন্থখানি প্রতি ছাত্র ও ছাত্রাবাসের কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্যপাঠ্য।

বর্ত্তমান যুগে আবিষ্কৃত খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) সম্পর্কীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর খাদ্য বিষয়ক এ ভাবের সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চুণীলাল এই গ্রন্থ খানি তাঁহার সোদরোপম বন্ধু, সাহিত্যসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁহার স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারকার্য্যের প্রধান উৎসাহদাতা স্বর্গগত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে উৎসর্গ করেন।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান।—রচনা কাল ১৯১৩। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন :—

"আমাদের দেশে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় তত্ত্বসমূহের যথোচিত আলোচনা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বিষয়সংক্রান্ত নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে দেখা যায়। আমাদিগের সংসারে দৈনন্দিন যাবতীয় কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। এই সকল কার্য্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে, বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যরক্ষার অনেকানেক মূলতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতাহেতু সংসারে সর্ব্বদা অনর্থ ঘটিতে দেখা যায়। এই সকল বিষয়ে জ্ঞান তাঁহাদিগের মধ্যে প্রসারলাভ করিলে, সংসার হইতে রোগ, শোক, অর্থনাশ ও মনস্তাপ যে অনেকাংশে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাতে আমাদের অন্তঃপুরমহিলাগণের এবং সাধারণ জনবর্গের মধ্যে এই সকল প্রয়োজনীয় তত্ত্ব প্রচারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। * * * এই পুস্তকের যথাস্থানে পাশ্চাত্য

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধির সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছি এবং যে পাশ্চাত্য বিধিগুলি এদেশের উপযোগী নহে, তাহাদিগের পরিহার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমরা অনেকানেক স্বাস্থ্যবিধি সংস্কার ও অভ্যাসের বশয়র্ত্তী হইয়া, সামাজিক প্রথারূপে বহুকাল হইতে পালন করিয়া আসিতেছি। এই সকল বিধি বহুদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অনেক স্থলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং, অবহেলার বিষয় নহে।"

উক্ত ভূমিকা হইতে বুঝা যায়, কোন্ সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, চুণীলাল এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকের প্রায় সমস্ত অংশই "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। চুণীলাল তাঁহার এই প্রিয় গ্রন্থ খানিকে তাঁহার স্বর্গত পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর নামে উৎসর্গ করেন।

পল্লী-স্বাস্থ্য। রচনা কাল—১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। রামমোহন লাইব্রেরীতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সান্ধ্যসভায় ছায়াচিত্রসাহায্যে চুণীলাল উক্ত বিষয় সম্বন্ধে যে সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা এবং তৎপরে সাহিত্যসভায় উক্তভাবে প্রদত্ত 'ম্যালেরিয়া' নামক বক্তৃতার সমবায়ে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রণয়নের পর চুণীলাল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 'পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধ বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্যোগে পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করান। অত্যল্পকাল মধ্যে উক্ত পুস্তক ও পুস্তিকার একাধিক সংস্করণ হয়। সহরে উদ্ভূত, বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইলেও, পল্লীর দুর্দ্দশার জন্য চুণীলালের প্রাণ কাঁদিত। তিনি নিঃসংশয়ে

বুঝিতেন, পল্লীর দুঃখ-দুর্গতি দূর না হইলে, জাতীয় কল্যাণ সুদূর-পরাহত। কিন্তু তিনি সহরে বসিয়া পল্লীসংস্কারের স্বপ্ন দেখিতেন না, পল্লীবিষয়ে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের জন্য পল্লীবাসও করিতেন। বিশেষতঃ, হুগলী জেলাস্থ ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, পল্লীর ব্যথা নির্ণয় করিবার সুযোগ তাঁহার যথেষ্টই জুটিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, অবসরক্রমে তিনি নানা সভা-সমিতি-সূত্রে সহরের উপকণ্ঠস্থ ও দূরবর্ত্তী পল্লীর সংশ্রবে প্রায়ই আসিতেন। সুতরাং, বাঙ্গালার পল্লীগুলি কেন যে দিন দিন জনহীন, স্বাস্থ্যহীন ও সুখলেশহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব ঘটে নাই। সহরের মোহ পল্লীর অবস্থাপন্ন বা উন্নতিশীল ব্যক্তিগণকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে এবং অর্থকরী বিদ্যার দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ক্রমে ক্রমে পল্লীবাস বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিতেছেন না,—ইহাই যে পল্লীর দুঃস্থতার অন্যতম ও প্রধানতম কারণ, চুণীলাল তাহা প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পল্লীর অতীত সুখ, সম্পদ ও সৌন্দর্য্য আজ উপকথায় পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ ও স্বাস্থ্য-সামর্থ্যভরা দেহ আজ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। চুণীলাল সেই হৃত-সৌন্দর্য্য পুনরুদ্ধার করিয়া, উক্ত উপকথাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। কি পন্থায় কার্য্য করিলে পল্লী পুনর্বায় বাসযোগ্য হইতে পারে, এমন কি, নগর অপেক্ষা সমধিক লোভনীয় শান্তি-নিকেতনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার উদ্ভাবনা ও অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ অমূল্য উপদেশাবলী তিনি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'পল্লীস্বাস্থ্য' খানিকে চুণীলাল তাঁহার পরম সুহৃদ্,

ভারতের লুপ্ত গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া, তৎপ্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, প্রীতি ও অনুরাগ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রন্থ তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ অনিলপ্রকাশ ও শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশের সম্পাদকতায়, তাঁহার উদ্ভাবিত বহুতর বিষয়ে সুসমৃদ্ধ ও নানাবিধচিত্রসম্বলিত হইয়া, "পল্লী-স্বাস্থ্য ও সরল স্বাস্থ্যবিধান" নাম ধারণ করিয়া নবকলেবরে বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালা ও আসাম উভয় প্রদেশের শিক্ষাবিভাগ গ্রন্থখানিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া তাঁহাদের নির্ব্বাচন-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

নীলাচল। রচনা কাল ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ। অনেকের ধারণা, রসায়নাচার্য্য চুণীলাল কতিপয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থপ্রণেতা,—বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের দুরূহ ও নীরস বিষয়-গুলিকে তিনি তাঁহার সরস ও সাবলীল ভাষায় সহজবোধ্য ও সর্ব্বজন-মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতেন কি করিয়া,—এইটুকু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার মধ্যে কর্ম্মপ্রাণতার সহিত ভাবপ্রাণতা নিত্য ক্রীড়া করিত। অতি সামান্য হইলেও, যৌবনে যে তাঁহার মধ্যে কবি-প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রকাশ পাইত, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার বর্ম্মায় অবস্থিতিকালে রচিত "বিজয়া" শীর্ষক কবিতায় পাইয়াছি। এতদ্ভিন্ন, আমরা তাঁহার অনেকগুলি কবিতা পাঠ করিয়াছি, ভাবমাধুর্য্যে সেগুলি অনবদ্য, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, তিনি যদি চর্চ্চা রাখিতেন ত কাব্যজগতেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। তিনি ছিলেন ভাবুক কর্ম্মী। নিছক্ কর্ম্মপ্রবণতা মানুষকে সম্পূর্ণ করে না, তাহার সহিত ভাবপ্রবণতার মিলন চাই। ভাবই কর্ম্মকে পথ দেখাইয়

চলে. ভাবই কর্ম্মের ক্ষেত্র তৈয়ারী করে, ভাবই কর্ম্মকে মধুময় ও মঙ্গলনিদান করিয়া তুলে। মানুষ যে কর্ম্ম করিয়া জগৎপূজ্য হয়, মূলে তাহার ভাবের খেলা, ভাবের প্রেরণা। ভাবহীন কর্ম্মী নাই এবং যদি থাকে ত সে কর্ম্মের মেসিন্ মাত্র; তাহার মধ্যে ব্যক্তিত্ব নাই,—মনুষ্যত্ব নাই। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ভাবপ্রবণতা ও কর্ম্মপ্রবণতা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল বলিয়াই ত তাঁহারা যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য সার্থককর্ম্মী!—বুদ্ধদেব চৈতন্যদেবের কথা না-হয় না-ই ধরিলাম।

চুণীলাল যে ভাবুক ছিলেন এবং ভাব-সাহিত্য-রচনায় প্রথম শ্রেণীর লেখক ছিলেন, তাঁহার এই একমাত্র গ্রন্থ 'নীলাচলে'ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠক-পাঠিকাগণের ঔৎসুক্য-নিবারণার্থ, অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে, এই গ্রন্থ হইতে দুই একটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। চুণীলাল হিন্দুর তীর্থকূলের চূড়ামণি পুরী সম্বন্ধে লিখিতেছেন :—

"বোধ হয়, যেন এই তীর্থে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধন করিয়া, একের উপর অন্যের আধিপত্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। নীলোর্ম্মিচঞ্চল অনন্তবিস্তৃত মহোদধি এই তীর্থের পদ-প্রক্ষালনে নিত্য ব্যস্ত রহিয়াছে। অমল-ধবল সৈকতময় বেলা-ভূমি এই তীর্থের পবিত্রতার প্রতিবিম্বস্বরূপ দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রসারিত রহিয়াছে। এই তীর্থের পবিত্র উরঃ-শোভিত শ্রীমন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া যেন গোলোক ও ভূলোকের ব্যবধান অন্তর্হিত করিয়া, ভক্তজনের মানসে অপার আশা ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করিতেছে। এই তীর্থের ক্রোড়ে সমাসিত অগণিত মনুষ্য-কণ্ঠের অবিরাম উচ্চারিত জগন্নাথের

পবিত্র নাম, সংসারক্লিষ্ট, দুঃখভারে অবসন্ন মানবের প্রাণে নূতন জীবনীশক্তি প্রদান করিতেছে। পুরী বাস্তবিকই হিন্দুর অদ্বিতীয় তীর্থ।”

প্রাচীন ভারতের জৈন ও বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখিয়া, ভাবুক চুণীলাল লিখিতেছেন :—

“সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল, জগৎপূজ্য বুদ্ধদেব তিরোহিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত পবিত্র নৈতিক ধর্ম্ম, কালমাহাত্ম্যবশে হতশ্রী ও ক্ষীণতেজ হইলেও, আজিও এই ধর্ম্ম প্রাচ্য ভূখণ্ডের নানাস্থানে শান্ত জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়া, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোকের ধর্ম্ম-পিপাসা নিবারণ করিতেছে। প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মবিদ্বেষের তাড়নায়, ভারতবাসী এই রাজ-সন্ন্যাসীর প্রদর্শিত মহোচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, অধঃপতনের নিম্নগ সরল পথে সবেগে প্রধাবিত হইতেছে। অপরিহার্য্য কর্ম্মফলের চিত্র তাহাদিগের আত্মসর্ব্বস্ব চিন্তার আবিলতাময় স্রোতে প্রতিফলিত হইতে সমর্থ হইতেছে না। আজি এই দুর্দ্দশার দিনেও খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির পাষাণমূর্ত্তি যেন কালের প্রতাপ অবহেলা করিয়া, প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতা, আত্মসংযম, পরহিতৈষণা ও বৈরাগ্যের অমর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।”

অতীত যুগের শিক্ষা, সাধনা ও কৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, ভাবপ্রাণ চুণীলাল বিভোর হইয়া গিয়াছেন। এই সেই খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, যাহার নির্জ্জন গুম্ফাগুলির অভ্যন্তরে বসিয়া, ভারতের কত মহাত্যাগী মহামনীষী লোকত্রাণ মহদ্ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বাহ্নে আত্মসংযম ও বৈরাগ্যের অনুশীলন করিতেন। তাহার ফলেই

ত তাঁহারা অমানুষিক ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, সংকল্পের দৃঢ়তা, চরিত্রের মহত্ত্ব, ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ও ধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ, তৎসন্নিহিত সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, মধ্য এসিয়া, তুরস্ক ও পারস্যে বৌদ্ধধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন্ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতীতের পানে বিস্ময়মুগ্ধনেত্রে চাহিতে চাহিতে, চুণীলাল একবার বর্ত্তমান যুগের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেছেন। আমরা কি ছিলাম, আর কি হইয়াছি! লোকশিক্ষক মহাজাতির আজ কি অধঃপতনই না হইয়াছে! কিন্তু চুণীলাল,—পুরুষকারে নির্ভরশীল চুণীলাল,—অতীত গৌরবের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাসম্পন্ন চুণীলাল, আত্মধিক্কারে জর্জ্জরিত হইয়াও, হতাশ হইতেছেন না; তিনি আশার বাণী প্রচার করিতেছেন। এস্থলে আমরা তাঁহার সেই উচ্ছ্বাসময় ভাবগভীর অমূল্য অবদানবাণী উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বর্ত্তমান ও প্রাচীন ভারতের শিক্ষার মধ্যে কি প্রভেদই দৃষ্টিগোচর হয়! আমরা যে সেই প্রাচীন ভারতবাসীর বংশাবলী, তাহা এক্ষণে কেবল কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের যেরূপ ধর্ম্মহীন শিক্ষা হইতেছে, তাহার ফলে ক্লেশে অসহিষ্ণুতা, সংকল্পে শিথিলতা, চরিত্রের হীনতা, ত্যাগে পরাঙ্মুখতা এবং কর্ত্তব্যে অনাস্থা ব্যতীত আর কিছুই আশা করা যাইতে পারে না। এক একটী মানুষ লইয়াই জাতি। এরূপ ক্লৈব্যদুষ্ট লোক লইয়াই যে জাতি সংগঠিত, জগতে সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থান তাহার দ্বারা অধিকৃত হওয়া অসম্ভব। জাতি প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার উপাদানস্বরূপ এক একটী করিয়া মানুষ প্রস্তুত করিতে হইবে। এখনও সময় আছে, এখনও সুবিধা আছে। বস্তু চলিয়া গিয়াছে বটে,

কিন্তু তাহার ছায়া এখনও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় নাই। সঙ্গীত নীরব হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রতিধ্বনির মধুর নিক্কণ এখনও কর্ণকুহর হইতে অবসৃত হয় নাই। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু উত্তাপ এখনও অনুভূত হইতেছে। সূর্য্য পশ্চিম-গগনের প্রান্তে অদৃশ্য হইয়াছেন, কিন্তু এখনও রবিকরপ্রদীপ্ত লোহিতশীর্ষ মেঘমালা অস্তমিত দিবাকরের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দৃষ্টান্ত অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। যদি আমরা প্রাচীন ভারতের সেই জগন্মান্য মনীষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করি, যদি আমরা প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের উদার ধর্ম্মে হৃদয়কে বলীয়ান্ করিয়া, বর্ত্তমান ভারতে এক একটী করিয়া মানুষ প্রস্তুত করি, তবেই আবার এই শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রতিষ্ঠাবিহীন দুর্ব্বল জাতি, প্রাচীন ভারতের বংশাবলী বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করা প্রত্যেক মনুষ্যের নিজের নিজের চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শাস্ত্রোক্ত সদ্দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশ দ্বারা নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিতে হইবে, আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হইবে, পরার্থ-পরতা শিক্ষা করিতে হইবে, সত্যপরতা জীবনের মূলমন্ত্র করিতে হইবে. হিংসা-দ্বেষ বর্জ্জন করিয়া জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানুষকে স্নেহ ও সখ্যের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে হইবে। যখন এইরূপ লোক লইয়া এই দুর্ব্বল উপেক্ষিত হিন্দুজাতি পুনর্গঠিত হইবে, তখন ঐশ্বর্য্য বল, ক্ষমতা বল, বিদ্যা বল, স্বাস্থ্য বল, স্বরাজ বল, সকলই আপনা হইতে আসিয়া আমাদিগের করতলগত হইবে।"

পুরীর সমুদ্রের দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক ভাবুক চুণীলাল লিখিতেছেন :—

"দিগন্তবিস্তৃত অতলস্পর্শ সুনীল জলরাশি এবং তদুত্থিত ফেণমণ্ডিত শুভ্রশিরঃ অগণিত তরঙ্গরাজি মনকে মুহূর্ত্তমধ্যে সান্ত হইতে অনন্তের রাজ্যে লইয়া যায় এবং ইহার অসীম শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া, মন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া মনে হয় যে, বিজ্ঞানবলে মানুষ যে এই উচ্ছৃঙ্খল প্রাকৃতিক শক্তিকে কিয়ৎ পরিমাণে স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা মানবের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।"

এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত 'নীলাচল' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে, তিনি শুধু বিজ্ঞান-সাহিত্যে শক্তিশালী লেখক ছিলেন না, ভাব-সাহিত্য রচনায় তাঁহার লিপি-চাতুর্য্য যথেষ্টই ছিল। অথচ, বলা বাহুল্য, তিনি শুধু ভাবের উচ্ছ্বাস্ লইয়া গ্রন্থ লিখিতেন না ; শুধু মনোরঞ্জনের জন্য, শুধু অলস-প্রকৃতি পাঠক-পাঠিকার অবসরবিনোদনের জন্য তিনি তাঁহার চিন্তাশক্তির অপব্যবহার করিতেন না। তাঁহার রচিত প্রত্যেক গ্রন্থ মহদুদ্দেশ্যমূলক। ১৯০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া চুণীলাল সস্ত্রীক পুরী গমন করেন। সেই সময়ে এবং তৎপরে আরও কয়েকবার, উড়িষ্যার নানাস্থানে প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির স্মৃতি-চিহ্নের কিয়দংশ মাত্র তাঁহার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি তৎসমুদয়ের একটী সংক্ষিপ্ত বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তিনি বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন :—

"এই ভূখণ্ডে (উড়িষ্যায়) প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য-বিদ্যার যে

সকল নিদর্শন এখনও কালের এবং তদপেক্ষা অধিকতর নির্ম্মম ধর্ম্মদ্বেষী মানবের আক্রমণ হইতে কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া ধ্বংসাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, অনুসন্ধিৎসু উড়িষ্যা-ভ্রমণকারী পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার নিমিত্ত উহাদিগের একটী ক্ষুদ্র বিবরণী এই ক্ষুদ্র পুস্তক মধ্যে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে নূতন কথা বলিবার কিছু নাই। যাহা যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে, যাহা ভারতের এবং ভারতের বাহিরের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হইয়া, নানা গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর নূতন কথা বলিবার কি আছে? তবে সুবিধা ও অবকাশের অভাব হেতু যাঁহারা ঐ সকল বিস্তৃত বিবরণী পাঠ করিতে সমর্থ হইবেন না, আশা করি, এই ক্ষুদ্র পুস্তক এ বিষয়ে কতক পরিমাণে তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ভ্রমণকালে বিশ্বাসী 'সাথীর' কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে।"

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এইটুকু, তিনি নূতন কিছু বলেন নাই সত্য—তবে তিনি পুরাতনকে নূতন করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার বলিবার ভঙ্গিতে পুরাতন চর্ব্বিত-চর্ব্বণে পর্য্যবসিত হয় নাই। অধিকন্তু, জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তিনি এমন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং তৎসমুদয়ে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্যের সমাবেশ করিয়া, তাঁহার স্বভাব-সুলভ প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট ভাষার সাহচর্য্যে সমগ্র গ্রন্থখানিকে এমন উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন যে, আজিকার এই উপন্যাস-প্লাবিত যুগে, বোধ হয়, চলচ্চিত্ত পাঠক-পাঠিকাও ইহার শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থ যে

প্রতি অনুসন্ধিৎসু পুরীযাত্রীর পক্ষে বিশ্বস্ত পদ-প্রদর্শক, সে বিষয়ে সন্দেহ ত নাই-ই, বরং, সাধারণ যাত্রীরও অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করে।

প্রস্তাবনার উপসংহারে চুণীলাল আর একটী বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন,—যাহা হইতে তাঁহার গুণগ্রাহী সুধিজনোচিত উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়নের অন্য উদ্দেশ্য বলিয়া,—এস্থলে শুধু তাঁহার সেই মন্তব্যটুকু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"উড়িষ্যাবাসীদিগকে আমরা সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকি। যাঁহারা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর কাল ব্যাপিয়া, আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি এবং প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার অনুশীলনের নিদর্শন সবিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া যদি কাহারও হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিবার বাসনা জাগরূক হয়, তাহা হইলে, আমি আমার সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিব।"

"নীলাচলের" কিয়দংশ ১৯০৩ সালে সাহিত্য-সভায় পঠিত ও "পুরী যাইবার পথে" নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। তৎপরে মাসিক বসুমতীর কয়েক সংখ্যায় "পুরী-দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধে এই গ্রন্থনিহিত পুরীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিশেষে প্রকাশিত অংশগুলি সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে নবাংশের সহিত সংযোজিত হইয়া, "নীলাচল" নামে মুদ্রিত হয়। চুণীলাল তাঁহার এই প্রিয় গ্রন্থখানি তাঁহার হরিপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করিয়াছেন।

স্বাস্থ্য-পঞ্চক। প্রকাশ কাল—১৯২৮ খৃষ্টাব্দ। 'বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য' 'বাঙ্গালীর খাদ্য', 'খাদ্যপ্রাণ (Vitamins)', 'মাতৃকল্যাণ ও শিশু-মঙ্গল' এবং 'সেবিকার কর্ত্তব্য' এই পাঁচটী প্রবন্ধের সমাবেশে, বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর সুযোগ্য সম্পাদক ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের অনুরোধে ও প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়। চুণীলাল এই গ্রন্থের সকল স্বত্ব, স্বাস্থ্যজ্ঞান-প্রচার জন্য উক্ত মণ্ডলীকে দান করেন। তৎপূর্ব্বে প্রবন্ধগুলি বার্ষিক বসুমতী, বঙ্গলক্ষ্মী ও মাতৃমন্দির পত্রিকায় স্থান লাভ করিয়াছিল। চুণীলালের "শারীর স্বাস্থ্য-বিধান", "পল্লী-স্বাস্থ্য" প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থগুলির ন্যায় একখানিও বহু নূতন নূতন বাঙ্গালীর অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। তৎকালীন স্বাস্থ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Public Health, Bengal) বেণ্টলী সাহেবকে চুণীলাল এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত চুণীলাল "চা" নামক আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহার রচনাকাল অনুমান ১৯০৮ সাল। বর্ত্তমানে উক্ত পুস্তিকা দুষ্প্রাপ্য। তবে বহুদিন হইল, পুস্তিকাখানি আমরা পাঠ করিয়াছি। উহাতে এতদ্দেশে চা-পানের প্রচলনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে এবং উহার উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপূর্ণ আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থেও চুণীলাল চা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন।

এইবার আমরা চুণীলালের ইংরাজিভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

Sir Gooroodass Banerjee. প্রকাশ কাল—১৯২১ সাল। ১৯১৮ সালের ২রা ডিসেম্বর প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা স্যার গুরুদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার তিরোধানের অল্পদিন পরে, চুণীলাল স্কটিশ্ চার্চ্চ্ কলেজ ম্যাগাজিনের তৎকালীন অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যাপক ক্যামেরন্ সাহেবের অনুরোধে, স্বর্গগত মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু জীবনীর কিয়দংশ মাত্র ১৯১৯—২০ সালে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯২১ সালে উহা সম্পূর্ণ হয় এবং গ্রন্থাকারে বাহির হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় চুণীলাল লিখিতেছেন ঃ—

"It gives me much pleasure to present to the public a brief sketch of the life and work of Sir Gooroodass Banerjee whom I loved, admired, respected and honoured as my GURU."

এই উক্তিটুকু হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, কি ভাবের প্রেরণায় চুণীলাল উক্ত মহাত্মার জীবনচরিত লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। গুরুদাসকে তিনি তাঁহার জীবনের আদর্শস্থানীয় করিয়া ছিলেন বলিয়া, তৎপ্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধানিবেদন করিবার জন্যই তাঁহার এই লেখনীধারণ। গুরুদাসের ন্যায় মাতৃ-ভক্তি, জীবনের প্রথম ভাগে দৈন্যের প্রতি উপেক্ষা ও অপ্রতিহত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিকার্য্যে একাগ্রবুদ্ধি ও অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অপাপবিদ্ধ চরিত্রবল চুণীলালের জীবনেও অতি সুন্দরভাবে বিকশিত হইয়াছে. দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বলিতে চাহিনা, চুণীলাল গুরুদাসকেই মাত্র অনুসরণ বা অনুকরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। আমাদের বক্তব্য এইটুকু,—গুরুদাস যে সদ্‌গুণরাজি লইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন, চুনীলালের মধ্যেও তাহার অসদ্ভাব ছিল না। গুরুদাসের মনোবৃত্তি ও চুনীলালের মনোবৃত্তি অনেকটা এক ছাঁদের ছিল, এবং ছিল বলিয়াই চুনীলাল উক্ত মনীষীর প্রদীপ্ত প্রতিভার পাদদেশে নতশির হইয়া, তাঁহার আদর্শকে নিজের আদর্শ জানিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। চুনীলাল গুরুদাস অপেক্ষা ১৬।১৭ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং, জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে চুনীলালের স্বচ্ছ হৃদয়-মুকুরে গুরুদাসের ভাস্বর ছবি প্রতিফলিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। ছাত্রজীবন হইতেই চুনীলাল গুরুদাসকে চিনিতেন, তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইতেন, তাঁহার আদর্শকে পূজা করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া, বৈদেশিক বা বিজাতীয় সুন্দরটুকুকে গ্রহণ করিতে হইলে, যে ভাবে জীবন যাপন করিতে হয়, গুরুদাসের মধ্যে সে ভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি সংঘটিত হইয়াছিল এবং দেশ-মাতৃকার সুসন্তান হইতে হইলে, গুরুদাসের অনুসৃত মার্গই সার্থকতার মণিকোঠার সন্ধান বলিয়া দিবে। যাত্রাপথের প্রারম্ভেই তিনি গুরুদাসকে সম্মুখে পাইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার পথভ্রান্তি ঘটে নাই। আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চুনীলাল বলিতেছেন,—

"My object in writing this sketch is to place before my countrymen (particularly the Student Community of Bengal whose devoted friend Sir Gooroodass was) the example of a great man, who succeeded in assimilating what was best in the cultures of the East and the West, who was ever inspired by pure and noble thoughts,

whose motto of life was Karma (work) for the sake of Karma only and who cheerfully devoted his whole life to the service of his King, his Country and Humanity. He preached as he practised 'plain living' and his life was a continuous record of 'high thinking'. Sir Gooroodass's example will ever shine as a beacon light to guide his countrymen to paths of right thoughts and right action.

অর্থাৎ যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা বা কৃষ্টির শ্রেয়কে আত্মস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যিনি নিষ্কলুষ উচ্চ চিন্তায় নিত্য অনুপ্রাণিত থাকিতেন, কেবল কর্ম্মার্থেই কর্ম্ম যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং যিনি তাঁহার সমগ্র জীবন রাজসেবায়, দেশসেবায় ও মানবতার সেবাকার্য্যে প্রসন্নচিত্তে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত আমার দেশবাসীর, বিশেষতঃ, তিনি যাহাদের পরম মিত্র ছিলেন, সেই ছাত্র-মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করাই আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রণয়নের উদ্দেশ্য। স্যার গুরুদাস নিজেও যেরূপ অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, অপরকেও সেইরূপ জীবন-যাপন করিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার সমস্ত জীবন নিরবচ্ছিন্ন উচ্চ চিন্তায় সমাহিত ছিল। স্যার গুরুদাসের দৃষ্টান্ত সচ্চিন্তা ও সদনুষ্ঠানের পথনির্দ্দেশে তাঁহার দেশবাসীর পক্ষে দীপবর্ত্তিকার ন্যায়ই চিরপ্রোজ্জ্বল রহিবে।"

চুণীলালের উক্ত মন্তব্যে আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে, যাহাতে এই দীপবর্ত্তিকা সহসা কালচক্রে বিস্মৃতির ঝঞ্ঝায় নির্ব্বাপিত না হয়, সেজন্য

তিনি তৎসৃষ্ট অভিনব হীরকাধারে তাহাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অতি সহজ, সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাঁহার এই গ্রন্থরচনা। সত্য সত্যই, ইহা যেন সত্বগুণময়ী দেবতার সাত্বিক পূজা! বাহ্যোত্তমের বাড়াবাড়ি নাই, উপচারের ছড়াছড়ি নাই; শুদ্ধ ধূপ-ধূনা ও পুষ্প-চন্দনে একান্ত শুচিতাপূর্ণ দেবার্চ্চন! কিন্তু এই ভাবের গ্রন্থকে ঠিক জীবনী আখ্যা দেওয়া চলে না,—প্রশস্তিই ইহার যথার্থ অভিধান। তবে একটী কথা, দোষলেশহীন জীবন যঁাহার, তাঁহার জীবনী লিখিতে গেলে, তৎসংশ্লিষ্ট প্রতি ঘটনার অবতারণায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসাবাদ বা গুণকীর্ত্তন ব্যতীত উপায় কি? যাহা হউক, এই গ্রন্থ প্রতি শিক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য,—প্রতি সংসারীর পক্ষেও ইহাতে শিখিবার ও শিখাইবার বহু বিষয় আছে। পারিতোষিক গ্রন্থ হিসাবে এইখানি প্রথম স্থানীয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার ল্যান্স্লট্ সাণ্ডারসন মহোদয়কে তৎকালীন সেরিফ্ চুণীলাল তাঁহার রচিত অন্যতম আদর্শ বিচারপতির জীবন-চরিতখানি উৎসর্গ করিয়া, যোগ্য হস্তে যোগ্য বস্তু অর্পণ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির দুইটী সংস্করণ হইয়াছে।

The Scientific and Other Papers, Vols. I & II. সঙ্কলন কাল ১৯২৪—২৫। রসায়নাচার্য্যের অমূল্য বক্তৃতাবলী ও প্রবন্ধরাজির শৃঙ্খলাবদ্ধ একত্র সমাবেশে দুই খণ্ডে এই গ্রন্থখানির প্রকাশ। সঙ্কলয়িতা,—রসায়নাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু এম্, বি,—এফ্, সি, এস্। চুণীলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত রায় সাহেব অমৃতলাল বসুর নামে উৎসর্গীকৃত। চুণীলালের এই

মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকরূপে

১। দণ্ডায়মান—ডাঃ অল্‌কক্‌, ডাঃ গিবন্‌স্‌, ডাঃ চার্লস্‌, ডাঃ ওয়াডেল্‌, ডাঃ চুণীলাল;

২। চেয়ারে উপবিষ্ট—ডাঃ মারে, ডাঃ জুবার্ট, ডাঃ হেরিস্‌, ডাঃ স্যাণ্ডার্স্‌, ডাঃ প্রেন্‌;

৩। ভূমিতে উপবিষ্ট—ডাঃ ড্রুরি, ডাঃ বার্ড্‌।

বক্তৃতাসমূহ এবং একক বা যুগ্মভাবে* লিখিত প্রবন্ধাবলী তাঁহার নানা বিষয়িনী গবেষণা ও আলোচনা শক্তির পরিচয়। বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা-বিষয়ক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় প্রায় সকলগুলি স্থানলাভ করে এবং কয়েকটীর প্রকাশ ফলে বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক ও সামাজিক বিষয়ে বহু আন্দোলন ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সঙ্কলয়িতা বিষয়ানুযায়ী নিম্ন-লিখিত শ্রেণীবিভাগ করিয়া প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলিকে গ্রথিত করিয়াছেন :—

১। Chemical and Pharmacological (রসায়ন ও ঔষধ-প্রস্তুতকরণবিষয়ক)।

২। Medical (চিকিৎসাবিষয়ক)

৩। Medico-legal (চিকিৎসা-আইনবিষয়ক)

৪। Industrial Chemistry (শিল্পরসায়নবিষয়ক)

৫। Hygiene and Public Health (স্বাস্থ্যবিষয়ক)

৬। Temperance (মাদক-সেবন-সম্বন্ধীয় সংযম)

৭। Popular Scientific Lectures (বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতাবলী)

৮। Miscellaneous (বিবিধ)

তন্মধ্যে প্রথম চারিটী ১ম খণ্ডে এবং পরবর্ত্তী চারিটী বিষয় ২য় খণ্ডে

---

* কয়েকটী রাসায়নিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ চুণীলালের সহকারী রসায়ন পরীক্ষক বা পরে প্রধান রসায়ন পরীক্ষক অবস্থায়, তৎকালীন প্রধান রসায়ন পরীক্ষক বা সহকারী রসায়ন পরীক্ষকের সাহচর্য্যে লিখিত হয়।

সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে প্রবন্ধাবলী ও বক্তৃতাগুলির ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি :—

প্রথম খণ্ড

Chemical and Pharmacological.

(১) On the Analysis of Certain Samples of Tinned Meat, (২) Note on Certain Reactions of an Alkaloid contained in the roots of Rauwolfia Serpentina, Benth, (৩) False Bikh or Bikhma, এবং (৪) Note on the Presence of a Cholesterol in the roots of Higrophila Spinosa—রাসায়নিক বিশ্লেষণ-মূলক প্রবন্ধ। তৎকালীন রসায়ন পরীক্ষক ডাঃ ওয়ার্ডেন্ সাহেবের সহযোগিতায় লিখিত। চুণীলাল তখন সহকারী রসায়ন পরীক্ষক। প্রথমটী ১৮৯০ সালে Chemical News পত্রিকার জুন সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী ১৮৯২ সালে Pharmaceutical Journalএর যথাক্রমে আগষ্ট ও অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। চতুর্থটী Pharmacographia Indica নামক মহাগ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হয়। (৫) Analysis of East Indian Plantains—কাঁটালী, চাঁপা ও চাটিম কলার বিশ্লেষণ চুণীলাল নিজে করেন, এই বিবৃতিও উক্ত মহাগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। (৬) On the Chemistry and Toxicology of Nerium Odorum with a description of a Newly-separated Principle—করবী সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ। ১৯০১ সালে লণ্ডনের বিখ্যাত Chemical Societyতে

প্রেরিত হয় এবং Indian Medical Gazetteএর আগষ্ট ও নভেম্বর সংখ্যায় ও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে Lyon's Medical Jurisprudenceএ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রবন্ধনিহিত উদ্ভাবনীশক্তির জন্য চুণীলালকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯০০ সালে 'Coates Memorial Prize' প্রদত্ত হয়। এই প্রবন্ধের বিষয় পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

(৭) The Toxic Principles of the Fruits of Luffa Ægyptiaca Mill, (Bitter Variety) *Tita Dhoondool*—মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ। এই সূত্রে এই জাতীয় (লাউ, কুমড়া, কাঁকুড়, তরমুজ প্রভৃতি আরও বহু সব্‌জী ফলের গুণাবলী রসায়নাচার্য্য কর্ত্তৃক বিশ্লেষিত হয়। ১৯০৬ সালে Calcutta Medical Journalএর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়।

(৮) A Brief Survey of Research-work in Chemistry in Bengal—বঙ্গদেশে রাসায়নিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত মূলক প্রবন্ধ। ১৯২১ সালে Science Conventionএর অধিবেশনে পঠিত এবং Modern Review পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২। **Medical.**

(১) A Case of Snake-bite, (২) Some Observations on Diabetes in India এবং (৩) Prevention of Small-pox—প্রবন্ধত্রয় যথাক্রমে ১৯০৫ সালে Indian Medical Gazetteএর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এবং ১৯০৭ ও ১৯১৫ সালে Calcutta Medical

Journalএর সেপ্টেম্বর ও মার্চ্চ সংখ্যায় বাহির হয়। সর্পদংশন, বহুমূত্র ও বসন্তের চিকিৎসাসূত্রে চুণীলাল নিজের উদ্ভাবিত ঔষধাদি প্রয়োগে যে অভিজ্ঞতা ও সার্থকতা অর্জ্জন করেন, প্রবন্ধ কয়টীতে তাহার দৃষ্টান্তযুক্ত বিশদ বিবৃতি আছে। তৃতীয় প্রবন্ধটী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং সাধারণের উপকারার্থ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল।

৩। **Medico-legal.**

চুণীলাল যখন মেডিকেল কলেজে Medico-legal Sectionএর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, সেই সময় কার্য্যসূত্রে তিনি বহুতর খুন, আত্মহত্যা, বিষপানে মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত নানাপ্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯০৪ সালে University Commissionএর সদস্যরূপে মাননীয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনে যান। চুণীলাল তখন সহকারী রসায়ন পরীক্ষক,—Medico-legal Section তাঁহার তত্ত্বাবধানে অবস্থিত। বলা বাহুল্য, বহু পূর্ব্ব হইতেই পরস্পর পরস্পরের সুপরিচিত। কমিশন-কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, জ্ঞানলিপ্সাজনিত কৌতুহলবশতঃ গুরুদাস উক্ত ভৈষজ্য-আইন বিভাগ পরিদর্শন করেন। চুণীলাল এত তৎপরতার সহিত তত্রত্য পরীক্ষা-প্রণালী, পর্য্যবেক্ষণজন্য দ্রব্যাদি সংরক্ষণের শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা, সতর্কতা প্রভৃতি তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ বুঝাইয়া দেন যে, তাহাতে বিচারপতি গুরুদাস চমৎকৃত হইয়া যান এবং সেই দিন হইতে কেমিকেল রিপোর্টের সারবত্তা তাঁহার চিত্তে আরও বেশী বদ্ধমূল হইয়া

যায়। পূর্ব্বে উক্ত কেমিকেল রিপোর্ট শুধু লিখিয়া পাঠাইলে চলিত না। পরীক্ষককে আদালতে হাজিরা দিতে হইত। চুণীলালের প্রচেষ্টায় উক্ত সাক্ষ্য দেওয়ার হাঙ্গামা রহিত হয়। ইহাও তাঁহার কৃতিত্বের কম পরিচয় নহে। তিনি এই আইনঘটিত-পরীক্ষাসংক্রান্ত যে কয়েকটী বিষয় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন, আমরা তাহার একটা তালিকা দিতেছি :—

(১) Deposit of Yellow Arsenic on the Endocardium in a Case of Arsenical Poisoning.	১৮৯২ সালে Indian Medical Gazetteএর যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
(২) On the Necessity for an Act restricting the Free Sale of Poisons in Bengal.	Surgeon Capt. J. F. Evans M.B., F.C.S. মহাশয়ের সাহচর্য্যে লিখিত এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে Indian Medical Congressএর প্রথম অধিবেশনে পঠিত হয়। কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক ইহা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণের ফলে ১৯০৪ সালে অবাধ-বিষ-বিক্রয়-নিরোধ আইন প্রবর্ত্তিত হয়।
(৩) Memorandum on the use of a Saturated Solution of Common Salt as a Pre-	১৮৯৭ সালে Indian Medical Gazetteএর মার্চ্চ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং বাঙ্গালা গভর্ণ-

servative for Viscera sent for Chemical Examination.

মেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। এই নিবন্ধনিহিত প্রস্তাব সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং তাহার ফলে, বাঙ্গালা, বিহার-উড়িষ্যা ও আসাম গভর্ণমেণ্ট মৃত মানুষ ও গোমেষাদির অন্ত্রসমূহ (নাড়িভুঁড়ি) পরিশোষিত লবণ-দ্রব সাহায্যে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বে Formalin বা Alcoholএর মধ্যে অন্ত্রসমূহ রক্ষিত হইত। এই দুইটীই মূল্যবান্। চুণীলালের উক্ত আবিষ্কারের ফলে, গভর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হয়।

(৪) The Bhowanipore Food-Poisoning Case.

১৯০৪ সালে Calcutta Practitioner পত্রিকায় জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা কলিকাতায় মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৯০৩ সালে জুন মাসে, আলিপুরের সরকারী উকিল সুপ্রসিদ্ধ ৺আশু-তোষ বিশ্বাস মহাশয়, তাঁহার পুত্র (বর্ত্তমানে বিখ্যাত হাইকোর্টের

উকিল, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি, আই, ই) প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায়, এক বিরাট্ প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেন, তাহাতে কলিকাতা নগরীর প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবার নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু গ্রহক্রমে খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত হইয়া যায় এবং কতিপয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উক্ত বিষাক্ত-দ্রব্য ভোজনের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনেকের জীবনসংশয় ঘটে, তন্মধ্যে চুণীলাল অন্যতম। সুস্থ হইয়া তিনি এই বিপর্য্যয়ের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার এই রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে আরও দুইটী রিপোর্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের Health Officer কর্ত্তৃক বাহির হয়। চুণীলালের মতে, যে দুগ্ধে Ice-cream তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহাই কোনও প্রকারে বিষাক্ত হইয়া যায় এবং উহা

ভোজনের ফলেই উক্ত আনন্দোৎসব মহাবিষাদে পর্য্যবসিত হয়।

(৫) Poisoning by Sulpho-cyanide of Mercury.
(৬) A case of Formalin Poisoning.

১৯০৫ সালে Indian Medical Gazetteএর মার্চ্চ ও এপ্রিল সংখ্যায় বাহির হয়।

(৭) Suicide by Inhalation of Chloroform.

১৯০৭ সালে Calcutta Medical Journalএর জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত।

(৮) Some Points of Medico-legal Interest in the Radhabazar Murder Case.

ইহাও একটী তৎকালীন লোমহর্ষক ঘটনা। ঐ সালে ঐ পত্রিকার মার্চ্চ সংখ্যায় প্রকাশিত।

(৯) A Fatal Case of Poisoning by Arsenite of Copper.

১৯১০ সালে ঐ পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত।

(১০) Cocaine Poisoning.

১৯১৩ সালে British Medical Journalএর জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

(১১) Two Cases of Poisoning by White Lead.

১৯১৬ সালে Calcutta Medical Journal ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বাহির হয়।

(১২) Paka Oil in Mustard Oil as an Adulterant. তৎকালীন সহকারী রসায়ন পরীক্ষক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, এম, বি, মহাশয়ের সহকারিতায় লিখিত এবং Indian Medical Gazetteএর নভেম্বর সংখ্যায় ১৯১৯ সালে প্রকাশিত।

৪। Industrial Chemistry.

শিল্প-রসায়ন সম্বন্ধে চুণীলালের দুইটী বিবিধ তথ্যপূর্ণ লিখিত বক্তৃতা আলোচ্যগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে,—(১) The History and Chemistry of Paper-making এবং (২) The History and Chemistry of Matches. দুইটীই কলিকাতা বিজ্ঞান-সভায় (The Indian Association for the Cultivation of Science) প্রদত্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৯০৭ সালে "The Tip of a Match" নামক দিয়াশলাই সম্বন্ধীয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

ছাত্রগণের ও সাধারণ পাঠার্থীর সুবিধার জন্য, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যথাসম্ভব পরিবর্জ্জিত, চুণীলালের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কতকগুলি তৎকালে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আলোচিত প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত, কতকগুলি ছাত্রসমাজের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে লিখিত। ফলতঃ, এই গ্রন্থখানিতে চুণীলালের সূক্ষ্ম ও সতর্ক দৃষ্টির ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

১ম খণ্ডখানি প্রধানতঃ চিকিৎসক ও বিজ্ঞান-জ্ঞানলিপ্সুর চিত্ত আকর্ষণ করে, কিন্তু ২য় খণ্ড সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য বিষয়সম্ভারে পরিপূর্ণ, সুতরাং সকলেরই উপভোগ্য। ছাত্রগণের পক্ষে ইহা একখানি অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ।

১। Hygiene and Public Health.

(১) Necessary Measures for the Prevention of Food-Adulteration.

১৯১০ সালে Calcutta Medical Journalএর জুলাই সংখ্যায় বাহির হয়। চুণীলালের মতে, খাঁটী খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা স্বাস্থ্যহীনতার প্রধানতম হেতু। খাদ্যদ্রব্যে ভেঁজাল নিবারণ ও ভেঁজাল খাদ্য হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় বহু যুক্তির সহিত এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

(২) Some Common Food-Stuffs.

১৯১৮ সালের Science Convention এর বিবৃতিরূপে প্রকাশিত। খাদ্য সম্বন্ধে চুণীলালের আলোচনা ও গবেষণার অন্ত নাই। এ প্রসঙ্গটী তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত-সার।

(৩) Some Practical Hints to improve the Dietary of the Bengalis.

১৯১৭ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত Science Conventionএ পঠিত এবং ১৯১৮ সালে উক্ত সভার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত। এতদ্বিষয়ে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত স্যার গুরুদাসের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।*

(৪) The Milk-supply of Calcutta,—its Hygienic, Commercial and Social Aspects.

১৯১৮ সালে ১৭ই আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত Social Study Society নামক সভায় পঠিত এবং ঐ সালের Modern Review পত্রিকার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত। অন্যান্য ভেঁজাল খাদ্যের ন্যায় ভেঁজাল বা জলমিশ্রিত দুগ্ধ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে চুণীলাল আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার ফলে, ঐ সম্বন্ধে সংশোধিত মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে স্যার গুরুদাসের মন্তব্যও পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল।† প্রবন্ধটী

* পরিশিষ্ট (ঙ) দ্রষ্টব্য।

† পরিশিষ্ট (ঙ) দ্রষ্টব্য।

পৃথক্ পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৫) Fixing of Standards of Purity of Milk and its Products.

দুগ্ধবিষয়ক এই প্রবন্ধটী ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ মহাশয়ের সহিত যুগ্মভাবে লিখিত এবং Indian Journal of Medicine পত্রিকার ১৯২১ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত। ইহাকে পূর্ব্ব প্রবন্ধটীর উপসংহার বলিতে পারা যায়। ইহাতে দুগ্ধের বিশুদ্ধতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(৬) A Few Hints on Sanitary Reconstruction.

১৯১৯ সালে The Social Service Quarterlyতে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত। চুণীলালের বক্তব্য, জাতীয় পুনর্গঠনের মূলে শিক্ষাবিস্তার ও স্বাস্থ্যনৈতিক উৎকর্ষ অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিত। সুতরাং, জাতিকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে হইলে, স্বাস্থ্যীয় পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কি ভাবে তাহা সংসাধিত হইতে পারে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ

প্রকাশের পর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই প্রবন্ধটীও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৭) Impure Air and Infant Mortality.

১৯২০ সালে কলিকাতা টাউন-হলে স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীতে প্রদত্ত সূতিকাগারের সংস্কার সম্পর্কিত বক্তৃতা।

(৮) Maternity and Child Welfare in India.

All India League for Maternity and Child Welfare পত্রে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় এবং ১৯২২ সালের মার্চ্চ ও জুন সংখ্যায় বাহির হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যুর হার অত্যধিক দেখিয়া, তৎকালে তাহার প্রতীকার-কল্পে কতিপয় দেশপ্রাণ ব্যক্তি সচেষ্ট হন, তন্মধ্যে চুণীলাল অন্যতম। বড়লাট পত্নী লেডী চেমস্‌ফোর্ড ও তৎপরে লেডী রেডিং প্রমুখ মহীয়সিগণের আনুকূল্যে, মাতৃ-

মঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী প্রভৃতির অনুষ্ঠানে এই চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে,—কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বহু নগরীতে সাধারণ সূতিকাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

(৯) Health of our College Students.

১৯২২ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে Y. M. C. A. তে পঠিত অভিভাষণ, ঐ সালে Calcutta Review পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে, ১৯১৩ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, The Health of Indian Students শীর্ষক এই ভাবের আরও একটী অভিভাষণ, চুণীলাল ঐ এসোসিয়েসানেই পাঠ করেন। এই অভিভাষণটী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ছাত্রবন্ধু বলিয়া চুণীলালের প্রসিদ্ধি ছিল। জাতির ভাবী আশা-ভরসা ছাত্রগণকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম করিতে কি পন্থা অবলম্বন কর্ত্তব্য এবং স্বাস্থ্যবান্ বিদ্বান্ হইতে ছাত্রগণের কি কি

কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, উক্ত দুইটী অভিভাষণেই তৎসমুদয় বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) Use of Chlorine as a Disinfectant of Drinking Water for Calcutta.

১৯২১ সালে কলিকাতা কর্পোরেশানের সেক্রেটারী Chlorine সাহায্যে সহরের পানীয় জল পরিষ্কৃত করা যুক্তিযুক্ত কি না, এ সম্বন্ধে চুণীলালের মন্তব্য চাহিয়া পাঠান,—তদুত্তরে ইহা লিখিত। চুণীলাল Chlorine ব্যবহারের অযৌক্তিকতা নির্দ্দেশ করেন।

২। **Temperance.**

মাদক দ্রব্য ব্যবহারে সংযম সম্বন্ধে চুণীলালের তিনটী প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী অভিভাষণ এবং একটী সাধারণ নিবন্ধ। (১) Physical Effects of some Intoxicating Drugs শীর্ষক অভিভাষণ ১৯১৫ সালে ২৪শে নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত Calcutta Temperance Federation এর অধিবেশনে পঠিত এবং ঐ সালের Calcutta Madical Journal এর ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। (২) Temperance Movement in India—১৯১৭ সালে ২৭শে এবং ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত All India Temperance Conference এর সভাপতির অভিভাষণ।

মাদকসেবনের অপকারিতা ও তাহার প্রতীকার, উক্ত কদভ্যাস দূরীকরণোদ্দেশ্যে মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের আন্দোলন ও তাহার সার্থকতা ইত্যাদি অভিভাষণ দুইটীর বিষয়বস্তু। (৩) Growth of the Drink and Drug Trade among the Educated Community of Bengal—১৯২০ সালে Modern Review পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ সালে গভর্ণমেণ্ট আইন প্রবর্ত্তন করেন,—গ্রাজুয়েট্ মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি বিক্রয়ের লাইসেন্স্ পাইবেন। তদনুসারে বহু বি, এ, ও এম, এ, উপাধিধারী উক্ত ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার ব্যবসায়িক ও নৈতিক কুফল সম্বন্ধে অতি যুক্তিপূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। **Biographical.**

বর্ত্তমান প্রসঙ্গ সাতজন মৃত বা জীবিত মনস্বী বা মহাপ্রাণ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী বা কীর্ত্তিকথায় পর্য্যবসিত। (১) Rai Taraprasanna Roy Bahadur * (চুণীলালের পূর্ব্ববর্ত্তী সহকারী রসায়ন পরীক্ষক;—১৮৯৫ সালে Indian Medical Record এর জুন সংখ্যায় প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। (২) The Late Dr. Jogendra Nath Ghose (কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক, ধাত্রী চিকিৎসাধ্যক্ষ)—১৯১৩ সালে Calcutta Medical Journal এর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী।

---

* "প্রতিষ্ঠার পথে" শীর্ষক পরিচ্ছেদে (৬৫ পৃঃ), ইঁহার নাম ভ্রমক্রমে 'রায় তারাপ্রসন্ন সেন বাহাদুর' মুদ্রিত হইয়াছে।

(৩) Benoyendra Nath Sen (প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস ও অর্থনীতির খ্যাতনামা অধ্যাপক)—১৯১৮ সালে ১২ই এপ্রিল তারিখে University Instituteএ উক্ত মনীষীর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী সভার অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ। (৪) The Science Association and its Founder—সুবিখ্যাত বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের কীর্ত্তিকথা। ১৯১৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত Science Convention এর রসায়ন-শাখার অধিবেশনে পঠিত এবং উক্ত সমিতির কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত। (৫) Pandit Sivanath Sastri as I knew him—১৯১৯ সালে ১২ই অক্টোবর তারিখে, The Indian Messenger পত্রিকায় বাহির হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সার্থককর্ম্মী আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত চুণীলাল তাঁহার ছাত্রজীবন হইতে পরিচিত ছিলেন। এই মনীষীর প্রতিভা, কর্ম্মশক্তি ও তেজস্বিতা চুণীলালের চিত্তের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। (৬) The Hon'ble Mr. Justice J. G. Woodroffe,—অনেকেই জানেন, এই পাশ্চাত্য পণ্ডিত, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উড্‌রফ্‌ সাহেব হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত শক্তি-উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে শক্তি-উপাসক বলিয়াও অভিহিত করেন। হিন্দুর ধর্ম্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি এই মনীষীর গভীর আস্থা ছিল। কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিয়া, যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় অর্থাৎ ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে বিবেকানন্দ সোসাইটীর উদ্যোগে, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে আহূত সভায়, তাঁহাকে বিদায়-

অভিনন্দন দেওয়া হয়। চুণীলাল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী উক্ত মহাত্মার প্রশস্তিবাচক অভিভাষণ। ঐ সালের Calcutta Review পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় অভিভাষণটী প্রকাশিত হয়। (৭) Sir Jagadis Bose and his Discoveries—১৯১৭ সালে মে সংখ্যায় Calcutta Medical Journalএ বাহির হয়। জগৎ-গৌরব ভারতের সুসন্তান আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া-সংক্রান্ত কীর্ত্তিকথা।

৪। Popular Scientific Lectures.

পূর্ব্বে এতদ্দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষার দিকে সাধারণ ছাত্রগণের আকর্ষণ খুব কম ছিল। এমন কি, অনেকের নিকট উহা যেন একটা অতি রহস্যপূর্ণ দুরধিগম্য বিষয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাহার কারণ, তৎকালে অধিকাংশ কলেজে বিজ্ঞান-অধ্যাপনার ব্যবস্থা না থাকায়, ছাত্রগণ সাধারণতঃ, বিজ্ঞান-শিক্ষার সুবিধা লাভ করিত না। প্রকৃতপক্ষে, মাত্র সেদিন হইতে (গত ১৯০৭ সাল), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত প্রবর্ত্তনার পূর্ব্ব হইতেই, চুণীলাল ছাত্রসমাজে বিজ্ঞান-জ্ঞানলিপ্সা জাগাইবার প্রচেষ্টা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপেও তিনি উক্ত প্রবর্ত্তন-কার্য্যের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। বিজ্ঞানের দিকে ছাত্রগণের—বিশেষতঃ, মফঃস্বলের ছাত্রগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি নিম্নলিখিত তিনটী বক্তৃতা দেন। প্রত্যেকটী University Instituteএ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসহ প্রদত্ত হয় এবং পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ও বিতরিত হয়।

(১) A Lump of Coal.

(২) Combustion.

(৩) A Pinch of Common Salt.

আলোচ্য গ্রন্থে প্রথম বক্তৃতাটীর সহিত ১৯২০ সালে Scottish Church College Magazineএর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত চুণীলালের Genesis of Coal শীর্ষক প্রবন্ধটী সংযোজিত করা হইয়াছে। উক্ত বক্তৃতা ১৯০২ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় বক্তৃতা ১৯০৫ সালে ৭ই মার্চ্চ তারিখে এবং তৃতীয়টী ১৯০৬ সালে ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মফঃস্বলের ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের সমক্ষে প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় বক্তৃতা ১৯০৫ সালে University Magazineএ প্রকাশিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হইলেও, স্বল্পশিক্ষিত ছাত্রগণের বোধগম্য করিবার জন্য, চুণীলাল এই গুলিতে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা যথাসম্ভব পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। সুতরাং, সাধারণের পক্ষেও প্রত্যেকটী যে শুধু সুখপাঠ্য তাহা নহে,—প্রত্যেকটী সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বহু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যে পরিপূর্ণ।

৫। Miscellaneous.

এই অংশে মাত্র তিনটী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। (১) Marriage Dowry,—১৯১৪ সালে Modern Review পত্রিকার জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ও বিতরিত হইয়াছিল। পণপ্রথা আমাদের সমাজকে কি ভাবে অন্তঃসারহীন করিতেছে, কত শত সংসারকে ছারখার করিতেছে, বিশেষতঃ, কত শত মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে

পথের ফকির করিয়া দিতেছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে চুণীলাল তাহার আলোচনা করিয়াছেন। যতদিন এই মাতৃজাতির অসম্মানসূচক, হৃদয়হীনতাপূর্ণ কুপ্রথা সমাজে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। সর্ব্ব-প্রযত্নে বিবাহে দাবিদাওয়ার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ চুণীলালের অভিমত। উক্ত দুর্নীতি দূরীকরণকল্পে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। নিজ পুত্র কন্যার বিবাহেও তিনি উহার প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি তৎকালে প্রতিষ্ঠিত 'প্রজাপতি-সমিতির' একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। পণ-প্রথা নিবারণের কতিপয় উপায়ও চুণীলাল এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—প্রত্যেকটী অনুধাবনযোগ্য, বিচারসহ ও অবলম্বনীয়। বাহুল্য ভয়ে, আমরা তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না। (২) Professional Beggary in Calcutta,—এই প্রবন্ধটীও Modern Review পত্রিকায় বাহির হয়,—১৯১৯ সালের এপ্রিল সংখ্যায়। ভিক্ষাবৃত্তি হীনতার পরিচায়ক হইলেও, দুঃস্থ, আতুর বা অকর্ম্মণ্যকে সাহায্য করা অথবা, এক কথায়, উপায়ান্তররহিতকে সাহায্য দান করা প্রতি সমর্থ হৃদয়বান্ ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য, ইহা চুণীলাল স্বীকার করেন। কিন্তু সামর্থ্য থাকিতেও যাহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, তিনি তাহাদিগকে আদৌ প্রশ্রয় দেন না। ভিক্ষুকের বাহুল্য সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে বলিয়া, তিনি ভিক্ষাবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। রাস্তায় রাস্তায় বা বাটীতে বাটীতে বহু ভিক্ষুক ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহাদের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ বা নানা কুৎসিৎ ও দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অসদ্ভাব নাই। সুতরাং, তাহাদের অবাধ বিচরণে নানা বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা আছে। চুণীলাল বলেন, ইহার প্রতিষেধকল্পে দরিদ্রভাণ্ডার

প্রতিষ্ঠা, আতুরাশ্রম স্থাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা সমীচীন। (৩) Calcutta Suppression of the Immoral Traffic Bill,—১৯২৩ সালের Modern Review পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত। উক্ত বিলের সমালোচনা এবং তৎসূত্রে কতিপয় বিষয়ে ক্রটী প্রদর্শন প্রবন্ধটীর উদ্দেশ্য। উহাতে সহরের যত্র তত্র বেশ্যাবৃত্তির নিরোধের ব্যবস্থা থাকিলেও, যে সমুদয় দুষ্টলোকের সাহচর্য্যে স্ত্রীলোক কুপথে আনীত হয়, তাহাদের শাস্তির কোনও বিধান ছিল না এবং অপহৃতা সমাজত্যক্তা নারীদের আশ্রয়দানেরও কোনও উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই। আলোচ্য প্রবন্ধে চুণীলাল একাধিক নারী-রক্ষাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছেন। তদনুযায়ী পানিহাটীতে পতিতা-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। চুণীলাল ইহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। অবশ্য, এই সূত্রে Calcutta Vigilance Association, Calcutta League of Women Workers প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য।

Food. চুণীলালের শেষ গ্রন্থ। শুধু তাহাই নহে, ১৯৩০ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে রাঁচিতে বসিয়া, তিনি এই গ্রন্থের শেষ প্রুফ্ দেখিয়া ও তৎসহ ইহার ভূমিকা লিখিয়া পাঠান এবং তৎপরদিন রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় তথায় তাঁহার দেহাবসান ঘটে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতায়'* ১৯২৯ সালে চুণীলাল খাদ্যসম্বন্ধে যে

* **Adhar Chandra Mukherjee Lectureship.**—পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট শিক্ষার উন্নতিকল্পে, স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের সুবিখ্যাত অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দুইটী লিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই গ্রন্থরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে খাদ্যসম্বন্ধে তিনি বহুতর গবেষণা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থ তৎসমুদয়ের সারভাগ অবলম্বনে লিখিত চুণীলালের শেষ অবদান,—তাঁহার পরিণত মস্তিষ্ক-প্রসূত পরিপক্ক ফল। এতদ্দেশের খাদ্যবিষয়ে চুণীলালের উক্তিই যে সমধিক প্রামাণ্য (authority), তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং, Hygiene সম্পর্কে এই গ্রন্থ মহামূল্যবান্।

আমরা চুণীলালের গ্রন্থমালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। তাঁহার অন্যান্য বিবিধবিষয়ক ইংরাজি প্রবন্ধাদি পুস্তক বা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলেও, "Scientific and Other Papers" মহাগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, তাহাদিগের পৃথক্ পরিচয় দিলাম না। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলীর বিষয় আমি অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছি। তাহার কারণ, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বৈজ্ঞানিকেরই আলোচ্য,—অন্যথায়, অনধিকার চর্চ্চা। আরও কথা, জীবনীপ্রসঙ্গে উক্ত বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষণের চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক বলিতে পারা যায়। তাহাতে পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতিরও

এম্-এ, বি-এল্, মহাশয়, ১৯১৮ সালে স্যার আশুতোষের মারফৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯০০০্ টাকা অর্পণ করেন। সাহিত্য বা বিজ্ঞান বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতকে সিনেট হাউসে ধারাবাহিক ভাবে দুইটী বক্তৃতাদানের জন্য, ঐ টাকার বার্ষিক আয় হইতে প্রাপ্ত অর্থে, একবৎসর সাহিত্যে ও পর বৎসর বিজ্ঞানে সম্মানী-দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। **Calcutta University Calendar.**

ভয় আছে। সুতরাং, আমরা শুধু চুণীলালের সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্র কত দূরবিসারী ছিল, তাহারই একটা আভাসমাত্র উপস্থাপিত করিলাম। উক্ত গ্রন্থরাজিব্যতীত তাহার আরও বহু প্রবন্ধ ও অভিভাষণাদি ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিল ; কতক বা অমুদ্রিত, কতক বা অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে আমরা তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না।

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, চুণীলালের চিন্তার ধারা শুধু এক খাতে বহিত না,—তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সংস্কারপন্থী দেশপ্রেমিক ছিলেন। কর্ম্মব্যস্ততা ও চিন্তানিবিষ্টতা তাঁহার মজ্জাগত ছিল, সেইজন্য তিনি তাঁহার দৈনন্দিন দায়িত্বপূর্ণ বিপুল কর্ত্তব্যের ভিতরেও সাহিত্যসেবার অবসর খুঁজিয়া পাইতেন। সহরে বা সহরের বাহিরেও, রাজনৈতিক ব্যতীত এমন সভা-সমিতি খুব কমই ছিল, যাহাতে তিনি যোগদান করিতেন না, এবং শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেক স্থলেই তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বাণী উদাত্তগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইত।

তৎকালীন ছোট লাট স্যার জন উড্‌বার্ণ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ও রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রমুখ সাহিত্যোৎসাহী সুধিগণের প্রচেষ্টায়, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে, শোভাবাজার রাজবাটীতে, সে যুগের বাঙ্গালাভাষার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা হয়। চুণীলাল উক্ত সভার উদ্ভবকাল হইতে উহার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থালোচনার প্রসঙ্গে এই সাহিত্যসভায় পঠিত ও পরিশেষে এই সভা হইতে প্রকাশিত তাঁহার বহু বৈজ্ঞানিক ও শিল্পসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

১৩১৬ সালে চুণীলাল উক্ত সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি হন। এতদ্ভিন্ন, তিনি মাসিক অধিবেশনে প্রায়ই সভাপতিত্ব করিতেন। তদুপলক্ষ্যে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে, তাঁহার বহুবিষয়ক পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ত কথাই নাই, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, সমাজনীতি প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিত। আমরা এই স্থলে তাঁহার সেই সাময়িক আলোচনা-প্রসূত বক্তৃতাসমূহ হইতে কয়েকটী অংশ উক্ত সভার মুখপত্র 'সাহিত্য-সংহিতা' হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। এইগুলি হইতে কতিপয় বিষয়সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত অবগত হওয়া যায়।

সাহিত্যসভার চতুর্থ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, সেক্স্পীয়রের বঙ্গানুবাদক রায় সাহেব ৺হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় "বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতির মন্তব্যে চুণীলাল বলেন;—"যদি কোনও কবি আমাদের জাতীয়ভাবের উদ্দীপনের সহায়তা করিয়া থাকেন, তবে সে হেমচন্দ্র। * * * যে অবৈধ প্রণয় বর্ত্তমান কালের লোকদিগের অস্থি-মজ্জা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার নামগন্ধও হেমচন্দ্রে নাই। সংযত ভাব হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। হেমচন্দ্রের কাব্য আদ্যন্ত পরিমার্জ্জিত। তাঁহার সৃষ্ট বৃত্র, শচী মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। মাইকেল মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের চরিত্রাবতারণা অনেক উৎকৃষ্ট। প্রথমোক্ত কবি দেবচরিত্রের অবমাননা করিয়াছেন, শেষোক্তে সে দোষ নাই।"

সাহিত্যসভার চতুর্থ বার্ষিক সপ্তম মাসিক অধিবেশনে যাত্রা, হাফ্ আখড়াই প্রভৃতি প্রসঙ্গে চুণীলাল বলিতেছেন;—"কবি, যাত্রা, হাফ্

আখ্‌ড়াই প্রভৃতির অপ্রচলন অশ্লীলতাহেতু নহে, সামাজিক রুচির পরিবর্ত্তনই তাহার হেতু। কেন না, সেক্‌স্‌পীয়ার, পোপের মধ্যেও অশ্লীলতা আছে। বর্ত্তমানে রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে, 'বিরহ' শব্দটী পর্য্যন্ত অশ্লীলতাব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচিত। কবির গান উঠিয়া যাওয়াতে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।"

উক্ত সভার দশম বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে সুসঙ্গের রাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর "চিতা ও চিন্তা" শীর্ষক এক অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎসূত্রে প্রাচ্য আর্ষজ্ঞান ও প্রাতীচ্য জড়বিজ্ঞানের সমন্বয় প্রসঙ্গে সভাপতি চুণীলাল বলেন;—"গীতা যাঁহাদের শাস্ত্র এবং জনক ঋষি যাঁহাদের পূজ্য, তাঁহাদিগের পক্ষে সমন্বয় অসম্ভব, ইহা মনে করা অন্যায়। অন্নচিন্তা চিন্তার বিষয় বটে; যদি উহা চিন্তার বিষয় না হয়, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকে না। আরও এক কথা, চিন্তা মনের ধর্ম্ম; সুতরাং, যতকাল মন থাকিবে, তত কাল উহা অপরিহার্য্য। এমন কি, পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদের মতে নিদ্রার সময়েও চিন্তা হয়। সুতরাং, চিন্তা যখন অপরিহার্য্য, তখন যাহাতে সুচিন্তার অভ্যাসে দুশ্চিন্তার হ্রাস হয়, তাহা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সাংসারিক চিন্তা প্রশমনের নানা উপায় আছে। আমরা অনেক সময় কল্পনার দ্বারা অভাব সৃষ্টি করিয়া থাকি। সংযমের দ্বারা তাহা হ্রাস করিতে পারা যায়। অন্নচিন্তা এবং অর্থচিন্তাই যে দুশ্চিন্তার কারণ, তাহা নহে। যাহাদিগের এই উভয় চিন্তাই নাই,—তাহাদিগেরও দুশ্চিন্তা আছে। প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে না দিলে দুশ্চিন্তা দমন হইতে পারে। আর্ষভাব রাখিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা করা উচিত।"

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

সাহিত্যসভার পঞ্চদশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে পণ্ডিত দুর্গাচরণ বেদান্তসাংখ্যতীর্থ মহাশয় অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আপেক্ষিক সমালোচনা পাঠ করেন। তৎপ্রসঙ্গে চুণীলালের মন্তব্য ;—"সম্পূর্ণ জ্ঞানীর পক্ষে শঙ্করের মত অবলম্বনীয়, অন্যথায়, সাধারণের পক্ষে রামানুজের মতই প্রশস্ত।"

প্রাচীন কবি ও পাঁচালিকারগণের আলোচনায় উক্ত বর্ষের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে চুণীলাল বলেন ;—"প্রাচীনেরা আধুনিকদিগের গুরু, দাশরথি রায়ও সেইরূপ গুরুস্থানীয়। দাশরথি রায়ের শ্যামা-সঙ্গীত, আগমনী প্রভৃতি অতুলনীয়। কবিতা দুই শ্রেণীর,—ভাবমধুর ও শব্দমধুর। দাশরথি রায়ের শব্দযোজনার শক্তি অসাধারণ ছিল। প্রাচীন কবিদিগের বিচারে মরালবৎ ব্যবহার করিতে হইবে।"

রাজা বিনয়কৃষ্ণের অকালমৃত্যুতে সাহিত্যসভার অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়ে। সভার শেষজীবন পর্য্যন্ত চুণীলাল ইহার রক্ষাকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং নানাবিধ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যখন ইহার জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়, তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত ইহাকে মিশাইয়া দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু মুমূর্ষু সাহিত্যসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে, বোধ হয়, সঙ্কোচ-বোধ করেন। ফলে, সাহিত্যসভার অস্তিত্ব লোপ হয়। তৎপরে, মুখ্যতঃ তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায়, কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সাহিত্যসভার সার্দ্ধদ্বিসহস্রাধিক পুস্তক পরিষদে অর্পণ করেন। এতদ্দ্বারা সাহিত্য-পরিষদ্ সাহিত্যসভার স্মৃতির সহিত চুণীলালের স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় বর্ষে চুণীলাল তাহার সদস্য হন। সাহিত্যসভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে ও অবকাশাভাব-বশতঃ প্রথম প্রথম তিনি পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও, তিনি নিয়মিতভাবে চাঁদা দিতেন ও সাময়িক সাহায্য করিতেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু পরিষদের সভাপতি হন। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চুণীলাল অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কর্ম্মী রূপে পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই বৎসর তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হন। পরিষদের সভাপতি মহাশয় লোকশিক্ষার জন্য বিবিধ বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। তদনুযায়ী ১৩২৫ বঙ্গাব্দে, চুণীলাল "আহারতত্ত্ব" সম্বন্ধে দুইটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। প্রথমটীর সময় স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও দ্বিতীয়টীতে স্যার নীলরতন সরকার সভাপতি ছিলেন।

১৩২৫ হইতে ১৩২৯ এবং ১৩৩১ হইতে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর চুণীলাল পরিষদের সহকারী সভাপতিত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত ১৩২৪, ১৩৩০, ১৩৩৬ ও ১৩৩৭ সাল এই চারি বৎসর ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। এই চৌদ্দ বৎসর তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এবং মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং অধিবেশনের কার্য্যপরিচালন-দক্ষতায় সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন।

শেষ জীবনে তিনি প্রায়ই রাঁচিতে বাস করিতেন। সেই সময় তিনি পরিষদের কার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগদান করিতে না পারিলেও,

পরিষদের চিত্রশালার জন্য তিনি কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্য সংগ্রহ করেন। রাঁচি-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার মহাশয় বিলাত হইতে রাজা রামমোহন রায়ের কেশগুচ্ছ এবং রাজার সমসাময়িক বন্ধুগণের লিখিত কতকগুলি পত্র সংগ্রহ করিয়া আনেন। উক্ত দ্রব্যগুলি এতদিন সুকুমার বাবু যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। চুণীলালের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি ঐ সকল দ্রব্য চুণীলালের দ্বারা পরিষদে উপহার পাঠাইয়া দেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে এক অধিবেশনে চুণীলাল মহাপুরুষের পূতস্মৃতির দ্রব্যগুলি দান করেন এবং তৎসম্বন্ধে একটী অতি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটী তৎকালীন "বঙ্গলক্ষ্মী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চুণীলালের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (পরশুরাম) মহাশয় উক্ত কেশগুচ্ছ-রক্ষার জন্য একটী সুন্দর আধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

পরিষদের বিভিন্ন বিভাগে চুণীলাল বিশেষ যত্নের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন এবং এক বৎসর ঐ সমিতির সভাপতি হন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসমিতি, আয়ব্যয়সমিতি, চিকিৎসাশাখা প্রভৃতিতেও তিনি অতি দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে চুণীলাল বিজ্ঞানশাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎসূত্রে লিখিত তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণের আংশিক পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়া আসিয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ বা বিজ্ঞান-সভার সহিত

তাঁহার যে কত নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, তাহার বিবৃতি আমরা বহুস্থলে দিয়া আসিয়াছি, এ প্রসঙ্গে তাহার পুনরুল্লেখ না করিলেও চলে। এতদ্ভিন্ন, তিনি আরও বহুতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যাপীঠের সহিত আজীবন সংযোগ-রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু যে বাণীর সাধক ছিলেন, তাহা নহে,—তিনি ছিলেন বাণী-সেবক; শুধু বাগ্‌দেবীর পূজারী হইয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই,—স্বহস্তে মন্দির-মার্জ্জনা করিয়া, কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। যেখানে জ্ঞান-আহরণের বা আহৃত-জ্ঞান-বিতরণের ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন,—সেইখানেই তাঁহার পিপাসু চিত্ত ছুটিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের আদান-প্রদানে একটী দিনের জন্য তাঁহার ঔদাস্য বা বিরতি ছিল না।

সাংসারিক জীবন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চুণীলাল অতি দুঃস্থ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই দুঃস্থতার জন্যই, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমৃতলালকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, লেখাপড়া ত্যাগ করিতে হয়। পিতা দীননাথ সামান্য দালালী করিতেন। তিনি নিতান্ত ভালমানুষগোছের লোক ছিলেন। দালালী করিতে যে চতুরতা বা পাটোয়ারী বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, দীননাথের তাহা ছিলনা বলিলেই হয়। বস্তুতঃ, তাঁহার চরিত্রে ও বৃত্তিতে ঠিক খাপ্ খায় নাই। সুতরাং, সংসারের সাচ্ছল্য ত দূরের কথা, পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করাই তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ভাগ্যে শ্বশুরদত্ত বসতবাটী ছিল, তাই কোনও রকমে সহরে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে যখন তিনি বহু সন্তানের পিতা হইলেন, তখন দৈন্যের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। দীননাথ বা তাঁহার পত্নী ভগবতী কেহই ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। বিশেষতঃ, ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে যদি সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দেনার দায়ে যখন নিজ বসতবাটী পর্য্যন্ত পরকবলগত হইবার উপক্রম হইল, তখন অগত্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃতলালকে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইল।

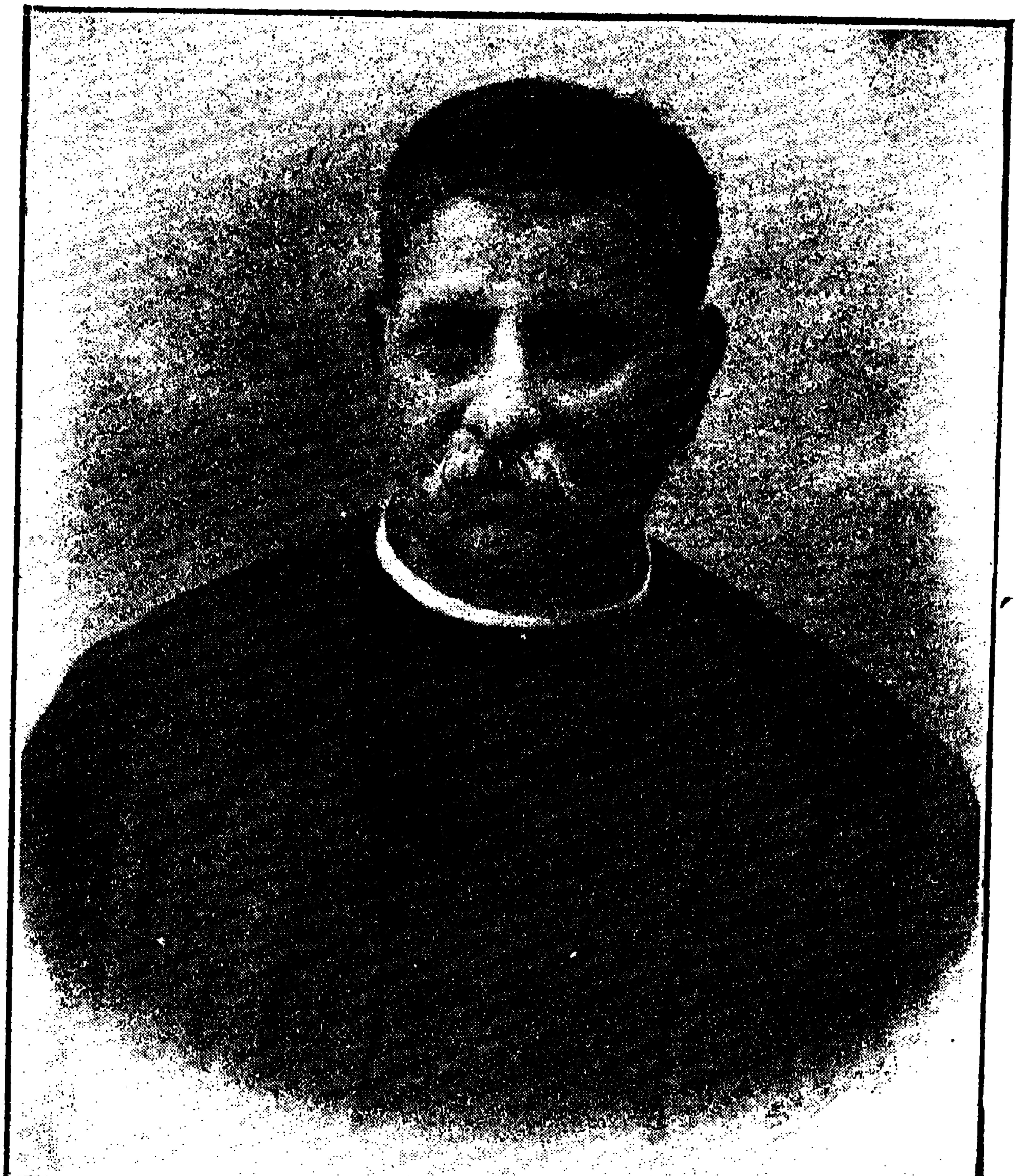

রায়সাহেব ৺অমৃতলাল বসু
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

[১৪০ পৃঃ]

অমৃতলালও খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং এই দুর্ব্বিপাক না ঘটিলে, তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা অবধি অগ্রসর হইতে পারিতেন। তিনি তাঁহার মাতা পিতা ও ভ্রাতৃগণের মুখের পানে চাহিয়া, তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক আত্মোন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমন করেন। বস্তুতঃ, যদি তিনি ঐ সময় লেখাপড়া ছাড়িয়া কর্ম্মে প্রবিষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠগণের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে বহু অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইত। কনিষ্ঠের জন্য জ্যেষ্ঠের এই ত্যাগস্বীকার আদর্শপদবাচ্য। চুণীলাল-প্রমুখ সকল ভ্রাতাই জ্যেষ্ঠের এই মহত্ত্বমণ্ডিত কর্ত্তব্য-পালন অতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না,—অমৃতলালের প্রতিভাও একদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সামান্য কেরাণীরূপে পোষ্ট্ ও টেলীগ্রাফ্ হিসাব-বিভাগে প্রবিষ্ট হন এবং স্বীয় কর্ম্মদক্ষতায় তত্রত্য উচ্চপদে অধিরূঢ় হন। রাজসম্মানও তাঁহার শিরে বর্ষিত হয়। আমরা বলি, তাঁহার এই সাফল্য তাঁহার উক্ত ত্যাগ স্বীকারকে আরও গরিমান্বিত করিয়াছে।

অমৃতলাল চাকরী করিতে লাগিলেন, চুণীলাল এফ, এ, পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইলেন। অন্য ভ্রাতৃগণের বিদ্যাশিক্ষাও এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। এই সময় দীননাথ তাঁহার প্রথম দুই পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেন। অবশ্য, ইহাতে ভগবতীরও যে আগ্রহ ছিল না, তাহা বলা যায় না। যেহেতু, সাধারণতঃ দেখা যায়, ছেলে মেয়ের বিবাহে বাপের অপেক্ষা মায়ের আগ্রহ বেশী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, তখনকার দিনে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকায়, পুত্র সংসার-ভার-বহন-ক্ষম

হউক্ বা না হউক্, প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বেই, বিবাহের তাড়া পড়িয়া যাইত। আর কন্যাপক্ষে ত কথাই নাই,—অষ্টমে গৌরী বা নবমে কন্যাদান না করিলে, অতিশয় লজ্জার বিষয় হইত। সুতরাং, পুত্রদ্বয় যে বিবাহযোগ্য হইয়াছে সে বিষয়ে দীননাথ বা ভগবতীর সন্দেহের অবকাশ ছিল না। দীননাথ 'মাহিনগরের বসু' বংশের সন্তান,—পরম কুলীন।—কৌলীন্যের কদরও তখন ছিল খুব। সুতরাং, দেখিতে দেখিতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাত্রীর সন্ধান মিলিয়া গেল। ১২৮৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন অমৃতলালের এবং ১১ই ফাল্গুন রবিবারে চুণীলালের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হুগলীজেলাস্থ ব্রাহ্মণপাড়ার জমীদার ৺রামকৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ৺গৌরকিশোর সরকার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী তিলোত্তমাকে চুণীলাল বিবাহ করেন। এই সরকার-গোষ্ঠী খুব বনিয়াদী বংশ। বিশেষতঃ, রামকৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের সময় ইঁহাদের প্রতিপত্তি সমধিক বর্দ্ধিত হয়। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে উৎসব লাগিয়াই থাকিত। তাঁহার সুযোগ্য দৌহিত্র-গণের অন্যতম, স্বনামখ্যাত রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র, বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিত "স্মৃতিরেখায়" পড়িয়াছি,—রামকৃষ্ণ যেমন প্রজাবৎসল, বন্ধুবৎসল ও আত্মীয়বৎসল ছিলেন, আততায়ী-দমনেও সেইরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লোকে বলিত, 'রামকৃষ্ণ সরকারের প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়।' বর্ত্তমানে তাঁহার উৎসব-মুখরিত বিশাল অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে। তাঁহার তিরোধানের পর সরিকানী

বিবাদে সে জমীদারী, সে পশার প্রতিপত্তিও আর নাই। সে বিরাট্ পরিবার আজ ছিন্ন-ভিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও দৈন্যপীড়িত। অকালমৃত্যুও সে সংসারকে বিধ্বস্ত করিয়াছে।

যাহা হউক, তিলোত্তমা যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন রামকৃষ্ণের জাজ্জ্বল্যমান্ সংসার। তিলোত্তমারও জন্মসময়ের বৈশিষ্ট্য ছিল,—তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মনক্ষত্রে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার কোষ্ঠী রচনা করিয়া আচার্য্য নাকি বলিয়াছিলেন,—তিনি স্বর্গভ্রষ্টা। সেইজন্য স্বর্গের অপ্সরার নামানুকরণে তাঁহার নাম 'তিলোত্তমা' রাখা হয়। আমাদের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে,—'পিতৃমুখী কন্যাসুখী'। তিলোত্তমা পিতৃমুখী 'পয়মন্ত' বলিয়া, পিতামাতার আদরের দুলালী ও পিতামহের নয়নের মণি ছিলেন। তিলোত্তমার জন্মের অল্পদিন পরে রামকৃষ্ণ বিপত্নীক হন এবং এই শিশু পৌত্রী তাঁহার সান্ত্বনাস্থল হয়। তিনি তিলোত্তমাকে প্রায় সর্ব্বক্ষণ বুকে-পিঠে করিয়া রাখিতেন। এই ভাগবত বৃদ্ধের সংসর্গে মানুষ হওয়াতে, বাল্যকাল হইতেই তিলোত্তমার হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রীতির সঞ্চার হয়। অতি শৈশব হইতেই, তিলোত্তমা বড়দের অনুকরণে হরিনাম করা, মালা জপ করা, পূজা-আহ্নিক ইত্যাদি করা বড় ভালবাসিতেন। সঙ্গীদের লইয়া তিনি ঐ খেলাই খেলিতেন,—অন্য খেলা জানিতেন না, ভালও লাগিত না। রামকৃষ্ণের বাড়ীতে আশ্বিন মাসে বিজয়া-দশমী হইতে কার্ত্তিক মাসে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত সকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহর অবধি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইত এবং এই বালিকা প্রত্যহ শুদ্ধবসনে নিরম্বু বসিয়া, তদ্গতচিত্তে শেষ পর্য্যন্ত সেই পুণ্যকথা শ্রবণ করিতেন। বৈকালে বেলা ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত হরিনাম-সংকীর্ত্তন হইত। বৃদ্ধ

রামকৃষ্ণ ভাবে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন আর এই বালিকাও কোমরে কাপড় জড়াইয়া, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেন! রামকৃষ্ণের গুরুদেব তিলোত্তমাকে 'ভক্তিমতী-মা' নামে সম্বোধন করিতেন। এই উপলক্ষ্যে সরকার-বাটীতে অন্নকূট ও হরিবাসর মহোৎসব অতি আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইত এবং বহু সাধু-সন্ন্যাসী, অতিথি-অভ্যাগত সমাগত ও সৎকৃত হইতেন। তখন এই 'ভক্তিমতী-মা' দাদামহাশয়ের পার্শ্বচারিণী হইয়া, মূর্ত্তিমতী কল্যাণীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন,—আহার-নিদ্রা তখন তাঁহার মনে থাকিত না।

দুঃখের বিষয়, রামকৃষ্ণ তাঁহার আদরিণী পৌত্রীকে সুপাত্রস্থ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। সে যুগের লোক হইলেও, তিনি বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ না করিলে কন্যা বিবাহযোগ্যা হয় না, ইহাই তাঁহার মত ছিল। তাঁহার কন্যাদিগকে তিনি সেই মত বিবাহ দিয়াছিলেন। তিলোত্তমার বয়স যখন মাত্র ৭।৮ বৎসর, সেই সময় তিনি পরলোক গমন করেন। তবে তিনি তিলোত্তমার বিবাহের জন্য প্রচুর অর্থ পৃথক্ করিয়া রাখিয়া যান এবং তাঁহার বড় জামাতা ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচনের ভার দিয়া বলিয়া যান,—"যেন নির্ম্মল চরিত্র ছেলের সঙ্গে দিদির আমার বিয়ে হয়, তা সে যতই হীন অবস্থার হোক্, এমন কি, সেজন্য যদি গাছতলাতেও দিদিকে আমার দিতে হয়, তাতে আপত্তি ক'রো না। দিদি আমার নিজের ভাগ্যে নিজেই সোনা ফলিয়ে নেবে, ও জীবনে কখনও কষ্ট পাবে না।"

তিলোত্তমার পিতাও হরিভক্তিপরায়ণ ও সন্তানবৎসল ছিলেন।

মাতা ছিলেন মাটির মানুষ। তাঁহার সরলতাপূর্ণ শান্ত স্বভাব তিলোত্তমায় বর্ত্তিয়াছিল। এস্থলে তিলোত্তমার সরলতার একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদিন একটী ভদ্রলোক তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। পিতা গৌরকিশোর তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি কন্যাকে বলিলেন,—"যাও ত মা, ব'লে এস,—বাবা ঘুমুচ্ছেন।" সরলা কন্যা ভদ্রলোকটীকে অবলীলাক্রমে বলিয়া আসিলেন,—"বাবা বল্লেন, আপনাকে বল্তে যে, বাবা ঘুমুচ্ছেন।" এই সামান্য ঘটনায় অনেকে মনে করিতে পারেন, ইহা নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। তিলোত্তমা বাল্য বয়সেই গৃহকর্ম্মে বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন। আদরিণী কন্যার পিতা-মাতা স্নেহান্ধ হইয়া, কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কন্যা দুইদিন পরে পরের ঘরে যাইবে, কি জানি কেমন ঘরে পড়িবে,—ইহা বুঝিয়া তাঁহারা কন্যাকে গৃহস্থালী বিষয়ে এবং শ্বশুরালয়ে গিয়া কি ভাবে চলিলে বধূরূপে আনন্দদায়িনী হইতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন এবং কন্যাও ঘর ঝাঁট্ দেওয়া, বাসন-মাজা, কুট্না-কোটা, বাট্না-বাটা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কার্য্য অতি আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, কর্ত্তব্যগুলি এমন দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেন যে, বাড়ীর সকলে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিলোত্তমার স্মৃতিশক্তি অতি প্রখরা ছিল। এই বয়সেই তাঁহার রামায়ণ মহাভারতের বহু অংশ মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। তখন পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না। তাঁহার এক পিস্তুত ভাইকে পড়াইবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে একজন শিক্ষক আসিতেন।

তিনি মেয়েটীর মেধা দেখিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ৫।৬ বৎসর লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তিলোত্তমার পিতা তাহাতে খুব উৎসাহ দিতেন। অধিকন্তু, তিনি শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় কন্যাকে শিক্ষিতা করিবার বাসনা পোষণ করিতেন না,—কন্যার নৈতিক জীবন সার্থক করিবার জন্য, কন্যাকে প্রত্যহ নিজ বিশ্রাম-কক্ষে লইয়া, সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী প্রভৃতি সতীকুলশিরোমণিগণের উপাখ্যানভাগ আলোচনা করিতেন। তিনি বুঝাইতেন,—সাবিত্রী রাজার মেয়ে হইয়াও, গরীব স্বামীকে কি প্রকার ভক্তি করিতেন,—শাঁখা-সিন্দূর ব্যতীত তাঁহার অন্য ভূষণ ছিল না। শাঁখা-সিন্দুরই স্ত্রীলোকের ভূষণ। সতীও রাজার মেয়ে ছিলেন, তিনিও স্বামীকে কতদূর ভক্তি করিতেন; সেই জন্যই তিনি জগৎপূজ্যা। ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়া, তিনি কন্যাকে তাঁহার ভাবী জীবনের আদর্শ স্থির করিয়া দিতেন। কন্যাও একাগ্রচিত্তে পিতার মধুর উপদেশবাণী শ্রবণ করিতেন।

ডাঃ সূর্য্যকুমারই তিলোত্তমার স্বামী নির্ব্বাচন করেন। সূর্য্যকুমার চুণীলালের জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি সবজজ ৺হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আত্মীয় ছিলেন। হেমবাবুর বাটীতে সূর্য্যকুমারের সহিত চুণীলালের পরিচয় ঘটে। চুণীলাল তখন মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছেন,—ক্লাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। চুণীলালের ধীশক্তিই প্রথমে সূর্য্যকুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখিতেও চুণীলাল কান্তিমান্, স্বাস্থ্যবান্, বলিষ্ঠ যুবক। প্রতিভা ও স্বাস্থ্য যেন মিতালি পাতাইয়াছে! সে যুগের ছাত্রগণের মধ্যে একাধারে এই ভাবের সমাবেশ অতি অল্পই ছিল। দূরদর্শী চিকিৎসক প্রত্যক্ষ আলাপে ও সন্ধান

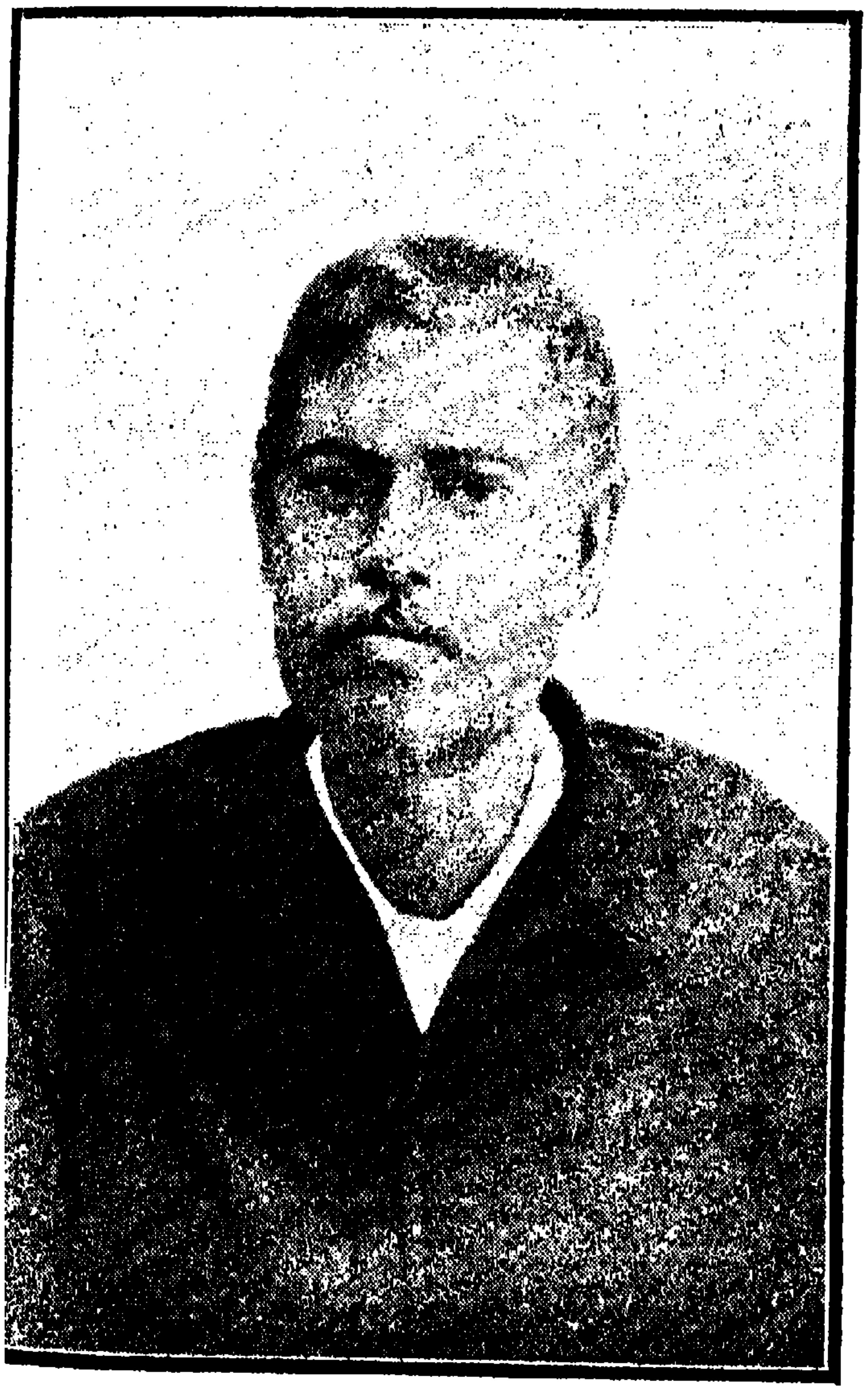

৺হেমচন্দ্র মিত্র
সবজজ, জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি

চমৎকার মোহিনী
জ্যেষ্ঠা ভগিনী

[১৬৪ পৃঃ

লইয়া জানিলেন, চুণীলাল অতি সৎস্বভাব। তিনি স্থির-সিদ্ধান্ত হইলেন, এ-ই রামকৃষ্ণের মানস-পৌত্রীর উপযুক্ত পাত্র। সূর্য্যকুমার তিলোত্তমার পিতা গৌরকিশোরকে সংবাদ দিয়া কলিকাতায় আনাইলেন এবং পাত্রের গুণরাজির বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—"ছেলেটী নিজে ঐশ্বর্য্য-বান্,—কিন্তু একেবারে নিঃস্ব, বাড়ীটী পর্য্যন্ত বন্ধক।" গৌরকিশোর ছেলে দেখিয়াই মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ পাত্রে কন্যাদানে সম্মতি জানাইলেন। এইখানে ভবিতব্য মানিতে হয়,—পাত্র দেখা হইল, কিন্তু পাত্রী দেখা হইল না! সূর্য্যকুমার ও গৌরকিশোর চুণীলালের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সূর্য্যকুমার গৌরকিশোরকে দেখাইয়া চুণীলালের পিতা দীননাথকে বলিলেন,—"মেয়েটী দেখ্‌তে ঠিক এই রকম হবে। যদি হয় ত এইতেই মত করুন্। না হয় ত মেয়ে দেখে আস্‌তে পারেন। তবে আমি ব'লে রাখ্‌ছি, মেয়ের মুখখানি অবিকল এই মুখের মত।" গৌরকিশোর দেখিতে মন্দ ছিলেন না। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন চেহারা,—চোক্ দুটী বেশ টানা টানা। দীননাথ অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তিলোত্তমার গুণের কাহিনী শুনিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। দাবি-দাওয়ার কোনও গোলমাল ছিল না। তাহার উপর এত বড় একটা লোকের অনুরোধ। কন্যার পিতাও কুদর্শন নহেন। বিশেষতঃ, এরূপ একটা বনিয়াদী ঘরে কাজ। তিনি কন্যা দেখিবার ঝঞ্ঝাটে গেলেন না, বিবাহে মত দিলেন। তখন অমৃতলালের বিবাহের সব ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গিয়াছে,—৪ঠা ফাল্গুন দিন,—কলিকাতায় বিবাহ। ঐ দিনেই চুণীলাল-তিলোত্তমার গাত্র-হরিদ্রার এবং ১১ই তারিখে বিবাহের দিন স্থির হইয়া

গেল। তখন চুণীলালের বয়স ২০।২১ এবং তিলোত্তমার ১৩।১৪ বৎসর।

খুব ধূম-ধামের সহিত গৌরকিশোর কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। দান-ধ্যান, সামাজিক বিদায়, নহবৎ, রোস্‌নাই, "দীয়তাং ভূজ্যতাম্‌" কিছুরই অভাব হয় নাই। আনন্দ-কোলাহলে ব্রাহ্মণপাড়া মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। পিতা কন্যাকে অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। আদরিণী পৌত্রীর বিবাহে রামকৃষ্ণের যাহা করিবার অভিলাষ ছিল, গৌরকিশোর তাহার কোনওটীর ক্রুটী করেন নাই। সুপাত্রস্থ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার আর আনন্দের সীমা ছিল না; চুণীলালের পিতা দীননাথও পুত্রের সৌভাগ্য দেখিয়া, পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু গৌরাঙ্গ-প্রীতি আমাদের সমাজে বড়ই প্রবল। কত দিন হইতে ইহা আমাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহা আমরা জানিনা, তবে ইংরাজ-রাজত্বের সূচনা হইতে ইহার প্রভাব একটু বেশী হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। আমাদের রাজা শ্বেতাঙ্গ, সুতরাং, কটা-চাম্‌ড়াই সুরূপের আশ্রয়স্থল, ইহাই যেন আমাদের ধারণা! মানুষ সৌন্দর্য্যের উপাসক, স্বীকার করি। কিন্তু সৌন্দর্য্য বলিতে কি বুঝায়, লাবণ্য বলিতে কি বুঝায়, রূপমাধুর্য্য বলিতে কি বুঝায়,—আমরা তাহা তলাইয়া দেখি নাত! সুন্দরী বলিলে মেমের ছবি আমাদের মনে আসে, অথচ পাশ্চাত্যের সৌন্দর্য্যের যাহা আদর্শ, প্রাচ্যের—বিশেষতঃ, ভারতের আদর্শ তাহা নহে। দেশ-ভেদে, জাতি-ভেদে, জল-বায়ু-ভেদে, শিক্ষা-সভ্যতা-কৃষ্টিভেদে সৌন্দর্য্যের রুচি-বিভেদ হইয়া থাকে। আমরা

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

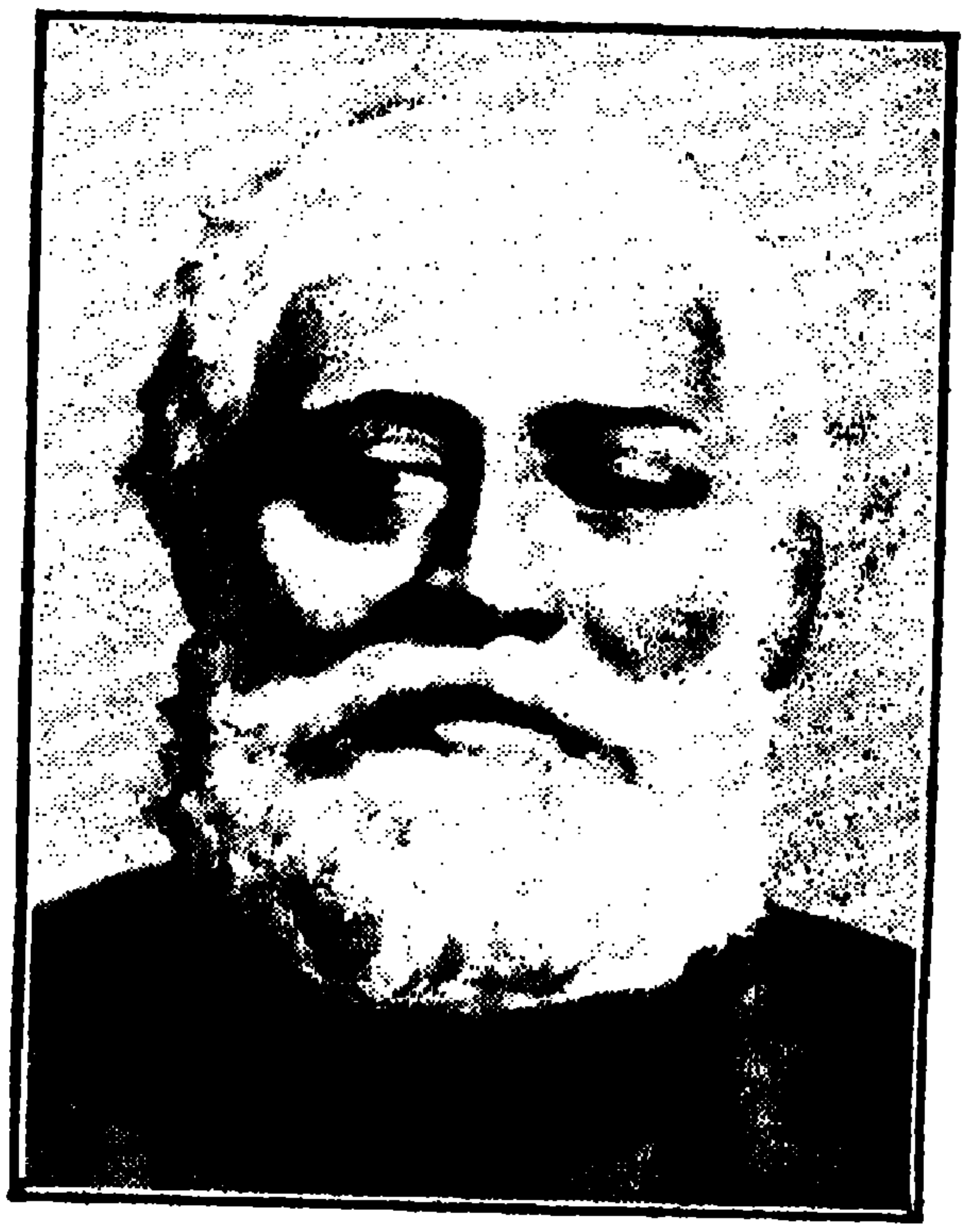

ডাঃ রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর

[১৪৮ পৃঃ]

কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে সুন্দরী বলিয়া থাকি,—শ্রীকৃষ্ণকে চিরসুন্দর পরম-রূপৈকনিলয় বলিয়া পূজা করিয়া থাকি। কালোর মধ্যেও আমরা রূপের আলো দেখিতে পাইয়াছি। ফলতঃ, ভারত বর্ণের উপাসক ছিল না, ছিল লাবণ্যের উপাসক, সৌষ্ঠবের উপাসক। অজন্তা, এলিফাণ্টা, সারনাথ প্রভৃতি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তদ্ভিন্ন, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উপায়ান্তরও নাই। ভারতে চিরবাসী হইয়া, ভারতকে নিজ দেশ বলিয়া পূজা করিতে হইলে, বর্ণের গণ্ডী টানিলে চলে না, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ তাহা ভালই জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই, তাঁহারা সেই কালোর মধ্যেই রূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের সে আদর্শ হারাইয়াছি। অবশ্য, পাশ্চাত্য রমণীর যে রূপ নাই, তাহা আমাদের বক্তব্য নহে। রূপের যে মাধুর্য্য, যে লীলায়িত অথচ সলজ্জ অঙ্গবিলাস আমাদের সভ্যতা-সম্মত, আমাদের সৌন্দর্য্য-সাধনার উপাস্য,—যে শুচিস্মিত তনুরুচি কাঙ্ক্ষণীয় ও বরণীয়,—প্রতীচীর বরনারীর রূপের পানে প্রশংসমান্ দৃষ্টিতে চাহিয়াও, আমরা তাহা খুঁজিয়া পাই না। ইহা আমাদের ক্রটী বলিলে মিথ্যা বলা হইবে, যেহেতু, ইহা জাতির বৈশিষ্ট্য,—রূপ-প্রেক্ষণ-রুচির তারতম্য মাত্র।

আবার পুরুষ অপেক্ষা নারীর রূপসম্বন্ধে বিচক্ষণতা বেশী। আমাদের বোধ হয়, তাহার কারণ, পুরুষ নারীর রূপে যত মুগ্ধ হয়, নারী পুরুষের রূপে তত নহে। আমাদের সমাজে নারীর পক্ষে সে সুযোগও খুব কম। সুতরাং, নারীর বিচারশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। রূপৈশ্বর্য্যে নারীই সমধিক ঐশ্বর্য্যশালিনী, ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং, রূপের বিচার রূপসীর পক্ষে শোভন ও স্বাভাবিক। কিন্তু রূপের অভিমান

বা রূপের অহঙ্কার যে নারী-হৃদয়ে রাজত্ব করে, সেখানে নিরপেক্ষ রূপ-বিচারের প্রত্যাশা করা যায় না। তাহার উপর পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংস্কার অধিকতর দৃঢ়মূল। নারী যখন যে ধারণা পোষণ করেন, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করা কঠিন। আবার অন্ধ-ধারণা বা অন্ধ-সংস্কারের বিশেষত্বই এই যে, যদি তাহা কোনও প্রকারে স্বভাব-ভাব-প্রবণা নারীর চিত্ত-ক্ষেত্রে শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে, তাহা হইলে, তাহা যুক্তির বাত্যায় উন্মূলিত করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা বলিতে চাহি না, সকল নারীই এইরূপ অন্ধ-ধারণা বা অন্ধ-সংস্কারের বশবর্ত্তিনী। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পুরুষ-সমাজের ন্যায় নারী-সমাজেও সুশ্রীতা ও কুশ্রীতার আদর্শ বিকারপ্রাপ্ত হওয়াতে, পুরুষের ন্যায় নারীও আজ ঐ কটা-চাম্‌ড়াকেই সৌন্দর্য্যের একমাত্র নিদান বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছেন। সেজন্য আমরা কিন্তু নারীকে তত বেশী দোষী করিতে পারি না,—যেহেতু, পুরুষ নারীকে যে রূপে পূজা করিতে চাহেন, সেই রূপই কালোচিত আদর্শ রূপ না মানিয়া নারীর উপায় কি ?

কিন্তু এই প্রসঙ্গে এত কথা বলিবার অবসর হইত না, যদি আজ রূপবান্ চুণীলালের পার্শ্বে গৌরাঙ্গী তিলোত্তমাকে অধিষ্ঠিতা দেখিতে পাইতাম ! কেন না, তাহা হইলে, মাতা ভগবতীকে এত বিচলিতা হইতে হইত না। পল্লীর মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস তিলোত্তমার অঙ্গে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পল্লীর সরসী-সলিল, সহরের কলের জলের ন্যায়, তিলোত্তমার দেহকে অবরোধ-বহুল-সহর-সুলভ শ্রীদানের পক্ষে সহায়তাও করে নাই। বিলাসিতা তিনি জানিতেন না, অঙ্গরাগ বা প্রসাধন রামকৃষ্ণ বা গৌরকিশোরের সংসারে আমল পায় নাই। তাহার উপর,

রসায়নাচার্য্য চুনীলাল

যৌবনে

[১৫০ পৃঃ]

বিবাহের সময় তিলোত্তমা ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন। সুতরাং, সেই বিমলিনা, রোগশীর্ণাকে দেখিয়া, মাতা ভগবতীর যে চিত্তবিক্ষোভ ঘটিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি! ঘটিবার আরও কারণ ছিল। এই সেদিন জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃতলাল কার্ত্তিকের ন্যায় অঙ্গকান্তি, বউ আনিয়াছে কালো,—এ-ও কালো! অভিমান ত হইবারই কথা। তিনি গৌরাঙ্গী, পুত্র-কন্যারা গৌরাঙ্গ, বউ আসিল দুইটীই কালো! ভগবতী সত্যই ত সেদিন ধৈর্য্য রাখিতে পারেন না! সেদিন তিনি শুধু রঙই দেখিয়াছিলেন, রূপ খুঁটাইয়া দেখিতে পারেন নাই, বধূদের স্বরূপ দেখিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। সেদিন তিনি কাঁদিয়াছিলেন, এমন কি, স্থিরধী চুণীলালকেও বিচলিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু আকাশে মেঘ কতক্ষণ থাকে?—বারিবর্ষণ হইলেই ত তাহার পরিসমাপ্তি! স্নেহের রাজ্যে স্নেহাস্পদ কতক্ষণ উপেক্ষিত হয়? বুদ্ধিমতী ভগবতী বুঝিলেন, তথাকথিত রূপের মোহ তাঁহার কাটিয়া গেল। স্নেহের অঞ্জনে তিনি দেখিলেন, তাঁহার বধূরা কালো হইলেও, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা,—কুরূপা নয়। সত্যই তাঁহারা কেহই কুরূপা নহেন। ক্রমে ক্রমে স্বরূপের সন্ধান মিলিতে লাগিল। তখন ভগবতী বেশ বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহার বধূরা শুধু সুরূপা নহেন,—সেবাপরা, গৃহকর্ম্মনিপুণা, আনন্দময়ী কমলার প্রতিচ্ছবি। তাহাদের শুভাগমে, তাহাদের মঙ্গলময় করস্পর্শে, তাঁহার দৈন্যের সংসার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

বলিয়াছি, কালো বউ পাইয়া চুণীলালও বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মানস-প্রতিমা যে এইরূপে আবির্ভূতা হইবেন, ইহা হয়ত তিনি

প্রত্যাশা করেন নাই। রূপের মোহ তাঁহার যে ছিল না, ইহা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। তবে তিনি এতটা ধৈর্য্য হারাইতেন না, যদি মাতার চক্ষে অশ্রু না দেখিতেন। পরিশেষে, তিনি তাঁহার এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিলোত্তমার ভিতরে তিনি রূপেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। সে রূপ তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠবে নহে,—তাঁহার হাসিতে, চাহনিতে আর মধুক্ষরা বাণীতে। তাহার পর যখন এই ভক্তিমতী বালার অনুপম গুণমাধুর্য্য বিকাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন চুণীলালের বুঝিতে বিলম্ব হইল না,—রূপ শুধু দেহের নয়,—হৃদয়েরও একটা রূপ আছে এবং হৃদয়ের রূপ যখন অনুভূতির ফলকে প্রতিবিম্বিত হয়, দেহের রূপ তখন আর লক্ষ্যের বিষয় থাকে না,—অথবা তখন সব সুন্দর, মধুময়, অমৃতময় হইয়া যায়। তাই শুনিতে পাই, এই ঘটনার পরে চুণীলাল একদিন তাঁহার জীবনসঙ্গিনীকে সান্ত্বনাসূচক কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, সৌন্দর্য্য তোমার মধ্যে আছে। সবাই তোমাকে কালো বলে, তাতে তুমি ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না। গুণও তোমার মধ্যে যথেষ্ট আছে,—নিজের গুণে সবাইকে সুখী ক'রো।"

দিন আবার যথারীতি চলিতে আরম্ভ করিল। পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চ পাণ্ডবের ন্যায় দিন দিন ফুটিয়া উঠিতে লাগিলেন। নবাগত বধূ দুইটীর পরিচর্য্যায় মাতা ভগবতী ও পিতা দীননাথ সত্যই চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন। কিন্তু সংসার তখনও দৈন্যের রাহুগ্রাস হইতে মুক্তি পাইল না। ব্যয়সঙ্কোচ ত দীননাথ বা ভগবতীর কোষ্ঠীতে ভগবান্ লিখেন নাই! আয়ের অধিক অনিবার্য্য ব্যয় দেখিয়া, দুঃস্থতার ভীষণতর আক্রমণের আতঙ্কে তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু ঋণ-পরিশোধের উপযুক্ত

অর্থাগমের সম্ভাবনা কোথায়? অমৃতলালের সামান্য বেতন সংসার-খরচেই নিঃশেষ হইয়া যায়। চুণীলাল বৃত্তি পাইয়া, অতি কষ্টে ও নানা কৌশলে ডাক্তারী পড়ার খরচ চালাইতেছেন। তৃতীয় ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ কলেজে প্রবেশ করিয়াছেন এবং গিরীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতেছেন। সুতরাং, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে তমসাচ্ছন্ন করিতে প্রাণ চায় কি? এই সংসারটীর আসন্ন সৌভাগ্যশ্রীর পুষ্পোদ্গমোন্মুখী বল্লরীকে ছেদন করা ভগবানেরও বুঝি অভিপ্রেত ছিল না!

সেইজন্য সেই সময় ঋণ-মুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ তিলোত্তমার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় হইয়া যায়। ইহা যে কত বড় দুঃখের কথা, তাহা চুণীলালের পিতা-মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমৃতলাল সেদিন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন। আমাদের সমাজে মাতৃজাতির একটা বদনাম আছে,—নারী গহনা পাইলে আর কিছু চাহেন না,—এমন কি, গহনা বলিয়া যদি একখানি সোণার 'শিল' গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া যায়, তাহাতে আপত্তি করা ত দূরের কথা, তিনি অবলীলাক্রমে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাহা বহন করিতে পারেন! অবশ্য, বর্ত্তমান যুগে তাহার আংশিক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তিলোত্তমার সে বয়সে সে ভাবের স্ত্রীলোকের যে অসদ্ভাব ছিল না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে যুগেও তিলোত্তমা সে ভাবের মেয়ে ছিলেন না। অলঙ্কারপ্রিয়তা তাঁহার চিত্তে আসন-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাই সেদিন তাঁহার সানন্দ সম্মতিক্রমেই অলঙ্কারগুলি বিক্রীত হইয়াছিল। অলঙ্কারগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, চুণীলালের কুণ্ঠার অবধি ছিল না। সাধ্বী কিন্তু একদিন স্বামীর সে কুণ্ঠা দূর করিয়াছিলেন।

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

বিবাহের ২।৩ বৎসর পরের কথা। ইতিমধ্যে চুণীলালের একটী পুত্রসন্তান হয়। মাতা ভগবতীর আগ্রহে কলিকাতাতেই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তান-সম্ভাবনা বুঝিয়া, তিলোত্তমার পিতা-মাতা কন্যাকে ব্রাহ্মণ-পাড়ায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভগবতীর অসম্মতিতে তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বধূর গহনাগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়াতে, পাছে তাঁহাদের নিন্দা হয়, বোধ হয়, সেইজন্য তিনি বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে মত করেন নাই। তাহার উপর প্রথম সন্তান, প্রসবকালে নানা বিঘ্ন ঘটিতে পারে। পাড়াগাঁয়ে ভাল ডাক্তারের একান্ত অভাব। পুত্র মেডিকেল কলেজে পড়িতেছে। যদি কোনও বিপদ-আপদ ঘটে, কলিকাতায় প্রসূত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করা যাইতে পারে, ইত্যাদি ভাবিয়াও হয়ত ভগবতী বধূকে নিজের কাছে রাখেন। প্রসব-কালে তিলোত্তমা কষ্টও পান যথেষ্ট এবং কলিকাতায় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, সে যাত্রা রক্ষা পান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত কষ্টে পুত্রলাভ করিয়া তিলোত্তমা সুখী হইতে পারেন নাই, আট মাস মাত্র বয়সে শিশুটী মারা যায়। এই ঘটনার পর, পিতা গৌরকিশোর কন্যাকে সান্ত্বনার জন্য বাড়ীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। ভগবতী কিন্তু এবার আর অমত করেন নাই। সম্ভবতঃ, এ সময়ে তিনি নিজের লজ্জা অপেক্ষা বধূর ব্যথাকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিলোত্তমার পিত্রালয়ে যাইবার পূর্ব্বদিন গহনাগুলির কথা চুণীলালের চিত্তকে বড়ই পীড়িত করিল। তিনি সঙ্কোচপূর্ণ কণ্ঠে তিলোত্তমাকে বলিলেন ;—"গহনাগুলি সব নষ্ট হ'য়ে গেছে, হয়ত তোমার কত কষ্ট হচ্ছে!" কিন্তু বুদ্ধিমতী পত্নী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন ;—"কই, কিছু ত কষ্ট হ'চ্ছে না,—কষ্ট হবে কেন বলো?

পত্নী—তিলোত্তমা

[১৫৪ পৃঃ]

শাঁখা-সিঁদুরই আমার গহনা।” এমন কি, পিতা গৌরকিশোরকেও তিলোত্তমা সন্দেহের অবকাশ দেন নাই। পথে গাড়ীতে তিনি তাঁহাকে নানা কথাবার্ত্তার অবসরে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া বলিয়াছিলেন;—“গহনাগুলো প’র্‌লে বড় লাগে, তাই পরিনি।” স্নেহময় পিতাও, শোকসন্তপ্তা কন্যার কথায় অবিশ্বাস করেন নাই। বহুদিন পর্য্যন্ত তিলোত্তমার পিত্রালয়ের কেহ গহনা-নষ্টের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই।

চুণীলালের দ্বিতীয় সন্তান প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরযূবালার জন্ম হয়, (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে) ১২৯২ সালে সপ্তমী পূজার দিন। তিলোত্তমা তখন পিত্রালয়ে ব্রাহ্মণপাড়ায় ছিলেন। পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশ ব্যতীত চুণীলালের অন্যান্য সন্তানও ঐ ব্রাহ্মণপাড়াতেই ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁহার বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনিলপ্রকাশ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ জানুয়ারি মাসে চুণীলালের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নর্ম্মদাবালা এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ আগষ্ট মাসে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশের জন্ম হয়।

চুণীলালের বর্ম্মা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে, সংসারে সাচ্ছল্যের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল। যেন বর্ষাপগমে শরতের স্বর্ণোজ্জ্বল কিরণ-প্রপাত! অমৃতলালের পদোন্নতি হইল, বেতনবৃদ্ধিও হইতে লাগিল। চুণীলাল সহকারী রসায়ন পরীক্ষক ও অধ্যাপকরূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রধান রসায়ন পরীক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ একুশ বর্ষ বয়সে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, মতিহারীতে গিয়া ওকালতীতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিলেন। গিরীন্দ্রনাথ এটর্ণী হইলেন এবং যতীন্দ্রনাথ এল্, এম্, এস্, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য

হইয়া চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইলেন। উন্নতির গোমুখীধারা প্রথমে উপলাহত হইতে হইতে. সহসা একদিন এক স্বর্ণমুহূর্ত্তে এমন বাধা বন্ধহীন উচ্ছলগতিতে ছুটিতে লাগিল যে, শতমুখী হইয়া সার্থকতার মহাসমুদ্রে লীন হইতে তাহার আর বিলম্ব ঘটিল না! সাচ্ছল্যে, সৌন্দর্য্যে ও সৌষ্ঠবে সংসার আনন্দমুখর হইল। ধূলিমুষ্টি স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত হইল। কৃতী ও সৌভ্রাত্রের প্রতিমূর্ত্তি ভাইগুলি, কুলোজ্জ্বলা বধূগুলি ও ফুল্ল-গোলাপ-সুরভি শিশুগুলিতে সংসারে অশান্তির আর লেশমাত্র রহিল না।

এই স্থলে আমরা বসু-পরিবারের সবিস্তার বর্ণনা করিয়া, পাঠক-পাঠিকার বিরক্তি উৎপাদন করিতে চাহি না, সেজন্য চুণীলালের পারিবারিক জীবনের কয়েকটী ঘটনার অবতারণা করিয়া, বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের বা দুঃখের জন্য নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে, মানবজীবনের বৈচিত্র্য ব্যাহত হইত। সুখ-দুঃখের আলো-আঁধারের মধ্য দিয়াই মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হয় এবং সেই আলো-আঁধারের মধ্যেই, তাহাকে প্রতিহত করিবার উপলক্ষ্য হইয়া, বহু বাধা-বিঘ্ন লুক্কায়িত থাকে। যিনি সেই বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া, শান্ত, দান্ত বীরের ন্যায় চলিয়া যাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ মানব পদবীতে উন্নীত হন এবং গৌরব-মাল্য তাঁহার কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করে। বস্তুতঃ, দুঃখ চাই,—নচেৎ, মানুষের মানবতার মুকুল বিকশিত হয় না। যে জীবনে যত বেশী ঘাত-প্রতিঘাত হয়, ঘৃষ্ট চন্দনকাষ্ঠের ন্যায় তাহার সুরভি ততই চারিদিক আমোদিত করে। সুতরাং, ঘাত-প্রতিঘাত মানবের চরিত্র-স্ফূরণে পরমসহায়ক

বলিতে হইবে। দারিদ্র্যের দুর্দ্দিন কাটিয়া গেলেও, উক্ত শাশ্বত ও সার্ব্বভৌম নিয়মানুযায়ী, সংসারী চুণীলালের জীবনেও কতিপয় ঘাত-প্রতিঘাতের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেগুলিকে অতিক্রম করিতে চুণীলালকে যেমন বেগ পাইতে হইয়াছে, তেমনই তৎসমুদয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তৎকালে সিমলা-কাঁসারীপাড়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গত রায় উপেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের সহিত চুণীলালের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরযূবালার বিবাহ হয়। সরযূবালার বয়স তখন দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই,—সুরেন্দ্রনাথ তখন ১৮।১৯ বৎসর বয়স্ক কিশোর মাত্র। সুরেন্দ্রনাথের পিতা অতি সদাশয় ও সরলচিত্ত ছিলেন। পিতার গুণ পুত্রেও অত্যধিক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, বাল্যকাল হইতেই সুরেন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলেজে অধ্যয়ন কালে, তাঁহার এই ধর্ম্মপ্রবণতা তাঁহাকে পাবনাবতার পরমহংসদেবের প্রবর্ত্তিত পথে পরিচালিত করে। তখন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভায় জগৎ উদ্ভাসিত,—তাঁহার ত্যাগ-বৈরাগ্য-পূত সেবাধর্ম্মের মহাবাণী দিকে দিকে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথ সে মহামানবের আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি পরমহংসদেবের শিষ্যমণ্ডলীর দলে ভিড়িয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট মার্গ অনুসরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পিতা-মাতার উদ্বেগের সীমা রহিল না। পুত্রের গতি-বিধি ক্রমশঃ সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, তাঁহারা তাহাকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই উপেন্দ্রনাথের

সহিত চুণীলালের পরিচয় ছিল। উপেন্দ্রনাথ চুণীলালকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, চুণীলালও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। সেই সূত্রে সেই সাধুপ্রকৃতি ছেলেটীর প্রতি চুণীলালের আকৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে। উপেন্দ্রনাথ তখন প্রতিষ্ঠাপন্ন, সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। সুতরাং, সুরেন্দ্রনাথকে কন্যা-সম্প্রদান, এত অল্প বয়সে হইলেও, চুণীলালের পক্ষে অপ্রার্থনীয় ছিল না। বিশেষতঃ, যখন আহ্বান আসিতেছে,—পাত্রের পিতার পক্ষ হইতে। সুতরাং, শুভদিনে শুভলগ্নে শুভবিবাহ হইয়া গেল।

শুনিয়াছি, একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে সুরেন্দ্রনাথ বিবাহ করেন। পিতা-মাতার আগ্রহাতিশয্য তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি বলিয়া, স্নেহময় পিতা-মাতার উপর বিদ্রোহভাব প্রকাশ তাঁহার সাধ্যে কুলায় নাই! তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু গ্রন্থি দৃঢ় হইল না। বিবাহের পর তিনি নিয়মিতরূপে, এমন কি, অধিকতর আগ্রহের সহিত সাধু-সঙ্গ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং ধ্যান-ধারণায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। ক্রমে গৃহত্যাগী হইয়া, আশ্রমের সন্ন্যাসি-গণের সহিত সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া, দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পিতা-মাতা পুত্রের সন্ধান পান না,—ভাবিয়া আকুল হইলেন। উপেন্দ্রনাথ বেশ বুঝিতে পারিলেন, এভাবের পুত্রকে সংসার-পথের পথিক করিতে চেষ্টা করিয়া, ভাল কাজ করেন নাই।

জামাতার বৈরাগ্য-ব্যাপারে চুণীলালও যে বিচলিত হন নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না, তিলোত্তমার ত কথাই নাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই

এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ভবিতব্যকে ত কেহ খণ্ডন করিতে পারে না! আদরিণী কন্যার ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন। তবে নিশ্চেষ্টতা চুণীলালের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কন্যা যাহাতে স্বামীর অভাব বুঝিতে না পারে, তিনি তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করিলেন। উপযুক্ত ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিয়া, তাহার সৎশিক্ষার বন্দোবস্ত হইল এবং যাহাতে তাহার নৈতিক জীবন হিন্দুসমাজসম্মত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তজ্জন্য চেষ্টার কোনও ক্রটী হইল না। কন্যা সরযূ তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না,—মাতা-পিতার সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল,—তিনি অভিনিবিষ্ট চিত্তে বিদ্যাভ্যাস ও শিল্পকলানুশীলনে, গৃহকর্ম্মে ও পুণ্যকথার আলোচনায় নিরুদ্বেগে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের গতি-বিধি চুণীলালের দৃষ্টিপথ একেবারে এড়াইতে পারে নাই। সংসার ছাড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ যে মহদাশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহা খুব বেশীদিন চুণীলালের অবিদিত ছিল না। চুণীলাল ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন এবং যুগাবতার পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি উক্ত মহাপুরুষের সান্নিধ্য-গ্রহণে ও মহামূল্য উপদেশ-শ্রবণে ধন্যও হইয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রিয় গৃহী-শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় মেডিকেল কলেজে চুণীলালের উপরিতন কর্ম্মচারী ছিলেন। সুতরাং, ঠাকুরকে বুঝিয়া, তাঁহার মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হইবার সুযোগ চুণীলালের ভাগ্যে প্রচুর ভাবেই জুটিয়াছিল। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সমাহিত করিবার জন্য, যখন ঠাকুরের অস্থি আনীত হয়, চুণীলাল তাহাতে কাঁধ দিয়াছিলেন। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে, অবসরমতে খুব বেশী

সময় তিনি তথায় গিয়া ধর্ম্মালোচনায় নিরত থাকিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। এক সময় মঠের সন্ন্যাসিগণের সহিত যোগোদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা উক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যাগণের যোগোদ্যানসম্বন্ধে গোলমাল বাধে,—তাহার মীমাংসায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও চুণীলাল মধ্যস্থতা করেন। এতদ্ভিন্ন, রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ সোসাইটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত চুণীলালের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। সুতরাং, চুণীলাল তাঁহাকে একাধারে সুহৃদ্ ও ধর্ম্মোপদেষ্টা রূপে পাইয়াছিলেন। স্বামীজীর গৌরবে চুণীলাল নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন এবং এই মহাত্যাগী বন্ধুর প্রতি তাঁহার সম্ভ্রমের সীমা ছিল না।

সুরেন্দ্রনাথসম্বন্ধে স্বামীজীর সহিত চুণীলালের দিনকতক পত্রব্যবহার হয়। পত্রগুলি সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক বহু তথ্যে পূর্ণ ছিল। দুঃখের বিষয়, স্বামীজীর পত্রগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চুণীলালের পত্রের উত্তরে স্বামীজী লিখেন,—"সুরেন্ আমার কাছে আছে, তোমার চিন্তার কোনও কারণ নাই।" এই সংক্ষিপ্ত ও সরল পত্রের উত্তরে চুণীলাল সংসার ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে আলোচনাপূর্ণ এক সুদীর্ঘ পত্র স্বামীজীকে দেন এবং সুরেন্দ্রনাথ যাহাতে সত্বর গৃহে ফিরিয়া আসেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। বোধ হয়, কর্ম্মবীর চুণীলালের পত্রে গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রশস্ততার উপর অধিকতর সমর্থন ছিল। সেজন্য তাহার উত্তরে স্বামীজী যাহা লিখেন, যুক্তিপূর্ণ হইলেও তাহা এত কঠোর সত্য যে, কন্যার পিতা সংসারী চুণীলালকে জামাতার প্রত্যাবর্ত্তনবিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়িতে হয়। তিনি লিখেন,—বিবাহিত জীবনেই

স্বামী বিবেকানন্দ

[১৬০ পৃঃ]

বুদ্ধদেব বা চৈতন্যদেব সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং, পত্নী থাকিতে সন্ন্যাস-গ্রহণ দোষাবহ নহে। অবশ্য, এভাবের সংসারত্যাগে একটা শান্তিময় সংসার চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে বহু সংসার শান্তিময় হয়। বহুর মঙ্গলের জন্য একের সন্ন্যাস, সুতরাং, তাহাতে যদি সমষ্টির মঙ্গল হয়, তাহা হইলে, ব্যষ্টিকে সমষ্টির হিতার্থ ক্ষতিস্বীকার করিতে হইবে। ত্যাগই জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং যখন সেই ত্যাগ প্রলোভনকে উপেক্ষা করিয়া, আত্মমহিমায় মহীয়ান্ হইয়া উঠে, তখনই তাহার পরিপূর্ণতা। সুরেন্দ্রনাথ যদি ত্যাগের সেই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হন, তাহা হইলে, তাঁহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। অবশেষে তিনি পরমহংসদেবের দৃষ্টান্ত দিয়া পত্রের উপসংহার করেন।

চুণীলাল এই পত্রের উত্তরে আর কিছুই লিখেন নাই। জামাতার বিষয়ে হতাশ হইয়া, তিনি কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। লক্ষ্যের বিষয় এইটুকু যে, স্বামীজীর স্পষ্টবাদিতা চুণীলালের বক্ষে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইলেও, তিনি তাহার মর্ম্মগ্রহ করিয়া, উক্ত বচন শিরোধার্য্য জ্ঞানে, দুর্নিবার্য্য দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাহাকে সহনীয় করিবার জন্য, সংশিক্ষায় কন্যার চিন্তার ধারা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে যত্নবান্ হইলেন।

কিন্তু একদিন সুরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন এবং জানা যায় যে, স্বামীজীই তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন। চুণীলালের নিস্তব্ধতার বিষয় স্বামীজী চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে বোধ হয়, তিনি বুঝিয়াছিলেন,—সুরেন্দ্রনাথ সেবাধর্ম্মের উপাসক এবং

তাঁহার পক্ষে সংসারে থাকিয়াও সেবাকার্য্য অসম্ভব নহে। স্বামীজীর নিদেশক্রমে সুরেন্দ্রনাথ গৃহী-শিষ্য রূপে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্ত্তমানে তিনি বহু সন্তানের পিতা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সন্ন্যাসের সেই নির্লিপ্ত ভাব এবং হিসাবী সংসারীর ন্যায় কূটনীতির অভাব থাকায়, সাংসারিক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তাঁহার জীবনে সার্থকতা আসিত। তবে চুণীলালের কন্যাকে সুশিক্ষা-দান ব্যর্থ যায় নাই,—সরযূবালা আদর্শ গৃহিণী হইয়াছেন। শিবতুল্য স্বামীর ভগবতীতুল্য স্ত্রীর দৃষ্টান্ত ইঁহাদের বিষয়ে একেবারে অতিশয়োক্তি নহে।

সাধক ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ডাঃ শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথের সহিত চুণীলালের দ্বিতীয়া বা কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নর্ম্মদাবালার বিবাহ হয়। এই বিবাহের পূর্ব্বে এক মহাবিভ্রাট ঘটে। মাতামহদত্ত বসতবাটীর সংলগ্ন ২৫ নং মহেন্দ্র বসু লেনস্থ ভূমি চুণীলাল স্বোপার্জ্জিত অর্থে নীলামে খরিদ করিয়া, তাহার উপর এক সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। শুনা যায়, উক্ত জমীর স্বত্বসম্বন্ধে কিছু গোলমাল ছিল। বাড়ী তৈয়ারী হইয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে, জমীর পূর্ব্ব মালিক অন্যের প্ররোচনায় উক্ত জমীর দাবি করিয়া, চুণীলালের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করেন। স্বত্বের গোলমাল চুণীলাল পূর্ব্বে জানিতেন না। তাঁহাদের কয় ভাইয়ের সংসার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, সুতরাং, স্থান-সঙ্কুলান হইতেছে না,—এমন সময় বাড়ীর পার্শ্বস্থ জমী নীলামে বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া, চুণীলাল ৮০০০৲ হাজার টাকায় উহা ক্রয় করেন। স্বত্বের

গলদের কথা চুণীলালের এটর্ণী অবশ্যই জানিতেন,—কিন্তু তখন তিনি তাঁহার নিকট তাহা প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক, নালিশ যখন হইয়াছে, তখন কেহ কেহ তাঁহাকে কূটনীতির ও মিথ্যার আশ্রয় লইতে পরামর্শ দেন। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ চুণীলাল তাহাতে একেবারেই সম্মত হইলেন না,—তিনি আদালতের সম্মুখে স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিলেন,—তাঁহাদের বাটীর সংলগ্ন জমী নীলামে বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া, তাঁহার বসবাসের সুবিধার জন্য, তিনি উহা খরিদ করিয়াছেন। সুতরাং, মোকদ্দমায় তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল।

যেদিন মোকদ্দমার রায় বাহির হইল, তাহার দুই দিন পরে নর্ম্মদা-বালার বিবাহদিন স্থির হইয়া গিয়াছে। গাত্র-হরিদ্রার দিন হইতে আত্মীয়-কুটুম্বে গৃহ পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বাড়ী মনোমত করিয়া সাজানো হইতেছে। চারিদিকে উৎসব—আনন্দ-কোলাহল,—এমন সময় এই বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। জ্যেষ্ঠ অমৃতলাল প্রমাদ গণিলেন,—পত্নী তিলোত্তমারও চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল। কিন্তু চুণীলাল ধীর, স্থির! পরাজয়ের সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইতেও বেশী বিলম্ব হইল না। মাৎসর্য্য উৎফুল্ল হইয়া ঘোষণা করিল, অবিলম্বে চুণীলালকে এই সাধের নবসৌধ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। অমৃতলাল বলিলেন,—"চুণী, কোনো রকমে মেয়ের বিয়েটা দিয়ে নাও, বেশী কিছু ক'রে কাজ নেই।" চুণীলাল উত্তর করিলেন;—"তা কেমন ক'রে হবে দাদা!—বাড়ী আমার গেলে আবার হবে, কিন্তু এ যে আমার শেষ মেয়ের বিয়ে! যদি আমাকে উঠিয়েই দেয়,—বাড়ী ভাড়া ক'রেও, এমনি ঘটা ক'রে আমি আমার নমুর বিয়ে দেবো।"

সুতরাং, পূর্ণ আড়ম্বরের সহিত নর্ম্মদাবালার শুভ পরিণয় সংঘটিত হইল,—অনুষ্ঠানের বা উৎসবের কোনও প্রকার ত্রুটী হইল না। উক্ত মোকদ্দমায় চুণীলাল আপীল করেন এবং তাহার অল্পদিন পরেই আপোষ-নিষ্পত্তি হইয়া যায়। পূর্ব্বমালিককে ৩০০০৲ হাজার টাকা দিয়া চুণীলাল মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলেন। বিপদে ধৈর্য্যধারণ এবং সঙ্কল্পিত বিষয় শত বাধাবিঘ্নসত্ত্বেও কার্য্যে পরিণত করা, চুণীলালের চরিত্রের একটী বৈশিষ্ট্য ছিল।

চুণীলালের বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনিলপ্রকাশের সহিত পরলোকগত জষ্টিস্ স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীর শুভ পরিণয় হইয়াছে। এই বিবাহ লইয়া সে যুগে কলিকাতা সহরে কায়স্থ-সমাজের মধ্যে এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অনেকেই অবগত আছেন, যে সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দেন, তাহার কিয়দ্দিন পরেই, স্যার চারুচন্দ্রের পিতা স্বর্গত রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরও তাঁহার একমাত্র বিধবা দুহিতার বিবাহ দিয়াছিলেন। আশুতোষের ন্যায় রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্রও স্বাধীন-প্রকৃতির লোক ছিলেন, সেজন্য কন্যার মঙ্গল-কামনায়, সমাজের কুসংস্কার-কুঞ্চিত ভ্রূকুটীতে বিচলিত হন নাই।

চুণীলাল যে কায়স্থ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, বিধবাবিবাহের তথা-কথিত দোষদৃষ্টি তৎকালে সে সমাজে ছিল না। সুতরাং, উক্ত বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, চারিদিক হইতে আপত্তি উঠিতে আরম্ভ হয়। চুণীলালের নিকট নানা অনুরোধ-অনুযোগ আসিতে লাগিল। তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্য্যন্ত, যাহাতে এই

জাষ্টিস্ স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ

[১৬৪ পৃঃ]

বিবাহ-ব্যাপার সংঘটিত না হয়, তজ্জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা কেহই এই বিবাহে যোগদান করিবেন না, আভাসে ইঙ্গিতে তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। সংবাদপত্রেও এই বিবাহ-প্রসঙ্গ আলোচিত হইতে লাগিল। শেষে ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে, তাহাতে শান্তপ্রকৃতি অমৃতলাল পর্য্যন্ত ইতস্ততর মধ্যে পড়িয়া গেলেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া আত্মীয়-স্বজন হারাইবেন ভাবিয়া, তিলোত্তমার চিত্তেও দ্বিধার সঞ্চার হইল। কিন্তু চুণীলাল অচল, অটল! তিনি বলিলেন,—"কথা যখন দিয়েছি, তখন তার ব্যতিক্রম হবে না,—ভদ্রলোকের যে কথা, সেই কাজ।" একদিন তিনি পত্নীর মুখের উপর বলিয়া দিলেন,—"ক্রমে দেখ্‌ছি, তুমি ও বড়্‌দা পর্য্যন্ত উল্টো গাইতে আরম্ভ ক'র্‌লে। কিন্তু এটা ঠিক জেনো,—এ বিবাহে যদি তোমাদের সবাইকে পর্য্যন্ত আমার ত্যাগ ক'র্ত্তে হয়,—তাও স্বীকার,—তবুও আমি এইখানেই আমার অনির বিয়ে দেবো।" ইতিমধ্যে একদিন চুণীলালের জনৈক পরমাত্মীয় এবং দেশবিশ্রুত ব্যক্তি চুণীলালকে এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করেন এবং এই বিবাহের পরিণামে চুণীলালকে পুনঃ পুনঃ কত সামাজিক বিঘ্নের সম্মুখীন্ হইতে হইবে, তাহার উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। চুণীলাল তাঁহার কথার উত্তরে বলেন,—"আমরাই ত আমাদের সমাজকে পঙ্গু ক'রে দিচ্ছি! আজ আমাদের চৌদিকে বিধি-নিষেধের সংকীর্ণ গণ্ডী। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তা আমরা বুঝেও বুঝি না। তাই সমাজের যত ভাল ভাল লোক আমাদের সমাজ ছেড়ে অন্য সমাজে চ'লে যাচ্ছেন। আমাদের সমাজের বাঁধন নিয়ে যতই আমরা কষাকষি ক'চ্ছি, আমাদের

জীর্ণ বন্ধন-রজ্জু ততই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। এ ত্রুটী আমি সমর্থন ক'র্‌বো না,—তা আপনারা যাই বলুন। কালের হাওয়া যে ভাবে বইতে আরম্ভ ক'রেছে, তাতে আমার বিশ্বাস, সমাজকে যে ভাবে আপনারা চালাতে চাইচেন, সেভাবে আর বেশী দিন চ'ল্‌বে না, সব ওলোট-পালোট হ'য়ে নবযুগের প্রবর্ত্তনা হবে। সুতরাং, আমি সংকীর্ণতা বা রক্ষণশীলতার আঁচল ধ'রে চ'ল্‌তে প্রস্তুত নই,—তা আমার ভাগ্যে যাই থাকুক্ না কেন। বিঘ্ন-বিপত্তি অনেক আস্‌তে পারে, তা মানি—কিন্তু কি ক'র্‌বো, উপায় নেই। অনেকেই হয়ত আজ আমাকে ছেড়ে যেতে উদ্যত হ'য়েছেন, তাও জানি,—সেজন্য আমি দুঃখিত—কিন্তু,—ঐ একই উত্তর,—কি ক'র্‌বো,—উপায় নেই। তবে তাঁদের আপনি ব'ল্‌বেন,—চুণী বোস্ এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় না,—যখন দাঁড়ায়, দু'পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়ায়।"

চুণীলাল তাঁহার এই তেজস্বিতাপূর্ণ উক্তি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করেন,—সমাজের প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও. তিনি যথাযোগ্য আড়ম্বরে ও অনুষ্ঠানে পুত্রের বিবাহ দেন। এ বিবাহে স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও বাবু ভবনাথ সেন প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার সহায়তা করেন। কালক্রমে সে সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইতিহাস সেদিনের সে স্মৃতিকে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। অধিকন্তু, চুণীলালের উক্ত শেষের কথা কয়টী,—"চুণী বোস্ এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় না—যখন দাঁড়ায়, দু'পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়ায়,"—ইহা প্রবাদবাক্যের মতই চিরদিনের জন্য জগতের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,

চুণীলাল পণপ্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই বিবাহে তিনি দাবি-দাওয়া কিছুই করেন নাই, তবে দেবেন্দ্রচন্দ্র পৌত্রীর বিবাহে দাবি-দাওয়ার কোনও প্রতীক্ষাও রাখেন নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাগিনেয় ৺ব্রজমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মলিনাবালার সহিত চুণীলালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশের বিবাহ হয়। ব্রজমোহনের অবস্থা ভাল ছিল না। এ বিবাহেও চুণীলাল কিছুমাত্র দাবি-দাওয়া করেন নাই।

চুণীলালের মাতার ন্যায় পত্নীও রত্নপ্রসবিনী। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিল-প্রকাশ হাইকোর্টে ওকালতী করিতে করিতে বিলাত যান ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পান। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা স্মল্‌কজ্‌ কোর্টের জজ। কনিষ্ঠ জ্যোতিঃপ্রকাশ মেডিকেল কলেজ হইতে এম, বি, পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে মেডিকেল কলেজে সহকারী রসায়ন পরীক্ষকের কার্য্যে যোগদান করেন ও পরে গভর্ণমেণ্ট-দত্ত বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন এবং বহুমূত্র রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসক হইয়া ফিরিয়া আসেন। এক্ষণে তিনি স্কুল অফ্‌ ট্রপিক্যাল্ মেডিসিন্ বিভাগে উক্ত রোগের গবেষণাকার্য্যে লিপ্ত আছেন এবং উক্ত চিকিৎসার একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

চুণীলালের ভ্রাতৃগণের পুত্রগণও কম কৃতী নহেন। জ্যেষ্ঠ অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার সব ডিভিসনাল্ অফিসার; কনিষ্ঠ শ্রীমান্ রামচন্দ্র এম, বি, ডাক্তার। তৃতীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ রমেন্দ্রনাথ এল্, এম, এস্, ডাক্তার, বিহারের একজন

বিখ্যাত চিকিৎসক। চতুর্থ গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধীরকুমার কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী,—কনিষ্ঠ শ্রীমান্ সুশীলকুমার ব্যবসায়কার্য্যে ব্রতী। পঞ্চম যতীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ প্রদ্যোৎকুমার এটর্ণী হইয়াছেন। চুণীলালের পৌত্রগণের মধ্যেও বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। অনিলপ্রকাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, পিতামহ ও খুল্লতাতের গৌরবময় পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। অনিলপ্রকাশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ অশোককুমার ও অলোককুমার বর্ত্তমানে যথাক্রমে কলেজের ও স্কুলের মেধাবী ছাত্র,—তাঁহাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া অনুমান হয়। চুণীলাল যখন স্বর্গারোহণ করেন, তৎপরে জ্যোতিঃপ্রকাশের পুত্র শ্রীমান্ অমিয়প্রকাশের জন্ম হয়। চুণীলালের দৌহিত্রগণের মধ্যেও কেহ কেহ কৃতী হইয়াছেন। এস্থলে চুণীলালের পৌত্রী অনিলপ্রকাশের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী বিজলীর নামও উল্লেখযোগ্য,—তিনি বর্ত্তমানে বেথুন কলেজের ছাত্রী,—বি, এ, পড়িতেছেন। তিনি ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন ও ইণ্টার্মিডিয়েট্ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জ্যোতিঃপ্রকাশের কন্যা কুমারী গৌরীরও বেথুন কলেজে উপযুক্ত শিক্ষাদান চলিতেছে।

চুণীলালের পুণ্যের সংসার,—বড় আনন্দের সংসার। পতিব্রতা পত্নী তিলোত্তমার একনিষ্ঠ সেবায়, সুশীলা বধূ ও কন্যাদ্বয়ের পরিচর্য্যায়,—ফুল্ল কমলের ন্যায় পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রিগণের আনন্দ-মাধুর্য্যে, তাঁহার জীবন বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও, বড় শান্তিময় ছিল। শুধু তাহাই নহে, তিনি নিজেই যেন শান্তির উৎসস্বরূপ

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

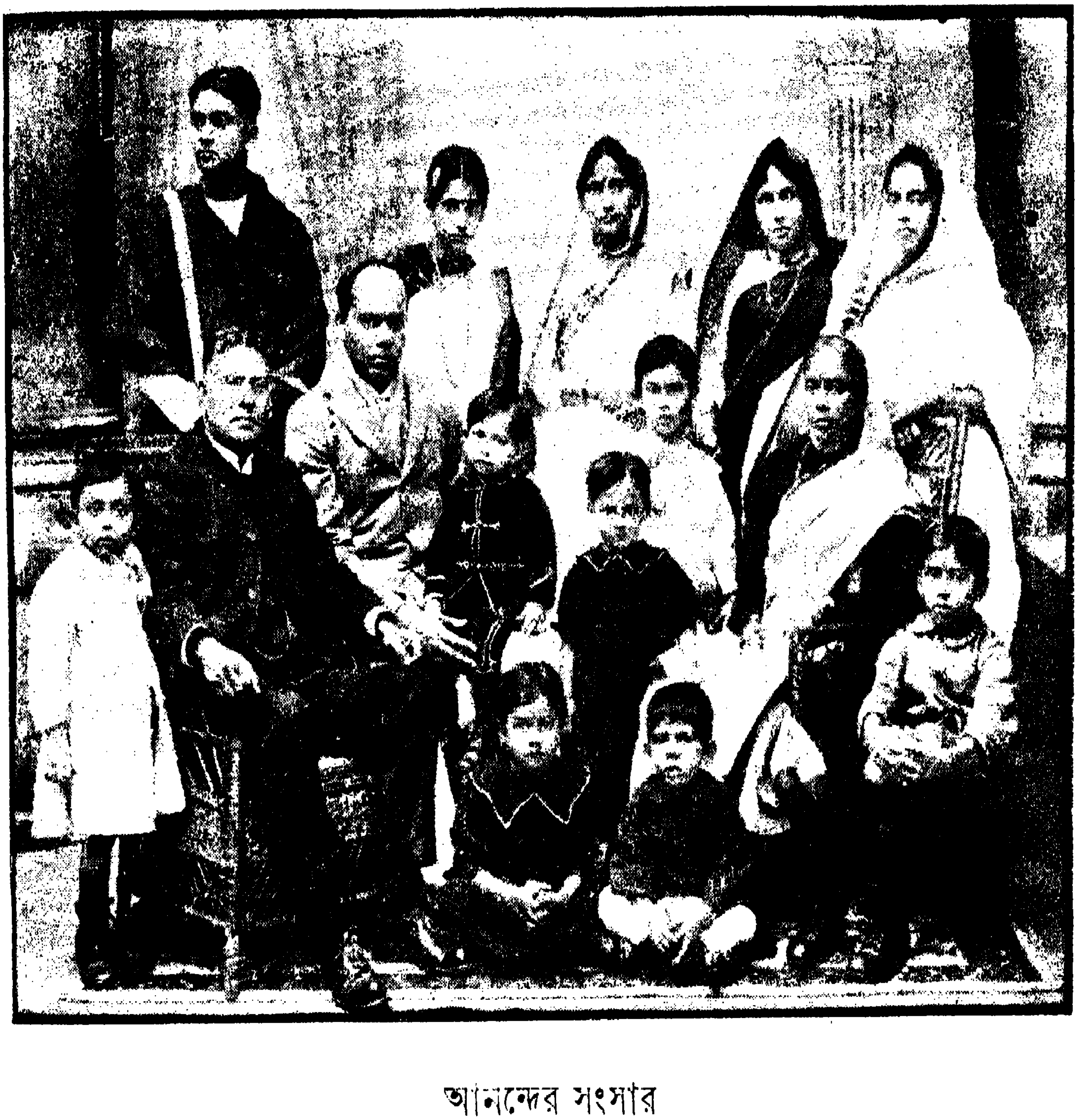

আনন্দের সংসার

দণ্ডায়মান—জ্যোতিঃপ্রকাশ (কনিষ্ঠ পুত্র), বীণা (দৌহিত্রী), নর্ম্মদা (কনিষ্ঠা কন্যা),
লীলাবতী (জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ), সরযূ (জ্যেষ্ঠা কন্যা) ;
উপবিষ্ট—চুণীলাল, অনিলপ্রকাশ (জ্যেষ্ঠ পুত্র), অলোক (পৌত্র), বিজলী (পৌত্রী), তিলোত্তমা (পত্নী)
চুণীলালের দক্ষিণে দণ্ডায়মান—অশোক (পৌত্র), তিলোত্তমার বামে উপবিষ্ট—অজিত (পৌত্র) ;
সম্মুখে দণ্ডায়মান—শুভব্রত (দৌহিত্র), উপবিষ্ট—লক্ষ্মী (দৌহিত্রী), শঙ্কর (দৌহিত্র)।

ছিলেন। তাঁহার সুদক্ষ কর্ণধারণে সংসার-তরণী এমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে পরিচালিত হইত যে, ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও তাহাতে চাঞ্চল্য দেখা দিত না। তাঁহার কর্ত্তব্যপালন কি ঘরে, কি বাহিরে সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি একদিকে যেমন হিসাবী সাহিত্যিক ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই হিসাবী সাংসারিক ছিলেন। অমিতব্যয়িতা বা অনর্থক আমোদপ্রিয়তার তিনি একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। শুচিতাপূর্ণ সাচ্ছল্য ও নির্ম্মল আনন্দ-কোলাহল তাঁহার সংসারে নিত্য-বিরাজ করিত। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য সংসারের সকলকে যেমন অভিভূত করিত, তাঁহার কোমলতা ও মাধুর্য্যও তেমনই বশীভূত করিত। সাধারণ দৃষ্টিতে তিনি 'রাশভারী' লোক ছিলেন, কিন্তু স্নেহাস্পদের নিকট তাঁহার ব্যক্তিত্ব বড় মধুময় ও সহজ অধিগম্য ছিল। আবার শুধু আত্মীয়-স্বজনের নিকট তাঁহার চিত্ত মমতা-নিষিক্ত ছিল, তাহা নহে,—বাড়ীর দাস-দাসীর প্রতিও তাঁহার স্নেহদৃষ্টি বর্ষিত হইত। দারিদ্র্যের দুঃখ তিনি জানিতেন, সুতরাং, তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইবার পক্ষে যে ক্ষমা ও আনুকূল্যের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার হৃদয়-ভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। "Charity begins at home"—এই উক্তির সার্থকতা তিনি পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। স্যার দেবপ্রসাদ চুণীলালের প্রশস্তিতে লিখিয়াছেন,—"Charity first, charity last and charity foremost was the motto of his life"—আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাঁহার দানসত্র তাঁহার গৃহ হইতে আরব্ধ হইয়া, দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দেশের ও দশের সেবা

জীবনযাত্রার প্রথম পাদক্ষেপেই চুণীলাল দুঃখের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, সেজন্য দুঃখীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি স্বতঃই উৎসারিত হইত।

"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে!"

কবি ঈশ্বর গুপ্তের এই উক্তি চুণীলালের জীবনে সত্যরূপ ধারণ করিয়াছিল। যুগাবতার রামকৃষ্ণদেবের অমর উপদেশ ও স্বামী বিবেকানন্দের অবদান-বাণীও তাঁহার কর্ম্মজীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ছাত্রজীবনে তিনি বহুতর দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার করুণার অন্ত ছিল না। ছাত্রমাত্রকেই তিনি ভালবাসিতেন, সেজন্য, তিনি "ছাত্রবন্ধু" খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আবার অনাথ ছাত্র, বিকলাঙ্গ ছাত্র তাঁহার হৃদয়ের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। কলিকাতা অনাথ-আশ্রম (The Orphanage), বেহালা অন্ধ বিদ্যালয় (Behala Blind School), মূক ও বধির বিদ্যালয় (Deaf and Dumb School) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৮৯২ সালে নারিকেলডাঙ্গায় গোলপাতার ঘরে কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে পার্শিবাগানে খোলার ঘরে, ঝামাপুকুরে একতলা বাড়ীতে ও বাদুড় বাগানে ৭০ টাকার ভাড়া বাড়ীতে থাকিয়া, ১৯০৪ সালে ১২।১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজারে নিজ বাটীতে অবস্থিত হয়। মহাপ্রাণ ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। প্রথিতনামা ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণের নেতৃত্বে ইহার ক্রমোন্নতি। স্যার রাজেন্দ্রনাথ অদ্যাপি ইহার কর্ণধাররূপে অবস্থিতি করিতেছেন,—১৮৯৫ সালে তিনি অন্যতম যুগ্মকর্ম্মসচিবরূপে এই প্রতিষ্ঠানে প্রবিষ্ট হন। ১৯১১ সালে যখন স্যার রাজেন্দ্রনাথ অন্যতম কর্ম্মসচিব, সেই সময় অপর কর্ম্মসচিব ৺যদুনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু হইলে, চুণীলাল সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তদবধি প্রায় বিশ বৎসর কাল তিনি এই আশ্রমের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তব্যে দায়িত্বজ্ঞান চুণীলালের অতি প্রবল ছিল। তিনি যখন যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শুধু 'Routine'-ধরা কার্য্য করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না, প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে Routineএর বাহিরেও বহু কার্য্যের অবতারণা ও সম্পাদনা করিয়া, প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতেন। কর্ম্মে ঐকান্তিকতা তাঁহার স্বভাবগত ছিল। সেজন্য তাঁহার অভিনিবেশ কখনও ব্যর্থ যাইত না, তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ১৯১১ সালে চুণীলাল অনাথ-আশ্রমের সেবাভার গ্রহণ করেন,—তখন আশ্রম-ফণ্ডে ৬,৩১৩৶৫

মাত্র মজুত ছিল। ১৯১২ সালে অর্থাৎ মাত্র এক বৎসরের মধ্যে, তাঁহার পরিচালনাগুণে, অর্থভাণ্ডারে ১০,১৪৭৷৶১০ সঞ্চিত হয় এবং ১৯৩০ সালে তাঁহার মৃত্যুর বৎসরে উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ ১,১৫,৯৩০৷৵০ হয়। আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে, চুণীলাল লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়াছেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায়, আশ্রমবাটী দ্বিতলে পরিণত হইয়াছে, রন্ধনশালা বৰ্দ্ধিতায়তন হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, তিনি আরও পাঁচ কাঠা জমী এই আশ্রমের জন্য কিনাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অনাথ-আশ্রম তাঁহার প্রাণের বস্তু ছিল। তিনি ইহাকে প্রায়ই "আমার অনাথ-আশ্রম" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। আশ্রমের ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে পিতৃসম্বোধন করিত, তিনিও তাহাদিগকে পুত্রকন্যাবৎ স্নেহ করিতেন। আশ্রমে কোনও গোলমাল ঘটিলে বা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোনও প্রকার অশান্তির উদ্ভব হইলে, শতকার্য্য পরিহার করিয়া, চুণীলাল আশ্রমে আসিতেন এবং অতি দক্ষতার সহিত ও সকলের প্রসন্নতার সহিত সমস্ত অকৌশলের মীমাংসা করিতেন। তিনি আশ্রমস্থ ছেলে-মেয়েদের এত ভালবাসিতেন যে, তাহাদিগকে লইয়া প্রায়ই আলিপুর পশুশালা, মিউজিয়াম্, শিবপুর বোট্যানিক্যাল্ গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। তাহাদিগকে নিজের তত্ত্বাবধানে, কখনও কখনও নিজ অর্থব্যয়ে খাওয়ান তাঁহার পরম তৃপ্তির বিষয় ছিল। পিতৃ-মাতৃহীন, হয়ত জাতি-কুল-গোত্রহীন ছেলে-মেয়ের কায়িক ও নৈতিক মঙ্গলের জন্য, তাঁহার ব্যাকুলতার অবধি ছিল না। তাহাদের স্বাস্থ্যের সংবাদ লওয়া তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল এবং যাহাতে তাহারা ভাল থাকে, তজ্জন্য তিনি নানা উপায়-উদ্ভাবন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

আমলে, আশ্রমের পিতৃমাতৃ-পরিচয়হীনা কন্যাদের উপযুক্ত বর এতদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, সুদূর সিন্ধুপ্রদেশে তাহাদিগের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হয় এবং একুশটী কন্যার এই ভাবে বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু বিবাহ দিয়াই চুণীলাল তাঁহার দায়িত্ব চুকিয়া গিয়াছে, ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহারই আগ্রহে ও স্যার রাজেন্দ্রনাথের সম্মতিক্রমে, মেয়েগুলি বিবাহিতা হইয়া, তথায় কিভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে জানিবার জন্য, আশ্রমের জনৈক কর্ম্মচারীকে পাঠান হয়। সুখের বিষয়, এই বিবাহ-ব্যবস্থায় কুফল ফলে নাই, প্রত্যেক মেয়েটী সৎপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে এবং তাহাদের সাংসারিক ও দাম্পত্য জীবন শান্তিপূর্ণ হইয়াছে।

আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের প্রতি চুণীলালের অহেতুকী করুণা ছিল,—তিনি যেন তাহাদের প্রতি কঠোর হইতে জানিতেন না! তাঁহারই দৃঢ়তাপূর্ণ সমর্থনে আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের প্রতি দৈহিক শাস্তি একেবারেই নিষিদ্ধ হয় এবং মৌখিক ভৎসনা ও উপদেশে তাহাদের ত্রুটী সংশোধনের ব্যবস্থা হয়। এই প্রীতির নীতি অবলম্বন করিয়া, চুণীলাল তাহার সুফল দেখাইয়া গিয়াছেন। এক সময় একটী ছেলে চরিত্রহীনতার জন্য, আশ্রম হইতে বিতাড়িত হইবে বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু চুণীলাল তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি বলেন,—"ছেলেটী বুদ্ধিমান্, আজ সামান্য ত্রুটীর জন্য যদি একে দূর ক'রে দিই, তাহ'লে সে একেবারে নিরাশ্রয় হবে। তাতে তার চরিত্র ভাল হওয়া দূরে থাকুক্, সে দুর্নীতির চরম সীমায় গিয়ে পৌছুবে। আমরা যখন তার ভার নিয়েছি, তখন তার সব দোষ-দুষ্টি আমাদের চেষ্টা ক'রে শোধন ক'রে নিতে হবে। আমরা তাকে মানুষ ক'রে ছেড়ে দেবো;—দুষ্ট ব'লে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেবো,—

সে কথা ত নয় !" ফলে, চুণীলালের কথাই থাকিয়া যায়,—ছেলেটী আশ্রমে থাকিবার আদেশ পায়। এই ছেলেটী আশ্রম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, চুণীলালের চেষ্টায়, ক্যাম্বেল স্কুলে ভর্ত্তি হয় এবং ডাক্তারী পাশ করিয়া, চুণীলালের সুপারিশে সরকারী চাকরী পাইয়া, সুখে সংসার-ধর্ম্ম করিতেছে।

চুণীলালের বিশেষ আনুকূল্যে আরও একটী ছেলে এই আশ্রম হইতে মানুষ হইয়া উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। বালক ২০ বৎসর ও বালিকা বিবাহিতা না হওয়া পর্য্যন্ত এই আশ্রমে রাখিবার নিয়ম। ছেলেটী ২০ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায়, তাহাকে আশ্রম হইতে বিদায় দিবার ব্যবস্থা হয়। ছেলেটীর উচ্চশিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। কিন্তু শিক্ষা-ব্যয়-সঙ্কুলানের উপায় ছিল না। সে চুণীলালের শরণাগত হইল। চুণীলাল ছেলে চিনিবার সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। ছেলেটীর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, তিনি তাহাকে ৪৫৲ টাকা বেতনে এই আশ্রমের এসিষ্ট্যাণ্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পদে বহাল করেন এবং তাহার উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেন। চুণীলালের এই অমূল্য সহায়তায় ছেলেটী বি, এল, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া, বর্ত্তমানে পশ্চিমে ওকালতী করিতেছে। এইরূপ নানাদিক্ দিয়া চুণীলাল এই আশ্রমের অনাথ-অনাথাদের সহায়স্বরূপ হইয়াছেন।

অনাথ-আশ্রম যেন ছিল তাঁহার আর একটী সংসার! বাড়ীতে কোনও কিছু উৎসব হইলে, অনাথ-আশ্রম পর্য্যন্ত তাহার সাড়া পড়িয়া যাইত। সে উৎসবে অনাথ-আশ্রমের সকলকে না খাওয়াইলে, যেন তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত না! আশ্রমের প্রতি কর্ম্মচারী, এমন কি, চাকর

দরোয়ান্ পর্য্যন্ত তাঁহার পরম আপনার জন ছিল। আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের এই অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রথম সহযোগী আশ্রমের বৃদ্ধ দরোয়ান্ দলীপ তেওয়ারীকে চুণীলাল অগ্রজবৎ শ্রদ্ধা করিতেন এবং আশ্রমের উন্নতিকল্পে এই অশিক্ষিত বিশ্বস্ত বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করিতে একটী দিনও বিস্মৃত হন নাই। এই বৃদ্ধের মুখে আমরা শুনিয়াছি,—যেদিন চুণীলাল রাঁচিতে শেষযাত্রা করেন, বৃদ্ধ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসাবাদের পর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন ;—"ঠাকুরজি, আমি চ'ল্লাম। আশ্রম তোমার প্রাণের জিনিষ, তুমি তাকে দেখ্‌বে ব'লেই ব'ল্‌ছি। দেখো যেন আমার আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের কোনো কষ্ট না হয়। তোমার উপর আমি তাদের ভার দিয়ে গেলাম।"

তেওয়ারী বাল্য হইতে বাঙ্গালায় রহিয়াছে। বাঙ্গালা বুঝেও বেশ, বলেও বেশ। সে বলিল ;—

" সে কি বাবু, যাবার পালা ত আমার! আশ্রমের ভার ত আমি আপনার উপর দিয়ে নিশ্চিন্তে চ'লে যাবো,—ভেবে রেখেছি। আপনি গেলে আমার উপায় কি হবে ?"

চুণীলাল ঈষৎ হাসিয়া উদাস নেত্রে উপরের দিকে চাহিয়া উত্তর দিলেন ;—

" তোমার ভার ?—তোমার ভার ভগবানের হাতে,—তিনিই তোমার উপায় ক'র্‌বেন। তবে দেখ ঠাকুরজি, আমি যাচ্ছি বটে, কিন্তু প্রাণ আমার ওই আশ্রমের উপর প'ড়ে রইল। হপ্তায় অন্ততঃ একখানি ক'রে পত্র দিতে ব'লো। নচেৎ, আশ্রমের জন্য প্রাণ

আমার বড় ব্যস্ত হবে।” বলিতে বলিতে চুণীলালের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল,—চক্ষু হইতেও দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

এই ঘটনাটুকু হইতে চুণীলাল অনাথ-আশ্রমকে কত নিবিড়ভাবে ভালবাসিতেন, তাহার সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যায়। আজিকালিকার যুগে কয়জন অবৈতনিক কর্ম্মাধ্যক্ষ, অন্যবিধ শত কর্ত্তব্যের মধ্যে, সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্য্যে, এমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন এবং চিরবিদায়ের দিনে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য, এমন কয় জনের চক্ষু অশ্রুসজল হয়, তাহা জানি না।

মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া, চুণীলাল এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ২০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহার পূর্ব্বে তিনি বহু সময় বহু উপলক্ষ্যে আশ্রমে প্রচুর অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চুণীলালের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু বর্ত্তমানে উক্ত আশ্রমের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ৺লালবিহারী শাহের ঐকান্তিক চেষ্টায় অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। লালবিহারী অর্থশালী ছিলেন না, স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। মধ্যে তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া অন্ধ হইয়া যান এবং চক্ষুহীনের বেদনা যে কত গভীর, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। লালবিহারী শুধু উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ ছিলেন না, তিনি ভুক্তভোগী, যথার্থ ব্যথার ব্যথী ছিলেন। অন্ধত্ব মানুষের জীবন ব্যর্থ করিয়া দেয়,—ইহার প্রতীকার কি,—এই চিন্তায় তিনি আকুল হইয়া উঠেন। অন্ধের মেধা আছে,

বুদ্ধি আছে, প্রতিভা আছে, একাগ্র অভিনিবেশ ও অসাধারণ অনুচিকীর্ষা আছে,—সর্ব্বোপরি তাহার অত্যদ্ভুত অনুভবশক্তি আছে। তথাপি, চক্ষুষ্মানের পর্য্যায়ে তাহার স্থান নাই! এত বড় অভিশপ্ত জীবন লইয়া, পরানুগৃহীত হইয়া, তাহার মনুষ্যজগতে বাস! এই মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার কি কোনও প্রকার প্রতিষেধ নাই?—ইহা ভাবিয়া লালবিহারী একাগ্রচিত্তে গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ প্রভৃতি স্থান হইতে দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তির শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থাবলী আনাইয়া, তৎ-সাহায্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং ফ্রান্সের মহামনীষী ব্রেল্ সাহেবের রীতি অবলম্বনে, অন্ধগণের শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করেন। প্রথমে কলিকাতায় অতি সামান্য অবস্থানে তাঁহার অন্ধ-পাঠশালার জন্ম হয়। ইহার উৎকর্ষসাধনের জন্য লালবিহারী সর্ব্বস্বান্ত হন এবং অন্ধছাত্রসংগ্রহের জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। সে যুগে—শুধু সে যুগেই বা কেন,—এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশে অনেকের ধারণা,—অন্ধের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় অনর্থক, উহার দ্বারা সংসারের কোনও প্রকার সাহায্যের সম্ভাবনা নাই,—সে সংসারের আবর্জ্জনাময় বোঝা মাত্র। ধনীর সন্তান অন্ধ হইলে, শুধু বসিয়া বসিয়া খাওয়াই তাহার জীবনের যাহা কিছু সব, আর ভিক্ষাবৃত্তি ত দরিদ্রের অন্ধ সন্তানের প্রধান উপজীবিকা। যেন অপরের করুণাই তাহাদের জীবনের একমাত্র সম্বল,—একান্ত পাথেয়, আর কিছু নয়। লালবিহারী যখন দৃষ্টিহীনের জীবনে সাফল্য আনিবার চেষ্টায়, দ্বারে দ্বারে তাহাদের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন, তখন উৎসাহিত করা দূরে থাকুক, অনেকে তাঁহাকে 'ছেলে ধরা'

আখ্যায় ঘোষিত করিল ! কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হইলেন না,—পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইয়া, অক্লান্ত উদ্যমে উদ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত নানা প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধ করিয়া, নিজ তত্ত্বাবধানে লালবিহারী বিদ্যালয় চালান। তৎপরে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন,—এই প্রতিষ্ঠানের উপর কর্ত্তৃপক্ষের এবং কাশিমবাজার, বর্দ্ধমান, নসীপুর প্রভৃতি রাজন্যবর্গের ও স্যার রাজেন্দ্রনাথপ্রমুখ অর্থশালী বদান্যব্যক্তিবৃন্দের নজর পড়িল। * ১৯২৪ সালে বিদ্যালয়টী কলিকাতা হইতে বেহালায় তাহার নিজ বাটীতে স্থানান্তরিত হয় এবং দ্রুত ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। বেহালায় বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইবার সময়, এই দরিদ্র একনিষ্ঠ সাধক লালবিহারী স্কুল-কমিটীর হস্তে নিজের সঞ্চিত ও ভিক্ষালব্ধ অর্থ সর্ব্ব-সাকল্যে প্রায় ৪২০০০৲ হাজার টাকা অর্পণ করেন। বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠান অন্যূন দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি,—প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ইহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ,—বার্ষিক ব্যয় অল্পাধিক ৩৬০০০৲ টাকা। কি সুন্দর প্রতিষ্ঠান ! কি সুন্দর বন্দোবস্ত ! বহির্দৃষ্টিহীন অবহেলিতদের জন্য, মহানুভব লালবিহারীর চেষ্টামূলে আজ কি স্বর্গরাজ্যেরই না সৃষ্টি হইয়াছে ! অন্ধ আজ মূর্খ নয়, সুশিক্ষিত ! অন্ধ আজ শুধু সুকণ্ঠ নয়, সুগায়ক ! অন্ধ আজ অকর্ম্মণ্য নয়, সার্থকশিল্পী ! আজ তাহারা পরের দ্বারে ভিখারী

* অসামান্য লোকহিতৈষণা ও মহানুভবতার পুরস্কারস্বরূপ লালবিহারী এই সময় **'Kaisari Hind'** পদক প্রাপ্ত হন।

নয়, স্বাবলম্বী হইয়াছে! এই প্রতিষ্ঠান হইতে বঙ্গবাসী কলেজের অন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অন্ধ শিক্ষক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় চৌধুরী, অন্ধ ছাত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় প্রভৃতি কৃতী হইয়াছেন।* গতবর্ষে অন্ধ ম্যাট্রিক্ ছাত্র শ্রীমান্ সাধনচন্দ্র গুপ্ত সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, এখানকার বহু ছাত্র ও ছাত্রী সঙ্গীতবিষয়ে ও নানাপ্রকার কুটীরশিল্পবিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া, স্বোপার্জ্জিত অর্থে গৌরবময় জীবন যাপন করিতেছে। বর্ত্তমানে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা একুনে প্রায় একশত। মহাত্মা লালবিহারীর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অরুণকুমার শাহ্ মহাশয় লণ্ডন রয়্যাল নর্ম্যাল কলেজের গ্রাজুয়েট্,—অন্ধশিক্ষাবিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়া, অতি পারদর্শিতার সহিত এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

১৯২৪ সাল হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত, আমাদের চুণীলাল এই প্রতিষ্ঠানের স্কুল-কমিটীর অন্যতম কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১১ সাল হইতে

* 1. Professor Nagendra Nath Sen Gupta, Bangabasi College, Calcutta. Passed Matric in 1919, obtained 1st. Class in M.A. in Philosophy in 1925 and 2nd Class in Economics in 1930. Examiner, I.A., University of Calcutta.

2. Babu Bankim Chandra Roy Chowdhury, 1st Class 2nd in M.A. in History in 1918. Sometime Lecturer, Beltala Girls' College. Examiner, Matric, University of Calcutta.

3. Babu Subodh Chandra Roy, passed Matric in 1927, B.A. in 1932 and studying for M.A. and Law.

স্যার রাজেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট,—বর্ত্তমানে প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত। ভূতপূর্ব্ব চিফ্ জষ্টিস্ ও অন্ধবিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট্ স্যার ল্যান্স্‌লট্ সাণ্ডারসন ও স্যার রাজেন্দ্রনাথ চুণীলালকে আহ্বান করিয়া আনেন। কর্ম্মভার স্কন্ধে লইয়াই চুণীলাল এই প্রতিষ্ঠানকে একেবারে বুকে টানিয়া লইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া খালাস,—ইহা চুণীলালের কোষ্ঠীতে ছিল না। অনাথ-আশ্রমের ন্যায় অন্ধ-বিদ্যালয়ও যেন তাঁহার পরিবার-ভুক্ত হইয়া গেল! কলিকাতা শ্যামবাজার নিজবাটী হইতে বেহালায় অন্ধবিদ্যালয় মোটার-যোগেও প্রায় এক ঘণ্টার পথ। দূর হইলেও শত প্রকার কর্ত্তব্যের মধ্যে অবসর করিয়া লইয়া, চণীলাল নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে, এমন কি, তৎপূর্ব্বেও বিদ্যালয়ে উপনীত হইয়া, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একটু ক্লান্তি নাই, একটু বিরক্তি বা বিরতি নাই। শুধু তাহাই নহে, প্রতি ছাত্র ছাত্রীকে আহ্বান, তাহাদিগকে কুশল প্রশ্ন, তাহাদের অসুস্থতার প্রতিবিধান, তাহাদিগকে সস্নেহ সম্ভাষণ ইত্যাদি চুণীলালের অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত ছিল। বেহালায় আসার পর, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একবার ভয়ানক ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয় এবং চুণীলালের প্রচেষ্টায় ও চিকিৎসা-ব্যবস্থায় তাহা নিবারিত হয়। বেহালায় স্কুল-প্রতিষ্ঠার সময় বাঙ্গালার তৎকালীন গভর্ণর বাহাদুর লর্ড লিটন্ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য এক আবেদন পত্র বাহির করেন। তাহাতে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহের কথা থাকে। এই অর্থ-সংগ্রহে অগ্রণীগণের মধ্যে স্বর্গত রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর (Late Inspector General of Registration) ও আমাদের

চুণীলাল প্রধান। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চুণীলালের অবকাশ ছিল না,—অর্থসংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে ছুটাছুটি করিতেছেন। এমন কি, এক ধনশালী ব্যক্তির সহিত রাত্রি ১১টা ব্যতীত সাক্ষাৎ হয় না,—সেই রাত্রি ১১টায় চুণীলাল তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছেন ও অর্থসংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে, মাত্র ছয় মাসের মধ্যে উক্ত এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। চুণীলালের কার্য্যকালেই এই প্রতিষ্ঠানের সমধিক উন্নতি হইয়াছে। বলিতে কি, চুণীলালের সময়ই এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় যুগ। এখানেও চুণীলালের সেই ঐকান্তিক সেবার সুফল ফলিয়াছে। অনাথ-আশ্রমের ন্যায় অন্ধবিদ্যালয়ও চুণীলালের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী।

১৯২৮ সালে ১লা জুলাই তারিখে অন্ধবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ লালবিহারী শাহ্ মহাশয়ের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁহার অসুস্থতার একুশদিন চুণীলাল প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে চুণীলাল আত্মীয়-বিয়োগের ন্যায় ব্যথা পান এবং সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, সাশ্রুনেত্রে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন। তাঁহার শোক-সভায় চুণীলাল সভাপতিত্ব করেন ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু কালের আহ্বানে তাঁহাকে শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইল বলিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই প্রতিষ্ঠানেও চুণীলাল নিয়মিতভাবে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে ১০০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই দান সামান্য হইলেও, এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে যাঁহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন,

তাঁহাদের মধ্যে এভাবের অর্থসাহায্য তিনিই প্রথম করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, প্রতিষ্ঠাতা লালবিহারীর কথা স্বতন্ত্র।

কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের সহিত চুণীলালের সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। মহাপ্রাণ ৺গিরীন্দ্রনাথ বসু এই মহাহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা প্রথমে কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত ছিল, পরে অপার সার্কুলার রোডে নিজবাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১৯০১ সালে চুণীলাল ইহার সাধারণ সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং ১৯০৩ সালে ইহার কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য হন। তদবধি ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত এই কার্য্যে বহাল থাকিয়া, এই প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বাঙ্গীন সৌকর্য্যসাধনের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। ১৯২৮ সালে তিনি ইহার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার তিরোধানের কয়েকমাস পূর্ব্ব অবধি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বলা বাহুল্য, অনাথ-আশ্রম বা অন্ধ-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁহার নিকট হইতে যে অপত্যস্নেহ পাইয়াছিল, অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরাও তাহা হইতে একটুও বঞ্চিত হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠানটীকেও তিনি তাঁহার নিজের জ্ঞানে সেবা করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বের উইলে তিনি এই বিদ্যালয়ে এককালীন ৫০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, দীর্ঘ ত্রিশবৎসর মাসিক চাঁদা নিয়মিতভাবে দিয়া গিয়াছেন, সাময়িক দানও ছিল যথেষ্ট।

পানিহাটী "গোবিন্দকুমার হোম্" নামক নারীরক্ষাশ্রমের প্রতিষ্ঠা-মূলেও চুণীলাল জড়িত ছিলেন। এই নারীরক্ষাশ্রম সর্ব্বপ্রথমে হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি গ্রীভ্স্ সাহেবের নামানুযায়ী "Greaves

Home" নামে দম্‌দমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। চুণীলালের লিখিত ও ১৯২৩ সালের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত Calcutta Suppression of the Immoral Traffic Bill শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারি,—তাঁহার মতে পতিতা নারীদিগকে দূরে রক্ষা করা সমাজের পক্ষে যেমন স্বাস্থ্যকর, পথভ্রষ্টা নারীকে উদ্ধার করিয়া, যথাযোগ্য আশ্রয়ে রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা, তাহাকে সুপথে চালিত করাও তেমনই একান্ত প্রয়োজনীয়। তজ্জন্য, একাধিক রক্ষাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও উপযুক্ত নৈতিক শাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে সৎপথে সুখে জীবনযাপন করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করা, প্রতি দেশহিতৈষী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সে সময় মিশনারীরা যদিও এদেশে এই ভাবের রক্ষাশ্রমের প্রবর্ত্তন করিয়া, বহু পতিতাকে আশ্রয় দিয়া আসিতেছিলেন,—তথাপি, তাহাতে স্থান-সঙ্কুলানের অভাব অনুভূত হইতেছিল। অধিকন্তু, হিন্দু পতিতাদের পক্ষে সে আশ্রয় সম্পূর্ণ আশানুরূপ ছিল না। ইত্যাদি কারণে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি হিন্দু নারীরক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করেন,—চুণীলাল তাঁহাদের অন্যতম। মাননীয় বিচারপতি গ্রীভ্‌স্ উদ্যোক্তৃগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বহু চেষ্টায় দম্‌দমায় নারীরক্ষাশ্রমের উদ্ভব হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষসাধনের জন্যও তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লিটন্ সাহেবের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। তাহার ফলে, চুণীলালপ্রমুখ বহু উদ্যোক্তা নানাস্থানে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, ৩০।৪০ হাজার টাকা তুলেন। সেরপুরের সদাশয় জমীদার গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে পানিহাটীস্থ

বাগানবাটী এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করেন ;—ইহার মূল্য অন্যূন দেড় লক্ষ টাকা। দমদমায় আশ্রমের স্থান অতি সংকীর্ণ ছিল। এক্ষণে, ঐ আশ্রম পানিহাটীতে উঠিয়া গিয়া, উক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয়ের পিতা ৺গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয়ের নামানুযায়ী "গোবিন্দকুমার হোম্" নামে অভিহিত হইয়াছে।

চুণীলাল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উহাতে সাহায্যকল্পে, তিনি নিজ হইতে ন্যূনাধিক সহস্র টাকা দান করেন এবং এমনকি, স্বীয় পত্নী ও পুত্রদের তহবিল হইতে চাহিয়া লইয়া, প্রায় সহস্র টাকা অর্পণ করেন। কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তীস্থানে অবস্থিত হইলেও, চুণীলাল নিয়মিতভাবে ইহার পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমের যে কোনও বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায়, চুণীলালের সাহচর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল। অনাথ-আশ্রম বা অন্ধবিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণের ন্যায়, এই পতিতাশ্রমের বালিকা হইতে বয়স্কা নারীরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে পিতৃসম্বোধন করিত ; তিনিও তাহাদিগকে কন্যাবৎ স্নেহ করিতেন। অনাথ-আশ্রমের ন্যায়, একবার এই আশ্রমেও নারীরা অশান্ত ভাব প্রকাশ করে এবং তাহাদিগকে নিরস্ত করা কষ্টসাধ্য হয়। তৎকালীন লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ নিরুপায় হইয়া, চুণীলালকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। চুণীলাল শত কার্য্যের মধ্যে অবসর করিয়া, অবিলম্বে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং এমন মধুর সম্বোধনে ও সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ বাক্যে সেই অশান্ত আশ্রমবাসিনীদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন যে, তাহাদের সমস্ত উদ্দামভাব একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে তাহারা তাহাদের পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লী বাঁধিয়া,

আশ্রম-প্রাচীরের বাহিরে যাইতে ও স্বেচ্ছাচারিণীর জীবন যাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। সহসা চুণীলালের আবির্ভাবে ও তাঁহার সান্ত্বনাবাণীতে তাহাদের সে দুর্ম্মতি যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল! দুর্ভাগিনী বলিয়া, সত্যই চুণীলাল তাহাদিগকে বড় সহানুভূতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি নিজ বাটী হইতে বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া লইয়া গিয়া, নিজহস্তে তাহাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। তাহাদিগের নৈতিক চরিত্রের মালিন্য দূর করিবার জন্য, চুণীলাল Bengal Social Service Leagueএর সাহচর্য্যে তাহাদিগকে আলোকচিত্রে ধ্রুব-চরিত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক দৃশ্যাভিনয় দেখাইতেন এবং চিত্রপ্রদর্শনান্তে তাহাদিগকে লইয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ-রূপে বুঝাইয়া দিয়া, যাহাতে তাহারা সুপথযাত্রিনী ও ভগবানে নির্ভরশীলা হয়, তাহার জন্য তাহাদের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন। বলা বাহুল্য, চুণীলালের এইভাবের চরিত্র-সংশোধন-প্রচেষ্টা ব্যর্থ যায় নাই। তাহাতে আশ্রমের বহু পতিতা তাহাদের জীবনের পঙ্কলেশহীন শান্তিপূর্ণ পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। চুণীলালের তিরোধানে এই আশ্রমটীও একজন যথার্থ মহাপ্রাণ ও চরিত্রবলসম্পন্ন বন্ধুকে হারাইয়াছে।

জোড়াসাঁকো রাজবাটীতে প্রতিষ্ঠিত ডিষ্ট্রিক্ট্ চ্যারিটেব্‌ল্ সোসাইটীর সহিতও চুণীলাল ১৯০১ সাল হইতে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হন এবং ১৯২৩ সাল হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত, তিনি ইহার কার্য্যকরী সভার সভাপতি ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে, তিনি এইপ্রকার লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান শোভাবাজার হিতসাধনী সভার (Shova-

bazar Benevolent Society) সহিত সংযোগরক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই সভা শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টামূলে সংস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে ইহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চুণীলাল এই প্রতিষ্ঠানেরও একজন প্রধান কর্ম্মীসদস্য ছিলেন। "দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্"—এই মহানীতি অবলম্বন করিয়া, চুণীলাল এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। শতবিধ ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সুযোগ করিয়া, তিনি সাহায্যভিক্ষার্থিগণের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রাতরুত্থান ছিল তাঁহার একটী বিশেষ গুণ। প্রাতর্ভ্রমণ সমাপনান্তে তিনি প্রায়ই স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট হইতে উক্ত সাহায্যপ্রার্থীদের অবস্থা জ্ঞাত হইতেন। যাহাতে যোগ্য পাত্রে,—যথার্থ অভাবগ্রস্তের অভাবমোচনের জন্য সাহায্য বিতরিত হয়, সেজন্য তিনি খুব সাবধান ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজেই ভিক্ষার্থীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেন। এক সময় তাঁহার একজন বিশেষ প্রীতির পাত্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট এক নিরাশ্রয়া সহায়হীনা কায়স্থ-বিধবার জন্য সাহায্য-ব্যবস্থার অনুরোধ জানান। চুণীলাল বলিলেন,—"দেখ, তাঁকে দু'জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের পত্র আন্‌তে ব'লো।" ভদ্রলোকটী তাঁহার উক্তির প্রতিবাদে হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—"এ আপনাদের কি রকম বিদ্‌ঘুটে নিয়ম যে, ভদ্রঘরের কুলবধূকে দু'জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত হ'তে হবে, নচেৎ, আপনাদের সোসাইটী থেকে তার সাহায্য মিল্‌বে না!" চুণীলাল তাঁহার শ্লেষোক্তি বুঝিলেন, কিন্তু বিরক্ত না হইয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—"ব'ল্‌ছ বটে, কিন্তু কি করি বলো? প্রকৃত

অভাবগ্রস্ত খুঁজে বা'র করা কত কঠিন, তা জান না ত,—তাই ও ব'ল্‌ছ। যাহোক্, তুমি যখন সুপারিশ্ হ'য়েছ, তখন তাতেই চ'ল্‌বে।" তাঁহার বাটীতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সাহায্যার্থীর ভিড়্ আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অতি ধৈর্য্যসহকারে তিনি তাহাদের বক্তব্য শুনিতেন ও যোগ্যাযোগ্য বিবেচনায় সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন।

১৯২২ সালে চুণীলাল উক্ত সোসাইটী হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত দরিদ্রের শীতবস্ত্রের জন্য এককালীন ৫০০৲ ও পরে সাধারণ সাহায্যের জন্য ১৯২৭ সালে পুনরায় ৫০০৲ টাকা অর্পণ করেন। এতদ্ভিন্ন, মাসিক চাঁদা ত ছিলই। মৃত্যুর পূর্ব্বের উইলেও তিনি আরও ৫০০৲ টাকা দ্বিতীয় প্রকার সাহায্যের জন্য উক্ত সোসাইটীতে দান করিয়া গিয়াছেন। চুণীলালের মৃত্যুতে কলিকাতার এই প্রসিদ্ধ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কিন্তু এস্থলে আমাদের ভুলিলে চলিবে না,—চুণীলাল ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন না, যে তাঁহাদের ও তাঁহার দানশৌণ্ডতা ও ত্যাগশীলতা তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। উক্ত মহাত্মগণের জীবনধারা ও চুণীলালের জীবনধারা এক নহে। আমাদের বুঝিতে হইবে, একজন দুঃস্থ গৃহস্থের সন্তান নিজ অধ্যবসায়বলে সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ কলিকাতার একজন পদস্থ মধ্যবিত্ত গৃহস্থে উন্নীত হইয়াছেন এবং ঐশ্বর্য্য-স্তূপে অধিষ্ঠিত না হইয়াও, তিনি তাঁহার সংসারকেও শ্রীমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন, সংসারের বাহিরে যে বৃহত্তর সংসার, তাহারও দুঃস্থতা-দূরীকরণকল্পে শ্রম ও অর্থসাহায্যের এতটুকু কার্পণ্য

করেন নাই। দানে জুগুপ্সা তাঁহার এত প্রবল ছিল যে, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, এমন কি, তাঁহার পত্নী পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান পাইতেন না। সেজন্য তাঁহার দানের সম্যক্ পরিচয় দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। মোটামুটী এইটুকু জানিতে পারা যায়, প্রকৃত অভাবগ্রস্ত আসিয়া তাঁহার দ্বার হইতে একদিনের জন্য প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। এমনও শুনা যায় এবং দেখাও গিয়াছে,—প্রকৃত দুঃস্থতা ও নিরাশ্রয়ত্ব অবগত হইয়া, তিনি বহু অভাবগ্রস্ত সংসারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এই প্রতিপালন অর্থে সাময়িক সাহায্য নহে,—সংসারের সমস্ত ভার বহন, ছেলে-মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা হইতে মেয়েদের বিবাহদান পর্য্যন্ত! একদিন চুণীলাল মেডিকেল কলেজ হইতে গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে একটী গলির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যাইতে যাইতে দেখেন, এক ভদ্রমহিলা তিনটী শিশুসন্তান লইয়া, রাস্তায় বসিয়া রোদন করিতেছেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য চুণীলালের কৌতূহল হয়। তিনি গাড়ী থামাইয়া মহিলাটীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! তুমি এখানে ব'সে কাঁদ্‌ছ কেন? তুমি আমার মেয়ের মতন,—বলো, তোমার কি হ'য়েছে।" মহিলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—বাড়ীওয়ালা তাঁহাদের তাড়াইয়া দিয়াছে। ছয় মাসের বাড়ী-ভাড়া বাকি, পরিশোধ করিবার কোনও উপায় নাই। স্বামী মাতাল,—চরিত্রহীন। কি এক অপরাধে তাহার আড়াই বৎসর জেল হইয়াছে। সুতরাং, শিশুগুলিকে লইয়া তাঁহার আর কোথাও দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই। চুণীলালের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ীওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নিজ হইতে বাকি বাড়ীভাড়া মিটাইয়া দিলেন ও আত্ম-

পরিচয় দিয়া, মহিলাটী যাহাতে স্বামী ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সেই বাটীতে থাকিতে পারেন, নিজের দায়িত্বে তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। তদবধি মহিলাটীর স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত, চুণীলাল মহিলাটীর বাড়ী-ভাড়া ও সংসারের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। স্বামী প্রত্যাবৃত্ত হইলেও, তাহার অসামর্থ্য জন্য, ২।৩ বৎসর সেই বাড়ীভাড়া বহন করিয়া যান। উক্ত অপদার্থ স্বামীর অত্যাচারে নাকি হতভাগিনী নারীর প্রাণবিয়োগ ঘটে। তৎপরে, চুণীলাল নিজবাটীতে ছেলে-মেয়ে কয়টীর আহারের ব্যবস্থা করেন। এই সময় চুণীলালের বাটীস্থ সকলে ব্যাপারটী জানিতে পারেন,—তৎপূর্ব্বে তিনি বাটীতে এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। চুণীলালের তত্ত্বাবধানে একটী কন্যার বিবাহও হয়। মহিলার কন্যা কয়টী সুপাত্রস্থ হইয়াছে,—পুত্রও মানুষ হইয়াছে। চুণীলালের গোপন-সাহায্য এই ভাবের ছিল। তিনি তাঁহার এক বিপন্ন বন্ধু-পরিবারকেও এইভাবে সাহায্য করেন। বন্ধুটী মুন্সেফী করিতে করিতে অল্প বয়সে মারা যান। চুণীলাল তাঁহার সংসারের ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পুত্রটীকে নিজ ব্যয়ে লেখাপড়া শিখাইয়া, মেডিকেল কলেজে চাকুরী করিয়া দেন। পূর্ব্বসম্বন্ধসূত্রে এখনও পর্য্যন্ত বহু দুঃস্থ পরিবার তাঁহার পুত্রদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া আসিতেছে।

চুণীলালের মাসিক চাঁদার হার আমরা যতদূর জানিতে সমর্থ হইয়াছি,—তাহা অন্যূন ১৫০৲ টাকা ছিল, এতদ্ভিন্ন সাময়িক দান ত ছিলই। এমন তথাকথিত বহু দাতার সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁহারা খবরের কাগজে বা সভাস্থলে আত্মপ্রতিষ্ঠা জাহির করিবার জন্য, চাঁদা বা দানের খাতায় বেশ উল্লেখযোগ্য অঙ্কপাত করিয়া নামসহি করেন, কিন্তু দিবার বেলায়

তাঁহাদের সে প্রতিশ্রুতি আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক প্রতিপন্ন হয়। আমরা চুণীলালের সহকর্ম্মী কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি,—তিনি যাহা দান করিতেন বা চাঁদা দিতেন, তাহা তাঁহার অবস্থানুযায়ী অসঙ্গত ছিল না এবং তাহা আদায়ের জন্য, তাঁহার বাটীতে গিয়া হাত পাতিবার অবসর হইত না। তাঁহার নিকট টাকা থাকিলে সভাস্থলেই তিনি অঙ্গীকৃত দান বা সাহায্য অর্পণ করিতেন ;—না থাকিলে তাগাদার পূর্ব্বেই তাহা পরিশোধ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বলা বাহুল্য, উক্ত দান বহু দানবীরের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও, চুণীলালের সমাবস্থ ব্যক্তির দানের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ছিল না এবং তাঁহার কর্ম্মপ্রাণতা, চরিত্রের সততা ও সেবাপর সত্যনিষ্ঠতাই তাঁহার দানকে মহিমান্বিত করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, শ্যামবাজার এংলো ভার্ণাকুলার স্কুলের সহিত চুণীলালের ছাত্রজীবন হইতে ঘনিষ্ঠতা বিজড়িত। বহুদিন হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, তিনি অত্র স্কুল-কমিটীর সভাপতি ছিলেন এবং বিদ্যালয়টীর উৎকর্ষসাধনকল্পে নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বের উইলে চুণীলাল এই বিদ্যালয়ে ৬০০৲ শত টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, সাময়িক সাহায্যও ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, চুণীলাল উক্ত উইলে ২০০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে রসায়নবিষয়ে, মেডিকেল কলেজের কোনও বিশিষ্ট ছাত্রকে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য, পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে, সুযোগ্য পুত্র ডাঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ, D. T. M. (Doctor of Tropical Medicine)

মেডিকেল ক্লাবে

দণ্ডায়মান—ডাঃ হরিধন দত্ত, ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্র, ডাঃ পূর্ণ নন্দী, ডাঃ বিপিন ঘোষ, ডাঃ চুনীলাল বসু, ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ রতন পাল, ডাঃ হীরালাল বসু, ডাঃ সত্যেন্দ্র সেন ; উপবিষ্ট—ডাঃ বলাই সেন, ডাঃ দেবেন্দ্র রায়, ডাঃ যোগেন্দ্র ঘোষ।

[১৯০ পৃঃ

পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রকে স্বর্ণপদক উপহার দিবার জন্য, School of Tropical Medicineএ ১৫৫০৲ শত টাকা অর্পণ করিয়াছেন। চুণীলাল উক্ত চিকিৎসাবিদ্যাবিষয়ে বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন।

কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের সহিত চুণীলালের সম্পর্ক, তাহার প্রতিষ্ঠা-দিন হইতে। ১৯০১ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি ইহার অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষতা করেন এবং ১৯১৮ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত সহকারী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। এই ক্লাবের লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে তাঁহার দান অমূল্য। বহুতর বহুমূল্য পুস্তক ও পত্রিকা তিনি ইহাতে দান করিয়াছেন এবং অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকালয়ের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বাঙ্গালীজাতির গৌরবকর ভৈষজ্য ও রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ও চুণীলালের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। এই প্রতিষ্ঠানের শৈশব হইতেই, তিনি ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি ইহার ডিরেক্‌টার শ্রেণীভুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী নয় বৎসর কাল তিনি ডিরেক্‌টার বোর্ডের চেয়ার-ম্যান ছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ অকাট্য যুক্তি ও উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা বহুক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের ঋদ্ধির পক্ষে পরমসহায়ক হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, এক সময় এই প্রতিষ্ঠান সমস্যাসঙ্কুল শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয় এবং তাহার পরিণামে ইহা মাড়োয়ারী ধনিকগণের কবলগত হইবার সম্ভাবনা সূচিত হয়। এত বড় একটা জিনিষ সহসাই বিলুপ্ত হইবে

এই আশঙ্কায়, বোর্ডের অনেকেই মাড়োয়ারীদের আশ্রয়গ্রহণ সমীচীন বলিয়া বোধ করেন। কেবল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও চুণীলালপ্রমুখ কতিপয় দেশপ্রাণ ব্যক্তি তাহাতে সম্মত হন নাই। এই সময় চুণীলাল পীড়িত ছিলেন এবং প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণের জন্য, প্রায়ই চুণীলালের গৃহে বেঙ্গল কেমিক্যালের সভা বসিত। এই সূত্রে চুণীলাল নাকি বলিয়াছিলেন,—"বাঙালীর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান, বাঙালীই তা রক্ষা ক'র্‌বে। যদি তার ধ্বংসই অনিবার্য্য হয়, তবে তা বাঙালীর হাতেই হবে,—অন্যের হাতে নয়। মাড়োয়ারীর হাতে যদি এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিও হয়, তাতে আমাদের লজ্জা বই গৌরব নেই। আমরা একে অপরের হাতে তুলে দিতে পার্‌বো না, বরং, শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্বো, যাতে একে ঠেলে তুল্‌তে পারি।" চুণীলালের এই উক্তি ব্যর্থ হয় নাই,—বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর হস্তেই থাকে এবং পরিচালনদক্ষতায় সে বিপদ-সঙ্কুল অবস্থা অতিক্রম করে। উক্ত পরিচালনার মূলে চুণীলালের প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তা যে মৃতসঞ্জীবনীর কার্য্য করিয়াছে, তাহা বলিলে বোধ হয়, সত্যের অপলাপ হয় না।

সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল চুণীলাল মহাত্মা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-পরিষদের (Indian Association for the Cultivation of Science) সহিত অতি নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি এগারো বৎসর ইহার সহকারী সভাপতিরূপে কার্য্য করেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহার বহু গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ শুধু তাঁহার স্বজাতীয় নহে, সমগ্র মানব জাতির উৎকর্ষজ্ঞাপক মঙ্গলবার্ত্তা বহন করিয়া প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। চুণীলালের "সাহিত্য-সেবা" শীর্ষক

বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান্ রূপে

দণ্ডায়মান—ডাঃ হরিষন দত্ত, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু।
উপবিষ্ট—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন রায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বসু।

[১৯২ পৃঃ]

পরিচ্ছেদে আমরা তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। বলিতে কি, আমাদের দেশের যে সকল বৈজ্ঞানিক মনীষীর প্রতিভায় ও প্রচেষ্টায় আজিকার এই জগন্মান্য প্রতিষ্ঠান দেশদেশান্তরের বিবুধমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে,—আমাদের চুণীলাল তাঁহাদের অন্যতম। চুণীলালের রাসায়নিক প্রতিভা-বিকাশের প্রধান ক্ষেত্রই ছিল, মেডিকেল কলেজ ও এই বিজ্ঞান-পরিষদ্। সুতরাং, এই সভার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব-সাধনের জন্য চুণীলাল যে তাঁহার সর্ব্ববিধ সাহায্য দান করিবেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। চুণীলালের তিরোধানে এই প্রতিষ্ঠানের এক-জন দিক্‌পালের অভাব ঘটিয়াছে।

Bengal Social Service League স্থাপনের দিন হইতে চুণীলাল ইহার সভ্য হন এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব দশ বৎসর তিনি ইহার সহকারী সভাপতিত্ব করেন। এই সমিতি-প্রবর্ত্তিত শিক্ষানৈতিক ও সামাজিক প্রচারকার্য্যে, চুণীলাল ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম্, ডি, মহাশয়ের পরমসহায়ক ছিলেন। "স্বাস্থ্য-পঞ্চক" নামক গ্রন্থের স্বত্ব চুণীলাল এই লীগের সাহায্যকল্পে দান করেন। এতদ্ভিন্ন, সাময়িক অর্থসাহায্যও করিতেন। এই লীগের কার্য্যে ছায়াচিত্র-সহযোগে নানাস্থানে তিনি বক্তৃতাদিও অনেক দিয়াছেন।

Indian Provincial Medical Services Association এরও চুণীলাল একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন এবং পর পর পাঁচ বৎসর কাল তিনি ইহার সভাপতিত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত, দরিদ্রভাণ্ডার, শ্রমজীবি-শিক্ষাপরিষদ্ প্রভৃতি আরও বহুতর লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত

চুণীলালের সংযোগ ছিল। "প্রতিষ্ঠার পথে" শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা তৎসমুদয়ের বিস্তারিত বিবৃতি দানে নিরস্ত হইলাম। সংক্ষেপতঃ, এই-টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কলিকাতার সামাজিক, স্বাস্থ্য বা শিক্ষা-নৈতিক কিংবা ধর্ম্মনৈতিক এমন কোনও প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহার সহিত চুণীলাল ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হন নাই এবং তৎসমুদয়ের সার্থকতা-সম্পাদনের জন্য, তাঁহার কায়, মন ও বাক্য নিয়োজিত হয় নাই। সাময়িকভাবে বা নিয়মিতভাবে সাধ্যানুরূপ অর্থসাহায্যও তিনি প্রতি প্রতিষ্ঠানে করিয়া গিয়াছেন। বহু স্বল্পপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানেও তাঁহার সহানুভূতি, সংযোগ ও অর্থসাহায্যও যথেষ্ট ছিল। জাতীয় মাঙ্গল্যের সংবাদ লইয়া ভিক্ষার্থী বা সাহায্যার্থী হইলে, কেহই তাঁহার নিকট হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না।

আবার তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র শুধু যে কলিকাতা সহরে বা তদুপকণ্ঠস্থ স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। বঙ্গের বাহিরে রাঁচি, বারাণসী, মতিহারী, বাঁকিপুর, লাহোর, পুনা, ডিব্রুগড় প্রভৃতি স্থলেও তাঁহার সেবাকার্য্য চলিত। যে কোনও দিক্ হইতে সেবাব্রতের আহ্বান আসিলে, তিনি তাহাতে সাড়া না দিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। যেমন অনেকের গান-বাজনার বা খেলার বা শিকারের বাতিক থাকে, জনসেবা বা লোক-শিক্ষাও যেন তাঁহার সেইরূপ বাতিকের মধ্যেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। যখন মেডিকেল কলেজে চাকরী করিতেন, তখন হইতেই জনসেবায় তাঁহার অবকাশের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। অবসরগ্রহণের পরবর্ত্তী

কয়েক বৎসর তাঁহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও কর্ম্মনিযুক্তি এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়,—বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের সহিত তিনি এত বেশী জড়িত হইয়া পড়েন যে, পেন্সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বিরাম বা কর্ম্মবিরতি কি, তাহা তিনি আস্বাদন করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মব্যস্ততা তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভপ্রদ না হইলেও, নেশার মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং তাহাতেই তাঁহার অবসর-বিনোদন বা চিত্ত-বিনোদন হইত।

রাঁচিতে ছিল চুণীলালের বিরাম-নিকেতন। ১৯০৪ সাল হইতে রাঁচির সহিত তাঁহার সংশ্রব সূচিত হয়। তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ রাঁচি-হাসপাতালের ডাক্তার। অবসর-বিনোদনের জন্য সেই সময় চুণীলাল মধ্যে মধ্যে রাঁচি-বাস করিতেন। জলবায়ু-মাহাত্ম্যে তথায় তাঁহার কর্ম্মক্লান্তি বিদূরিত হইত। পুনঃপুনঃ যাতায়াতের ফলে, তাঁহার অমায়িক চিত্ত ক্রমশঃ রাঁচি-প্রবাসী বাঙ্গালী বন্ধুগণের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে",—প্রবাদটীতে মন্দত্বের আরোপ থাকিলেও, উহাকে ভালর দিকেও ঘুরাইতে পারা যায়। কর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির নৈষ্কর্ম্ম্য ধাতুসহ নহে। চুণীলালের রাঁচি-গমনের পূর্ব্বে, তাঁহার ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথপ্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টায়, রাঁচিতে ক্ষুদ্রাকারে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ District Charitable Societyর অনুকরণে, একটী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। চুণীলাল যখন প্রথম রাঁচি যান, তখন প্রতিষ্ঠানটীর অণ্ডাবস্থা বলিলেই ঠিক হয়। চুণীলাল তখন কলিকাতার District Charitable Societyর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, রাঁচিতে সেই ভাবের প্রতিষ্ঠানের সূচনার সংবাদ পাইয়া,

তিনি পরমাগ্রহে তাহাতে যোগদান করেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার সহ-যোগিতার তাপ-স্পর্শেই প্রকৃত পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানটীর শাবকত্ব-প্রাপ্তি ঘটে—চুণীলালই Ranchi Charitable Societyর প্রতিষ্ঠাতা। বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটীর খুব উন্নত অবস্থা,—বহু দরিদ্র নরনারী ও ছাত্র ইহার সাহায্যে প্রতিপালিত হইতেছে। রাঁচিতে চুণীলাল যদি আর কোনও কাজ না করিতেন, তাহা হইলেও, মাত্র এই প্রতিষ্ঠানটীর জন্য তাঁহার স্মৃতি রাঁচিবাসীর অন্তরে চিরঅঙ্কিত থাকিত।

১৯১২ সালে চুণীলাল রাঁচিতে বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং তদবধি প্রায় প্রতি বৎসর দুই তিন বার রাঁচি গিয়া, দুই এক মাস অবস্থিতি করিতেন। সেজন্য রাঁচিস্থ প্রতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। Ranchi Central Co-operative Bank, ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়, রাঁচি বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, কাঁকের Indian Mental Hospital, Ranchi Municipality প্রভৃতি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সংক্ষেপতঃ, এই স্থানের সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য চুণীলাল তাঁহার যথেষ্ট উদ্যম ও অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

চুণীলালের লোক-সেবা-সম্পর্কে আমরা আর বেশী কিছু বলিব না। স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ,—দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা; চুণীলাল সে অবদানবাণীঅনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। দেশের ও দশের সেবা করিতে তিনি কখনও রাজনীতির সংস্পর্শে যান নাই। নিরুপদ্রব কর্ম্মপন্থার অনুসরণ করিয়া, তিনি তাঁহার নিরীহ ও নির্ম্মল জীবন অতিবাহন করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে, রাজদ্বারে তাঁহার

প্রতিভার সম্মান যেমন একটী দিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই,—জনসমাজের দ্বারদেশেও তিনি সেইরূপ পরমাত্মীয়ের আপ্যায়নে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। আমাদের দেশে এইভাবের শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক, যোগক্ষেমের যথার্থ সন্ধানী একনিষ্ঠ কর্ম্মীর দৃষ্টান্ত অতিবিরল।

চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন

চুণীলালের জীবন-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ লোক ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা যে একেবারেই অনন্যসাধারণ ছিল, তাহা আমরা বলিব না, বরং বলিব, তাঁহার ন্যায় প্রতিভা লইয়া হয়ত অনেকেই জন্মগ্রহণ করিতে পারেন ;—কিন্তু সেই প্রতিভার সদ্ব্যবহার,—তাহার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, খুব কম লোকের সাধ্যে কুলাইয়া থাকে। শুধু ইস্পাৎ থাকিলেই যে ছুরিতে ধার হয়, তাহা নহে, শানাইয়া সূক্ষ্মাগ্র করিতে পারিলে, তবে তাহাতে সার্থকতা আসে। এমন ভাগ্যবান্ বা সুকৃতিশালী ব্যক্তি অনেকেই আছেন, যাঁহাদের প্রতিভা স্বভাবতঃ শাণিত,—প্রতিভার স্ফূর্ত্তির জন্য তাঁহাদিগকে খুব কম চেষ্টা করিতে হয়। শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তার ন্যায় তাঁহাদের বিকাশ। কিন্তু আমাদের চুণীলাল সত্যসত্যই 'লাল-চুণী',—বহু কাটিয়া মাজিয়া ঘষিয়া তবে তাহার আত্মপ্রকাশ হইয়াছে। তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা এইটুকু সংগ্রহ করিয়া আশান্বিত হইতে পারি যে, অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী না হইলেও, মানুষ নিজের চেষ্টায়, শত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, প্রতিষ্ঠার দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হয়।

"মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ" ইহা সত্য হইলেও, অসুবিধা এইটুকু যে, মহামানবের গতি-বেগ এত দ্রুত যে, সাধারণ মানুষ তাঁহার নাগাল

পায় না। জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় মহামানব যেখানে কষিত কাঞ্চন-কান্তি ধারণ করেন, সাধারণ মানুষ সেখানে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। তথাপি, মহামানবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি না থাকিলে, যখন সে অনুসৃতি দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, তখন তদপেক্ষা স্বল্প-সুকৃতি পাথেয় করিয়া, যাঁহারা এ জগতে আসিয়াছেন এবং আত্মপ্রচেষ্টা ও শক্তিবলে মহামানবের চরণ-চিহ্ন ধরিয়া, জীবনকে সার্থক করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনুগমনে, সাধারণের জীবনে সাফল্য-আনয়ন অনেকটা সুলভ নহে কি? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়। কিন্তু সকলে ত তাহাতে সফলকাম হইতে পারে না, হইবার কথাও নয়। অনেকের নিকট ইহা অসাধ্য সাধন, ব্যর্থ চেষ্টা। তথাপি, তাহাতে ব্রতী হইয়া, পর্ব্বতে মাথা ঠুকিয়া চূর্ণ হইবার নির্ব্বুদ্ধিতা না থাকাই সমীচীন। তাহা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নহে, দুরাকাঙ্ক্ষা। তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবার জন্য মানবের সৃষ্টি হয় নাই,—আত্মোৎ-কর্ষই তাহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং, তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সামর্থ্যের অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, সুষ্ঠুপথে পরিচালনা করিতে, এমন আদর্শস্থানীয় ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি সাধারণেরই একজন,—কিন্তু আত্ম-পৌরুষে অমিত শক্তির আধার। চুণীলাল সেই আদর্শপদবাচ্য ব্যক্তি ছিলেন।

চুণীলাল ধনীর সন্তান ছিলেন না, দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে জয়ী হইতে হইয়াছে। সুতরাং, দৈব অপেক্ষা পৌরুষের বলে বহুক্ষেত্রে তাঁহার কৃতকার্য্যতা। এই ভাবের ব্যক্তিরা সাধারণতঃ শুধু

আপনাকে বাঁচাইয়া চলেন না, অপরকে বাঁচাইবার চেষ্টা তাঁহাদের খুব বেশী। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, শৈশবে চুণীলাল তাঁহাদের অপেক্ষা গরীব সংসারকে আশ্রয় দিতে ও সাধ্যমত সাহায্য করিতে, মাতার নিকট শুধু আবদার নয়, জুলুম করিতেছেন এবং সফলকাম হইয়া আনন্দলাভ করিতেছেন। পঠদ্দশায় তিনি তাঁহার বহু সতীর্থের সাহায্যকারী। আহার্য্যের অংশ দিয়া, পাঠ্যপুস্তক দিয়া, তাঁহার উচ্চশিক্ষার জন্য লব্ধ পাথেয়স্বরূপ বৃত্তি পর্য্যন্ত বণ্টন করিয়া, দুঃস্থ ছাত্রের সহায় হইতেছেন। উত্তরকালে—তাঁহার জীবনের গৌরবময় যুগে এই হিতৈষণা-বৃত্তির কতদুর বিকাশ ঘটিয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা তাহার বিবৃতি দিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু পুরুষকারের বিশেষত্ব এইটুকু,—ইহা মানুষকে খুব বেশী আত্মপ্রত্যয়ী করিয়া তুলে। একটী অতি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে আমরা তাহার প্রমাণ পাইতে পারি,—যে নিজে রাঁধিয়া খায়, সে অপরের রান্না পছন্দ করে না। চুণীলালের আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট ছিল—এবং ছিল বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহের প্রতিবন্ধকতার উত্তরে তিনি সগর্ব্বে বলিতে পারিয়াছিলেন,—"চুণী বোস্ এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় না,—যখন দাঁড়ায়, দু'পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়ায়।" এই আত্মবিশ্বাসের বলে, তিনি কলিকাতার যে কোনও প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশলাভ করিয়াছেন এবং আত্মনিয়োগ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন,—প্রতিষ্ঠানকেও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। পরনির্ভরতা তাঁহার ধাতুসহ ছিল না,—দায়িত্বকে তিনি বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেন। শুধু বাহিরের নয়, ঘরের দায়িত্বও নিজস্কন্ধে বহন করিতে তিনি একটুও পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

তাঁহার জাজ্জ্বল্যমান্ সংসারে ঘরের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত লোকের অসদ্ভাব ছিল না। তাহা হইলেও, তিনি বুঝিতেন, তাঁহার নিজের সংসার, নিজেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে। স্বোপার্জ্জিত অর্থে তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব করিয়াছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বোপার্জ্জিত অর্থে সংসার চালাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংসারে অশান্তি ছিল না, বিশৃঙ্খলা ছিল না, অমিতব্যয়িতার লেশমাত্র ছিল না। সামাজিকতা, লৌকিকতা প্রভৃতিও তাঁহার তত্ত্বাবধানে কখনও উপেক্ষিত হইত না। সংক্ষেপতঃ, গার্হস্থ্যধর্ম্মকে তিনি অবশ্যপালনীয় বলিয়া জানিতেন এবং তাহা পূর্ণভাবে পরিপালনের জন্য সর্ব্বদিকে তাঁহার সতর্কদৃষ্টি নিত্য-নিবদ্ধ রাখিতেন।

পুরুষকারের উপাসক ব্যক্তিরা প্রায়ই বড় একগুঁয়ে হইয়া থাকেন এই একগুঁয়েমি ঠিক হঠকারিতা বা ঔদ্ধত্য নহে, ইহা আত্মবিশ্বাস-জনিত তেজস্বিতা বলিতে পারা যায়। তথাপি, একগুঁয়েমি স্থলবিশেষে প্রশংসনীয় হইলেও, কোনও কোনও স্থলে দুঃখের হেতু হয়। মানব ভ্রান্ত জীব,—ভুলচুক্ মানুষের হইয়াই থাকে। একটু অনমনস্কতায়, একটু অবিমৃষ্যকারিতায় মানুষ বহু অনর্থপাত করে। দূরদৃষ্টির শক্তি সকলের সকল সময় সমভাবে প্রখর থাকে না। বিশেষতঃ, জিদ্ ধরিলে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মহারা হইয়া পড়ে। সুতরাং, একগুঁয়েমির পরিণাম সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা শুভপ্রদ নহে। চুণীলাল শৈশব হইতে একগুঁয়ে ছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বেশ বেগ পাইতেও হইয়াছে। তাহা হইলেও, একগুঁয়েমি না থাকিলে মানুষ বড় হইতে পারে না,—ইহা প্রতিষ্ঠালাভের অস্ত্রবিশেষ। অস্ত্র যেমন আত্মরক্ষার

সহায়ক, তেমনই আত্মহত্যার সহায়কও ঘটে। তবু অস্ত্র চাই,—অস্ত্র নহিলে চলে না। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিমাত্রই অল্প-বিস্তর একগুঁয়ে। সুতরাং একগুঁয়েমির জন্য দুঃখকে বরণ করিয়াই, তাঁহাদিগকে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

চুণীলালের অমায়িকতা লোকপ্রসিদ্ধ ছিল। যিনি একবার তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন বা তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনি আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই,—চুণীলালও তাঁহাকে আর বিস্মৃত হইতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে বড় 'রাশভারী' লোক ছিলেন। কিন্তু একটু ভরসা করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলে, তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য প্রকটিত হইত। ফলতঃ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের মধ্যে যে গাম্ভীর্য্য স্বাভাবিক, তাঁহার মধ্যে তাহাই বর্ত্তমান ছিল বলিয়া আপাত-দৃষ্টিতে তাঁহাকে অতিমাত্রায় গম্ভীর-প্রকৃতি বলিয়া প্রতীয়মান হইত। নচেৎ, অনাথ-আশ্রম, অন্ধবিদ্যালয়, পতিতাশ্রম, জেলা দাতব্য সমিতির ছাত্র বা অনুগৃহীতগণের প্রতি যাঁহার করুণার উৎস স্বতঃই উৎসারিত হইত, যিনি তাহাদের নিকট পিতৃস্থানীয় বলিয়া পূজিত হইতেন,—তাঁহার নিকট হইতে রুক্ষ ব্যবহার স্বপ্নাতীত ছিল নাকি ?

শীলতা, শিষ্টাচার বা শালীনতাও চুণীলালের স্বভাবসিদ্ধ ছিল, কিন্তু কোনও সময় তাহা অতিরঞ্জনদোষে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করে নাই। সে হিসাবে যাহার যেটুকু আদর বা সম্মান প্রাপ্য, তাহা তিনি কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিতেন। তোষামোদ-প্রিয়তা তাঁহার ধাতুসহ ছিল না বা তিনিও কাহারও চাটুবাদে অভ্যস্ত ছিলেন না। অনেকের ধারণা থাকিতে পারে, গভর্ণমেণ্ট্‌কে তোষামোদের ফলে, চুণীলাল বহু

উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তিনি একটী দিনের জন্যও রাজদত্ত সম্মানের প্রত্যাশী হন নাই,—তাঁহার কৃতিত্বই তাঁহাকে রাজদত্ত সম্মানে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

রাজনৈতিক ব্যাপারে চুণীলাল মধ্যপন্থী ছিলেন। তবে তিনি কোনও প্রকার রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সর্ব্বাগ্রে নিজেদের শক্তিশালী হইতে হইবে। ইংরাজের বা ইংরাজরাজের বিরোধিতা করিয়া শক্তিসঞ্চয় হয় না,—তাহাতে স্বরাজলাভ সুদূরপরাহত হয়। পাশ্চাত্য যে নীতিবলে জড়জগতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের পদ-প্রান্তে বসিয়া, আমাদের তাহা অধিগত করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, তাহারা অধ্যাত্মজগতের সন্ধান খুব কমই রাখে এবং ভারত বহু শতাব্দী ধরিয়া, তথায় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন্ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং, ভারতের নিকট পাশ্চাত্যের শিক্ষিতব্য বিষয়ও যথেষ্ট আছে। যদি আমরা যোগ্যতার সহিত এই আদান-প্রদান-ক্রিয়া চালাইতে পারি, তাহা হইলে, তাহার ফলে, পরস্পরের মধ্যে যে মিলন সংঘটিত হইবে, তাহাই ভারতকে অতি গৌরবের স্বাধীনতা আনিয়া দিবে। শত্রুতায় ভারত স্বাধীন হইবে না,—হইবে মৈত্রীতে। তিনি বলিতেন, গভর্ণমেণ্টের ত্রুটীর প্রতিবাদ করিতে হইবে ততক্ষণ,—যতক্ষণ গভর্ণমেণ্টের বিরক্তি আমাদের ক্ষতির কারণ না হয়। তিনি সবল ও দুর্ব্বলের পার্থক্যের অনুপাতে, প্রায়ই কাংস্যপাত্র ও মৃণ্ময় পাত্রের তুলনা দিতেন।

তাই বলিয়া তিনি যে তেজস্বী ছিলেন না, ইহা বুঝিলে তাঁহাকে

ভুল বুঝা হইবে। তিনি বুঝিতেন, তেজ সেখানেই শোভন, যেখানে ব্যর্থতা না আনে। কিন্তু তিনি যাহা ন্যায়সঙ্গত বুঝিতেন, তাহা অকপটে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সিনেটে স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল, তাঁহার মতের সহিত খাপ্ না খাইলে, তিনি স্যার আশুতোষের কার্য্যেরও প্রতিবাদ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। এমন কি, তিনি তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীর বাক্যেরও প্রতিবাদ করিতেন। * কোনও কার্য্যে সহসা মতদানের স্বভাব তাঁহার ছিল না এবং যে মত প্রকাশ করিতেন, তাহা এত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত যে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করা কঠিন হইত। তবে সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিলে, তিনি তাঁহার মত প্রত্যাহারও করিতেন। সে সময় তিনি তাঁহার জিদ্‌কে অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, বিরক্তি ক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

অজাতশত্রু হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বড়ই বলবতী ছিল এবং সত্যের পথ ধরিয়াই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদে একদিনও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই,—অতি শান্ত ধীর ভাবে যুক্তির সাহায্যে তিনি অসঙ্গতিকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

---

* এক সময় Medical Regulations লইয়া সিনেটে মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডাঃ লিউকিসের সহিত চুনীলালের মতদ্বৈধ ঘটে। চুনীলালের প্রতিবাদপূর্ণ মন্তব্যে ডাঃ লিউকিস্ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন। তাঁহার কলেজের একজন অধ্যাপক তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন, ইহাই তাঁহার ক্ষোভের হেতু। যাহা হউক, পরিশেষে তিনি চুনীলালের উক্তির যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পারেন এবং এমন কি, চুনীলালের পদোন্নতি-বিষয়ে বিশেষরূপে সহায়তা করেন।

চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন

চুণীলালের দয়া ও পরোপচিকীর্ষার কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মেডিকেল কলেজে চাকরী গ্রহণের পর হইতে তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। কিন্তু চিকিৎসা-কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। পাড়া-প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধব কেহ পীড়িত হইলে, কর্ণগোচরমাত্র শত কার্য্য ফেলিয়া, তিনি রোগী দেখিতে ছুটিতেন এবং পরীক্ষান্তে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া ফিরিতেন। কত দুঃস্থ রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া, ঔষধপথ্যাদি লাভ করিয়া, বিনা-অর্থব্যয়ে জীবন পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যবসায় না করিলেও, তিনি বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন।

গোপন-সাহায্য চুণীলালের বৈশিষ্ট্য ছিল। এ বিষয়ে তিনি যীশু খৃষ্টের নীতি অনুসরণ করিতেন। অর্থ দিয়া, আহার্য্য দিয়া, তিনি অনেককে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন, বাটীস্থ কেহ সে দানের বিন্দুবিসর্গ জানিত না। তাঁহার মৃত্যুর পর, উপকৃতের মুখ হইতে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক,—প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদের মধ্যে সেইরূপ চরিত্র-দোষ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ প্রতিভা ও প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং জীবনের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া, তাহাদের অনুশীলন চলিতে থাকে। আমাদের বোধ হয়, যাঁহাদের প্রতিভা দুর্নিবার, তাঁহাদের প্রবৃত্তিও দুর্নিবার। অবশ্য, মানুষের সদসৎ দুই প্রবৃত্তিই মনের কোণে অবস্থিতি করে। আমরা এ স্থলে কু-প্রবৃত্তির কথাই বলিতেছি। জন্মগত সংস্কারবশেই হউক বা সংসর্গদোষেই হউক, প্রতিভাবান্ ব্যক্তি কু-প্রবৃত্তির কবলে পড়িলে, অধিকাংশ

ক্ষেত্রে তাঁহার আর উদ্ধারের উপায় থাকে না। যেহেতু, উর্ব্বর ভূমিতে উত্তম বৃক্ষের যেমন আশু বৃদ্ধি ঘটে, আগাছারও তেমনই অথবা তদপেক্ষা দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ক্বচিৎ কোনও কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আত্মসংযমের বলে প্রবৃত্তির প্রলোভন হইতে নিস্তার পান। নিষ্কলঙ্ক প্রতিভাশালীর সংখ্যা এত কম যে, সমাজকে সেই চরিত্র-দোষ-দুষ্ট প্রতিভাকে মানিয়া লইতে হয়। যে গরু দুধ দেয়, তাহার 'চাট্' সহ্য করিতে হয়, ইহাই তাহার যুক্তি। কেহ কেহ বলেন, "অমুক মস্ত বড় চিকিৎসক বা ব্যবহারাজীব, মাতাল বটে, কিন্তু ঐ মদই তাঁকে বড় ক'রেছে,—মদ না খেলে অমনটী হ'ত না।" কেহ কেহ বলেন,—"অমুক বড় সাহিত্যিক বা শিল্পী,—চরিত্রহীন বটে, কিন্তু ঐ চরিত্র-দুষ্টিই তাঁকে অভিজ্ঞতার স্বর্ণমুষ্টি উপহার দিয়েছে।" "শঙ্করাচার্য্যকে পর্য্যন্ত জগতে আসিয়া কাম-কলা শিক্ষা করিতে হইয়াছে,—পদস্খলন মনুষ্য-ধর্ম্ম, তবে প্রতিভার বরপুত্রের পদস্খলন শুভ্র-বস্ত্রে মসীবিন্দুর ন্যায় সুস্পষ্ট, এই পর্য্যন্ত"—ইত্যাদি যুক্তিও কেহ কেহ দিয়া থাকেন। আমরা ইহা লইয়া বাদানুবাদ করিতে চাহি না, তবে এইটুকু বলি,—চরিত্রকে অক্ষুন্ন রাখিয়া যিনি যত বড় হইতে পারিয়াছেন, তিনি তত সম্পূর্ণ।

চুণীলাল শুধু চরিত্রবান্ ছিলেন না, তিনি ছিলেন চরিত্রবাদী। বাল্যে তিনি পিতামাতার সতর্কদৃষ্টিতলে বর্দ্ধিত হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রায়ই বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না,—পাছে, অসৎ সংসর্গে মিশিয়া ছেলে তাঁহাদের খারাপ হইয়া যায়। সদালাপ, সদালোচনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি কর্ত্তব্যজ্ঞান চুণীলালের পিতা-

মাতাই চুণীলালের হৃদয়ে দৃঢ়সংস্কারের ন্যায় বদ্ধমূল করিয়া দেন। কৈশোরে চুণীলাল ব্রাহ্ম সমাজের সংশ্রবে আসেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথপ্রমুখ চরিত্রবান্ সমাজনেতৃগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। যৌবনে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ তাঁহার চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে। চুণীলাল নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন,—আদর্শব্রাহ্মণ স্যার গুরুদাস ছিলেন তাঁহার গুরু। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, গুরুদাস চুণীলালের শিক্ষাগুরু ছিলেন,—নৈতিক জীবনের শিক্ষাগুরু। এতগুলি মহদাদর্শের সলিলনিষেকে যে জীবনতরু মঞ্জরিত হয়, তাহাতে যে সচ্চরিত্রতার পুষ্পের ফুলই ফুটিবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। চুণীলাল কখনই 'স্ফূর্ত্তিবাজ' লোক ছিলেন না,—আমোদ বা উৎসবে তিনি যোগদান করিতেন, অতি সংযত চিত্তে। অমায়িকতা, প্রীতি-প্রফুল্লতা বা সৌহার্দ্দ্য তাঁহার মধ্যে প্রচুর ছিল, কিন্তু যাহাতে নৈতিক জীবন ক্ষুণ্ণ হয়, এমন সংসর্গ তিনি বিষবৎ পরিহার করিতেন। এ জন্য তাঁহাকে কখনও কখনও 'বেরসিক' বা 'নিরামিষাশী' ইত্যাদি অভিধানে উপহসিত হইতে হইয়াছে। ফলতঃ, তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গের রসজ্ঞ ও রসগ্রাহী,—সে জন্য দাশরথি রায় হইতে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতি পর্য্যন্ত প্রকৃত রসস্রষ্টার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না।* বিশেষতঃ, অমৃতলালকে তিনি

---

* চুণীলাল সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী হাস্যরসিক মলেয়ারের (Moliere) প্রহসনগুলির বাঙ্গালা-ভাষায় নাট্যরূপ দিবার চেষ্টা করেন। কিয়দংশ অনুবাদও করিয়াছিলেন, কিন্তু অবসরাভাবে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

ছাত্রজীবনে শিক্ষকরূপে এবং জনহিতকর কর্ম্মজীবনে পরম-বাঞ্ছিত সহায়করূপে পাইয়া গরিমা বোধ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন সংস্কারবর্জ্জিত আদর্শ হিন্দু,—গোঁড়ামি বা ভণ্ডামি তাঁহার মধ্যে স্থান পায় নাই। আর ছিলেন,—অতি বিশ্বস্ত স্বামী; স্ত্রৈণ নহেন,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রেমিক স্বামী। চরিত্রকে তিনি 'লক্ষ্মীর কড়ির' ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, খেয়াল বা প্রবৃত্তির উত্তেজনায় একটী দিনের জন্যও তাহাকে ক্রীড়নকে পরিণত করেন নাই। গার্হস্থ্যাশ্রমকে তিনি তীর্থক্ষেত্র জ্ঞান করিতেন,—সুতরাং, তাহার শুচিতার প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কলহ-কচ্‌কচি, মিথ্যাবাদ বা কটুভাষণ যাহাতে অন্তঃপুরের আকাশকে বিষাক্ত না করে, পূর্ব্ব হইতেই তিনি তৎসমুদয়ের প্রতিষেধের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে কেহ কাহারও নাম বিকৃত করিয়া ডাকিতে পারিত না, 'তুই' সম্বোধন তাঁহার গৃহ হইতে এক-প্রকার নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বাটীর প্রতি প্রকোষ্ঠ যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মার্জ্জিত-রুচি-অনুযায়ী সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন, বাটীস্থ প্রতি ব্যক্তির চিত্ত-প্রকোষ্ঠও সেইরূপ নির্ম্মল শুচিস্মিত দেখিতে ভালবাসিতেন।

চুণীলাল যে কর্ত্তব্যপরায়ণ ভক্তিমান্ পুত্র, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি;—তাঁহার মাতৃভক্তি যে তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও স্যার গুরুদাসের পাদমূলে বসাইয়াছে,—তাহার দৃষ্টান্তও দিয়াছি। আজি-কালিকার যুগে একান্নবর্ত্তী পরিবার একান্ত বিরল। উত্তরকালে চুণীলাল ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী ছিলেন না। স্থান-সংকীর্ণতা ও অবস্থার সাচ্ছল্য এই ভিন্নান্নবর্ত্তিতার একমাত্র হেতু,—ভ্রাতৃবিরোধ বা যাতৃকলহ

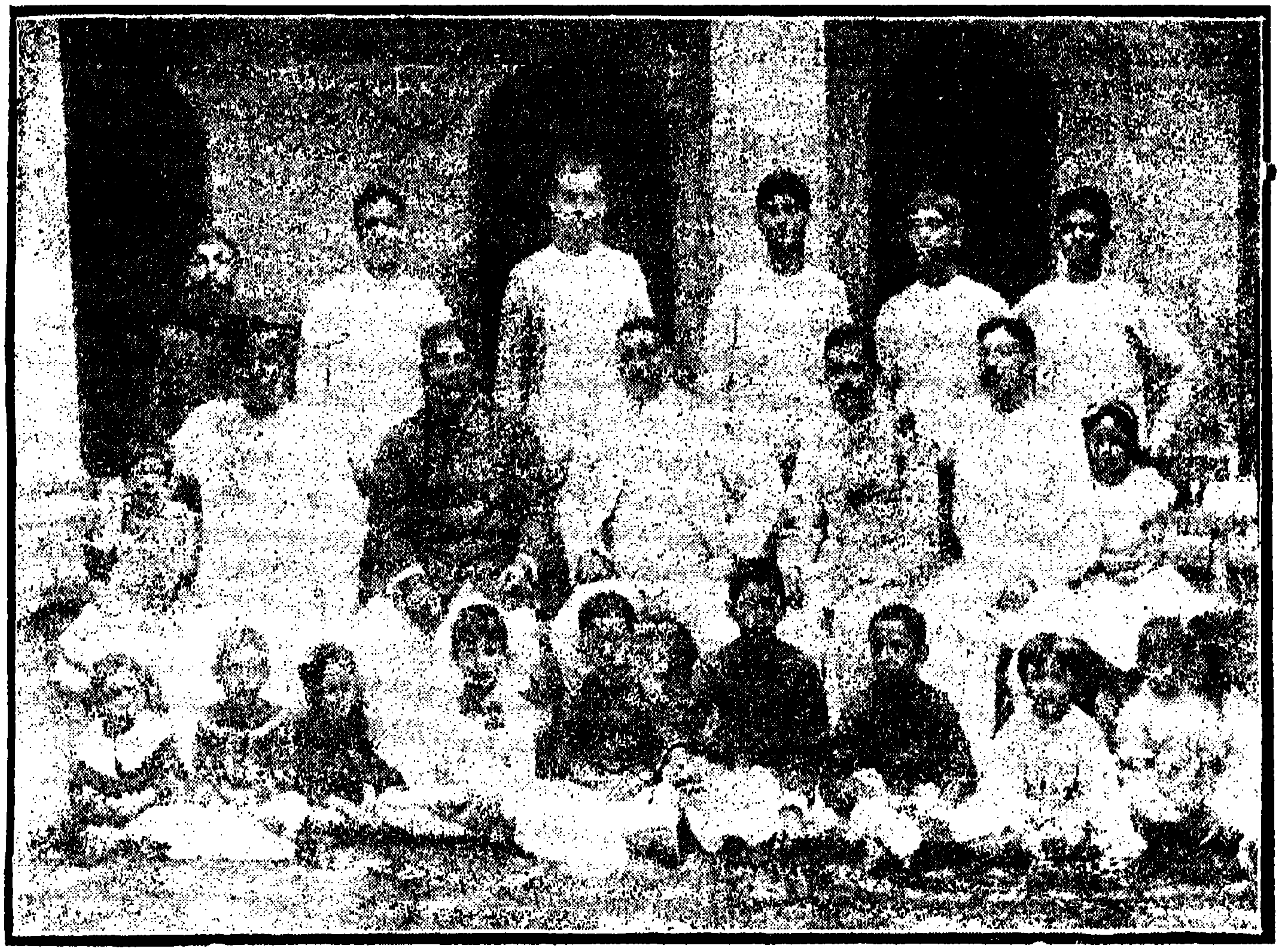

পঞ্চভ্রাতা

দণ্ডায়মান—রমেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, অনিলপ্রকাশ, রামচন্দ্র, জ্যোতিপ্রকাশ, সুধীরকুমার ;
উপবিষ্ট—অমৃতলাল, চুণীলাল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ,
বালক-বালিকাবৃন্দ।

[২০৮ পৃঃ]

তাহার কারণ নহে। পাঁচটী ভাই সত্য সত্যই যেন পঞ্চ পাণ্ডবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। দারুণ একগুঁয়ে হইলেও চুণীলাল জ্যেষ্ঠ অমৃতলালের অসম্মান বা অসম্মতিকে বড় ভয় করিতেন এবং যতক্ষণ তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া নিজ মতে না আনিতে পারিতেন, ততক্ষণ কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। অগ্রজও অনুজের শক্তিতে এত বিশ্বাসবান্ ছিলেন যে, তাহার যে কোনও কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। চুণীলালের অনুজগণও চুণীলালকে আদর্শ ভ্রাতৃজ্ঞানে পূজা করিতেন। ইত্যাদি কারণে তাঁহাদের ভাগবাঁটোয়ারা পরস্পরের আপোষ-নিষ্পত্তিতে সুচারুরূপে সমাহিত হইয়াছে এবং ভিন্নান্নবর্ত্তিতা তাঁহাদের অভিন্নহৃদয়ত্বকে আঘাত না করিয়া নিবিড়তর করিয়াছে।

সুতরাং, যিনি আজীবন অপাপবিদ্ধ চরিত্রের সঙ্গগ্রহণ ও সেবার্চ্চন করিয়া গিয়াছেন, চরিত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ যাঁহার পক্ষে একান্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া বোধ হয় নাই এবং যিনি গার্হস্থ্যনীতিকে ধর্ম্মনীতি-জ্ঞানে একনিষ্ঠভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে চরিত্রবাদী হইবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? "Do what I say, don't do what I do" এই ভাবের অবদান-বাণী প্রচার করিবার দুর্ভাগ্য চুণীলালকে একটী দিনের জন্য ভুগিতে হয় নাই। এমন সভাসমিতি খুব কমই ছিল, যাহাতে তিনি যোগদান করিতেন না। সভায় উপস্থিত হইয়া, নির্ব্বাক্ চলিয়া আসাও তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সভায় গেলে কিছু বলিতেই হইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। যেমন সুগায়ক বা সুবাদক ভাল সঙ্গীতের মজ্‌লিসে আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না, সেইরূপ সভায় বক্তৃতাদান তাঁহার নিকট অনিবার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

এই বক্তৃতাদানও তাঁহার সাধনালব্ধ ছিল। বক্তৃতার অভ্যাস করিবার জন্য তিনি বাটীতে তর্কসভার (Debating Club) প্রবর্ত্তন করেন। তাহাতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা উভয়বিধ ভাষায় নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, ভৈষজ্য প্রভৃতি বহু বিষয়ের বাদানুবাদ চলিত। বক্তৃতাশক্তির উৎকর্ষ-সাধনজন্য নিজ কক্ষে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া, দর্পণের সম্মুখে তিনি এক সময় বক্তৃতার মহলা পর্য্যন্ত দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যা জাহির করিবার জন্য তাঁহার বক্তৃতার অনুশীলন নহে। জ্ঞানানুসন্ধিৎসা যেমন তাঁহার বলবতী ছিল, সমাজের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান বিতরণের এষণাও তাঁহার সেইরূপ বলবতী ছিল। সেইজন্য তাঁহার বক্তৃতা ছিল সরল, স্বচ্ছ, আড়ম্বরহীন অথচ সারগর্ভ,—প্রাণস্পর্শী। নিজের জ্ঞানের দিক্ দিয়া, নিজের স্বাস্থ্য ও মনের দিক্ দিয়া, নিজের ধারণা ও বিশ্বাসের দিক্ দিয়া এবং তাঁহার নৈতিক জীবনের দিক্ দিয়া, যাহা তিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার অভ্যস্ত বাগ্মিতায় তাহা যেন স্বভাব-নিঃসৃত নির্ঝরের ন্যায়ই ঝরিয়া পড়িত। ইংরাজি বা বাঙ্গালা কিছুই তাঁহার আট্‌কাইত না। "Habit is second nature"—তিনি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধীত বিদ্যার ভাণ্ডার এত বিপুল ছিল যে, ধর্ম্ম, সমাজ, জাতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি যে কোনও বিষয়ে তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং তাহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। একজন রসায়নশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত যে নিজ অবশ্যঅধীতব্য বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বহু বিষয়ে এত কৃতবিদ্য হইতে পারেন, একমাত্র আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ব্যতীত চুণীলালের তুল্য ব্যক্তি আমাদের দেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

চুণীলালের চরিত্রবাদ কিন্তু শুধু Bibleএর Sermon বা গীতা-উপনিষদের বুকনিতে পর্য্যবসিত ছিল না। তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর, কর্ম্মনিযুক্তিই ছিল তাঁহার চারিত্রনীতি। চরিত্রের শক্তিকে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, এজন্য কর্ম্মের মধ্য দিয়া, নানাবিষয়িনী সচ্চিন্তার মধ্য দিয়া, যাহাতে মানুষের জীবনস্রোত অনন্তের পানে ধাবিত হয়, তাহারই উপায় উদ্ভাবন ও তাহারই বাণীপ্রচার তাঁহার চরিত্রবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিলে মানুষ খারাপ হইয়া যায়, দেহের স্বাস্থ্য তথা মনের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হইলে মানুষের কর্ম্মব্যস্ততা আসে এবং সেই কর্ম্মব্যস্ততা সুনিয়ন্ত্রিত হইলে মানুষের নৈতিকজীবন তথা মনুষ্যজীবন সফল হয়, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন এবং কথায় ও কার্য্যে তাহা প্রকাশ করিতেন।

এইস্থলে চুণীলালের "শারীর স্বাস্থ্য-বিধান" হইতে তাঁহার কর্ম্মসম্বন্ধে মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কর্ম্ম করিবার জন্যই মানুষের জন্ম, কর্ম্ম করা ব্যতীত আমাদের অন্য উপায় আর নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

কর্ম্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়,
স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়।

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"সকল দেশের সকল ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র দ্বারা এই মত বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছে। তবে অবস্থাভেদে মানুষের কর্ম্মের প্রভেদ হইয়া

থাকে। সাধারণ মানুষে কাজ না করিলে তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে না, সুতরাং, কর্ম্ম তাহার জীবনের সহায়স্বরূপ। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করার জন্য যাহাদের কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা হয় না, কোন না কোনরূপ কর্ম্ম না করিলে তাহাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। মানুষকে কাজ করিতে দেখিয়া মানুষের অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি কিরূপে জন্মিতে পারে, তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যে মানুষের কণামাত্র আত্মসম্মান ও দায়িত্বজ্ঞান আছে, সে কখনই অলস জীবন যাপন করিতে স্বীকৃত হয় না। কর্ম্ম যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পন্ন করিতে না হয়, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। অবশ্য ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কর্ম্ম অনেক স্থলেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হইয়া থাকে। কর্ম্ম অপেক্ষা সুশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। কর্ম্মই মানুষকে শত শত বিভিন্ন প্রকৃতির মানব ও বিবিধ অবস্থার সংঘর্ষে আনয়ন করে। সুতরাং, কর্ম্ম দ্বারাই তাহার অভিজ্ঞতার প্রসার ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। মহাপুরুষেরা জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারাই জগতের ইতিহাসে অবিনশ্বর কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আজ পৃথিবীতে যাহা কিছু মনস্বিতার, যাহা কিছু জ্ঞানের, যাহা কিছু উন্নতির, যাহা কিছু উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে মানবের অবিরাম শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

"স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান কর্ম্মভূমি আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম সামগ্রীটীও

জীবনব্যাপী পরিশ্রম ব্যতীত উৎপন্ন হয় নাই। একজন ধর্ম্মযাজক রহস্যচ্ছলে বলিয়া গিয়াছেন—'পরিশ্রম করা অপেক্ষা পরিশ্রম না করাই অধিক পরিশ্রমসাপেক্ষ।' বাস্তবিক অলস ব্যক্তির জীবনের ভার অনেক সময়েই নিতান্ত দুর্ব্বহ বলিয়া তাহার মনে হয়। ধন, জন, যশ, সম্পদ, সুখ, স্বচ্ছন্দতা সকলগুলিই পরিশ্রমশীল ব্যক্তির করতলগত থাকে। উদ্‌যোগী পুরুষসিংহই লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন।

"যৌবনকালে আলস্যের ন্যায় অধঃপতনের সরল পথ আর দ্বিতীয় নাই। এই সময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকিলে, মানুষের চরিত্র ও মহত্ত্ব উভয়ই চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। একজন ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া গিয়াছেন যে, আলস্যই মানুষের জীবন্ত সমাধি; সে যখন জীবিত থাকিয়া,—না মানুষের, না ঈশ্বরের—কাহারও কার্য্যে লাগে না, তখন মৃত বা জীবিত অবস্থা তাহার পক্ষে উভয়ই সমান। প্রাচীন গ্রীকগণ সমাজ রক্ষার জন্য কায়িক পরিশ্রম এতই আবশ্যক মনে করিতেন যে, কেহ অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে, প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাহার সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—'পরিশ্রম সমাজে পাপ-স্রোত নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়।' যে অলস, তাহাকে তাঁহারা চোর-ডাকাইতের সহিত তুলনা করিতেন। একখানি ইংরাজি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 'অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক পাপ-পুরুষের কারখানা স্বরূপ, কারণ যত কিছু গর্হিত কার্য্য পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত।'—শারীর স্বাস্থ্য-বিধান, ১২৭—১৩১ পৃষ্ঠা।

চুণীলাল একদণ্ড নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারিতেন

না,—অপরকেও নিশ্চেষ্ট দেখিতে চাহিতেন না। পাশ্চাত্যের স্বভাবসুলভ নিয়মানুবর্ত্তিতা তিনি আত্মস্থ করিয়াছিলেন এবং একটী দিনের কর্ম্মক্লান্তি তাঁহাকে নিয়ম-লঙ্ঘন পাপে লিপ্ত করে নাই। ইদানীং, স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য আত্মীয় বন্ধু সকলেই তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার যুক্তি দিলে এবং যাহাতে তাঁহার নিকট কর্ম্মের পশরা লইয়া কেহ উপস্থিত না হয়, সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করিলে, একদিন তিনি হতাশাসূচক কণ্ঠে বলিয়াছিলেন ;—"এইবার দেখ্‌ছি, তোমরা আমায় মার্‌বে।" সেইজন্যই তাঁহার প্রশস্তিতে লিখিয়াছিলাম,—

"কর্ম্মপ্রাণের কর্ম্ম গেলে প্রাণ কি থাকে আর,
সব চেয়ে যে নিবিড় বাঁধন কাজের বাঁধন তার !"

*　　　　*　　　　*

চুণীলালের ধর্ম্মজীবন পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে শৈশব ও বাল্যের ঘটনাগুলি স্মৃতিপটে উদিত হয়। বালক চুণীলাল কাঁদিতেছেন,—কিছুতেই তিনি শান্ত হইতেছেন না,—উপায়ান্তররহিতা মাতামহী গাহিতে লাগিলেন ;—

"ক কহে কহ কহ কৃষ্ণ কথা কহ"—ইত্যাদি,

আর ক্রন্দনোন্মত্ত শিশু ক্রন্দন ভুলিয়া গেল,—উৎকর্ণ হইয়া নিস্তব্ধভাবে হিন্দুর পরমপূত নামগান শুনিতে লাগিল,—যেন কিছুই হয় নাই ! তাহার পর আর একদিনের কথা,—মহাষ্টমীর দিন। পিতা দীননাথ চুণীলালকে বাগবাজারস্থ জমিদার ৺নন্দ বসুর বাটীতে সাড়ম্বর বলিদান-উৎসব দেখাইতে লইয়া গিয়াছেন। ঢোল-ঢক্কা-ঝাঁঝর-কাঁসরে, চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত উল্লাসধ্বনির মধ্যে ছাগশিশুর কাতর আর্ত্তনাদ ব্যর্থ

করিয়া, জগন্মাতার সম্মুখে বলিদানক্রিয়া সমাধা হইল,—আর সেই দুগ্ধপোষ্য বালক 'ওকে কেটে ফেল্‌লে কেন—ওকে কেটে ফেল্‌লে কেন ?'—বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া লুটাইয়া পড়িল ! আমাদের বোধ হয়, মুকুল-শৈশবে চুণীলালের সুকুমার হৃদয়ে এই প্রহ্লাদ বা চৈতন্যদেব-সুলভ ভক্তভাব ও বুদ্ধদেবের ন্যায় অহিংসভাব. তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সহজাত সংস্কার হইতে উদ্গত অঙ্কুররূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

তাহার পর দেখিতে পাই, কৈশোরে চুণীলাল ব্রাহ্ম সমাজে মিশিতেছেন। তখন ব্রাহ্মসমাজের গৌরবময় যুগ,—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মপ্রতিভায় চতুর্দ্দিক্ সমুদ্ভাসিত। ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্মোপাসনার রীতি-নীতি, তাঁহাদের আচার-ব্যবহার ও সমাজ-সংস্কার তাঁহার চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। যৌবনের প্রারম্ভেই ছাত্রজীবনের সূত্র ধরিয়া, General Assembly's Institutionএ (বর্ত্তমান Scottish Church College) পঠদ্দশায় তিনি মিশনারীদের নিকট খৃষ্টধর্ম্মের মহানীতি শিক্ষা করিতেছেন। ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে বসিয়া, যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অতি সহজ সরল কথায় সত্যের অবদানবাণী প্রচার করিতেছেন, তাহাও চুণীলালের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া. তাঁহাকে উচ্চকিত করিতেছে। ফলতঃ, চুণীলাল যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় যেন ধর্ম্মনৈতিক আন্দোলনের বন্যা আসিয়াছিল ! ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের তরঙ্গাভিঘাতে বঙ্গসমাজ সংশয়াকুল। সেই প্লাবনে ভাসমান্ কোন্ কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিতে পারিলে লোকে তীরে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাহা স্থির করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

আরও লক্ষ্যের বিষয় এইটুকু, সে সময় মানুষের ধর্ম্মপিপাসাও যেন উৎকটভাবে প্রবল হইয়াছিল! জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজ তখন ব্যতিব্যস্ত, বিধ্বস্ত। চারিদিক্ হইতে তাহার সংকীর্ণতা, তাহার স্বার্থপরতা, তাহার হীনতা-নীচতার প্রতি আক্রমণ চলিয়াছে। প্রতিদিন এক একটী ধর্ম্মদলের সৃষ্টি হইতেছে। আজ অমুক ব্রাহ্ম হইলেন, কাল অমুক খৃষ্টান হইলেন, আবার কেহ বা পরমহংসদেবের দল, কেহ বা শশধর তর্কচূড়ামণির দলে ভিড়িলেন, এই প্রকারে ধর্ম্মধ্বজীদের দলাদলির নিত্যলীলা চলিতেছে।

এই আন্দোলনের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া, চুণীলালের এইটুকু সুবিধা হইয়াছিল যে, অপরিণত বয়সেই, তৎকালে প্রবর্ত্তিত বা প্রচারিত প্রতি ধর্ম্মের বিষয়ে তিনি অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মনীতির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কর্ম্মজীবন গঠিত না হইলে, তাহা সুপ্রতিষ্ঠ হয় না, বাল্য হইতে ধর্ম্মপ্রাণ চুণীলালের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই এবং যে কোনও একটী ধর্ম্মে অন্ধভাবে আস্থাস্থাপন কর্ম্মজীবনে সার্থকতা লাভের পরিপন্থী, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। সেজন্য তিনি প্রতি ধর্ম্মের বিচারসহ মতবাদ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেন এবং নিজ ধর্ম্মসংস্কারের সহিত খাপ্ খাওয়াইয়া, জীবনযাত্রার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মনীতি সংকীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না বলিয়াই, তিনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল সমাজে সম সমাদরে গৃহীত হইতেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উক্ত ধর্ম্মসমস্যার যুগে উদ্ভূত হইয়া, সত্যানুসন্ধানী সত্যাশ্রয়ী চুণীলাল লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই; বরং, হংসবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্মের সারভাগ গ্রহণ

করিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার ব্যবহারিক ও নৈতিক জীবনে নিয়োজিত করিয়া জনপ্রিয়তার সহিত আত্মোৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু ইহা হইল তাঁহার ধর্ম্মজীবনের স্থূল দিক্। এইবার আমরা তাহার সূক্ষ্ম দিক্ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমাদের অনুমান হয়, বাল্যে চুণীলালের অধ্যাত্মজীবনের যে অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল, যৌবনে পরমহংসদেবের সংস্পর্শে তাহা পল্লবিত হইয়াছে। ছাত্রজীবনে স্বামী বিবেকানন্দের (তৎকালে শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত) সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা, তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়কে অতি সহজেই শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ-সান্নিধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। তথায় তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল না,—সেই তথাকথিত মূর্খ, মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী তাঁহাকে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের,—সার্ব্বজনীন প্রেমের,—সার্ব্বভৌম সেবাধর্ম্মের যে নিগূঢ় তত্ত্বকথা শুনাইলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হইয়া মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া করিল, তাঁহাকে যোগক্ষেম-কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিল। তাই আমরা সেদিন লিখিয়াছিলাম ;—

জ্ঞান-করমের তরুণ সাধক, এক বয়সী দুটী
পরমহংসদেবের চরণ শরণ নিল লুটি ;
দোঁহার দু'হাত ধ'রে,
মাথায় আশিস্ ভ'রে,
পাঠিয়ে দিলেন, যোগ্য পথের যোগ্য অধিকারী ;—
নির্দ্দেশে ত তাঁরি,—
জ্ঞানযোগী সে দেখিয়ে দিল জ্ঞানের নিশান তুলে,—
নারায়ণের নিত্য-সেবা দীনের সেবামূলে ;

রসায়নাচার্য্য চুণীলাল

কর্ম্ম দিয়ে দেখিয়ে দিলে তুমি কর্ম্মবীর,
দীনের নেত্র-নীর
দূর-করাটাই বিশ্বনাথের পূজার উপচার।
জ্ঞান-করমের মধুর সমাহার !

এই কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহাকে সংসারত্যাগের উপদেশ দেন নাই,—তাঁহাকে তাঁহার সেবাধর্ম্মের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সংসারে থাকিয়া, গৃহী-সুলভ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, দুঃস্থ-আতুর-দরিদ্রনারায়ণের সেবা-ব্যপদেশে যে ব্রহ্মানুভূতি, তাহারই মহাবাণী চুণীলাল পরমহংসদেবের নিকট হইতে পাইয়া, তাহা কার্য্যে নিজের জীবনে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেবের প্রিয়শিষ্য ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় মেডিকেল কলেজে তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার সহিত চুণীলালের ধর্ম্মালোচনা চলিত। শত কর্ত্তব্য থাকিলেও অবসর করিয়া তিনি প্রায়ই পরমহংসদেবের চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় রত হইতেন। পরমহংসদেবের অস্থি যখন যোগোদ্যানে আনিয়া সমাহিত করা হয়, চুণীলাল তখন তাহার অন্যতম বাহকরূপে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের মহাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত শুধু তাঁহার বন্ধুপ্রীতির ঐহিক সম্বন্ধ ছিল না,—স্বামীজী তাঁহার পারত্রিক জীবনেরও পরম সুহৃদ্ ও প্রিয় উপদেষ্টা ছিলেন। বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে, চুণীলাল প্রায় প্রতি শনিবার তথায় যাইতেন ও ভগবদুপাসনায় আত্মনিয়োগ করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপরও তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। উক্ত বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ সোসাইটীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং উক্ত

প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রেতি অনুষ্ঠানে তিনি অগ্রণীদের অন্যতম ছিলেন। যোগোদ্যান লইয়া মঠের সন্ন্যাসিগণের ও ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যাগণের মধ্যে যে গোলমালের সৃষ্টি হয়, তাহার মীমাংসায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত চুণীলাল সবিশেষ চেষ্টা করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি কিরূপ প্রগাঢ় ছিল এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি তাঁহার আস্থা কত গভীর ছিল, তাহা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের Ramakrishna Math and Mission Conventionএ তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা হইতে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে বলিয়া, তাহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।*

চুণীলালের ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎপ্রীতির পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহার হরিভক্তিপরায়ণা পত্নীর সাহচর্য্যে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চুণীলালের পত্নী তিলোত্তমা পরমবৈষ্ণব ৺রামকৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের আদরিণী পৌত্রী। শৈশব হইতেই তিলোত্তমার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার হয়। তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবী ভাবাভিব্যক্তির সমারোহ নিরীক্ষণ করিয়া, সরকার মহাশয়ের কুলগুরু গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে 'ভক্তিমতী—মা' আখ্যায় সম্বোধিত করেন। বলা বাহুল্য, তিলোত্তমা বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিতা হন এবং একমনে হরি-চিন্তন ও হরি-আরাধনে নিরতা আছেন। চুণীলাল যৌবনে ভগবদ্বিষয়ে দার্শনিক তথ্যসংগ্রহে

*পরিশিষ্ট (চ) দ্রষ্টব্য।

সমধিক ব্যাপৃত থাকিতেন, ভগবৎপ্রেমে বিগলিত হইবার অবসর তাঁহার খুব কম আসিত। অবশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়াতলে তাঁহার চিত্তে সে ভাবাবেশের উৎসব আরম্ভ হয়,—তাঁহার জীবনে ভগবৎপ্রেমের প্রথম জোয়ার আসে। তিলোত্তমার সহিত চুণীলালের বিবাহে যেন সেই জোয়ারে অনুকূল বায়ুর মিলন ঘটিয়াছে! 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর' এই মহদুক্তির সত্যতা চুণীলাল তিলোত্তমার দৃষ্টান্ত হইতে প্রত্যক্ষ করেন এবং এই ভক্তিমতীর ভাবপ্রেরণায় নিজেও অনুপ্রাণিত হন। সে সময় চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি তাঁহাদের ধর্ম্মকথার আলোচ্য ও নিত্যপাঠ্য গ্রন্থে পর্য্যবসিত হয়। এমন কি, দম্পতির বিশ্রম্ভালাপেও উক্ত পুণ্যগ্রন্থদ্বয় আলোচিত হইত। তাঁহারা উভয়ে একত্র বসিয়া বৈষ্ণব মহাজনগণের প্রেমসম্পুট অমিয়-পদাবলী অতি পবিত্র হৃদয়ে পাঠ ও আলোচনা করিতেন ও দিব্য ভাবাশ্রুতে অভিষিক্ত হইতেন। চুণীলাল পদকীর্ত্তন শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন এবং তাঁহার একজন সমজদার শ্রোতা ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্মভাব-প্রকাশক কোনও বাহ্যাড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভগবচ্চিন্তা, ভগবানের বিষয়ে ধ্যান-ধারণা অতি গুহ্যতম বস্তু,—নির্জ্জনে, অতি গোপনে তিনি তাহার অনুশীলন করিতে ভালবাসিতেন। গীতা-পাঠ তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে অতি সমাহিত চিত্তে সুললিত কণ্ঠে গীতার অন্ততঃ একটী অধ্যায় পাঠ সম্পূর্ণ করিয়া কার্য্যান্তরে হস্তক্ষেপ করিতেন। একটী দিনের জন্য তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত না,—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য

যে, শুধু শ্লোকগুলির আবৃত্তি করিয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না,—প্রতি শ্লোকনিহিত তাৎপর্য্যার্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তদনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদের বোধ হয়, গীতার ধর্ম্মই ছিল তাঁহার প্রাণের ধর্ম্ম,—গীতার কর্ম্মযোগের অনুশীলনই ছিল তাঁহার প্রাণের আকিঞ্চন এবং গীতার ঠাকুরই ছিলেন তাঁহার প্রাণের ঠাকুর!

চুণীলালের চরিত্র ও ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধে আমরা আর বিশেষ কিছু বলিব না,—শুধু আমাদের উক্তির সমর্থনে, তাঁহার আত্মীয় ও পরম সুহৃদ্ স্যার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের লিখিত প্রশস্তি দুইটীর মর্ম্মানুবাদ, তাঁহার বাৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে প্রকাশিত "স্মৃতি-তর্পণ" হইতে উদ্ধৃত করিয়া, বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিলাম।

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কৃত প্রশস্তির মর্ম্মানুবাদ *

"বাঙ্‌লার বর্ত্তমান যুগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের অন্যতম রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয়ের তিরোধানে সমগ্র দেশ আজ বিয়োগ-বেদনা প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার প্রতি অণুতে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠার অভিব্যক্তি ছিল। তিনি কখনও স্বর্ণ-সুযোগের ধার ধারেন নাই এবং

*মূল ইংরাজি প্রশস্তিটী ১৯৩০ সালে ৯ই আগষ্ট তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় "An Appreciation by Sir Devaprasad Sarvadhikari" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভাগ্যের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা তাঁহাকে তাঁহার বিবেচিত কর্ম্মপথ হইতে একতিল বিচলিত করিতে পারিত না। অতি সাবধান ও বিচক্ষণ তিনি সহসাই কোনও কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না; আবার কোনও পথে পদক্ষেপ করিলে আর কেহই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না।

"একদিকে অমায়িক সৌম্য ও প্রায় সহজনমনীয় মনোভাব, অন্যদিকে তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক দুর্জ্জেয় ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়-সঙ্কল্প, সময়ে সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গকে এবং এমন কি, তাঁহার আত্মীয়-গণকেও চমৎকৃত করিত। সমস্যাসঙ্কুল মুহূর্ত্তে তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেন,—'তিনি একপায়ে দাঁড়ান না,—যখন দাঁড়ান—দুই পায়ে ভর দিয়া সুদৃঢ় হইয়াই দাঁড়ান।' তাহা হইলেও, তিনি কাহারও অপ্রিয়ভাজন ছিলেন না। ঐকমত্য তাঁহার বিশেষত্ব ছিল এবং মতদ্বৈধ ঘটিলে বিরুদ্ধবাদী অচিরে তাঁহার মতকে সমীচীন বলিয়া বুঝিতে পারিত। রাজনীতিতে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন,—যদিও তিনি কখনও রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। যাহারা তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে দাসভাবাপন্ন বলিয়া অভিহিত করিলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মনোবৃত্তি পরিণতমস্তিষ্কের গবেষণাপ্রসূত আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

"গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নানাপ্রকারে সম্মানিত ও উপাধি-ভূষিত করিয়া-ছিলেন,—কিন্তু তিনি খেতাব অর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা কোনও দিন কিছু করেন নাই; তবে যাহা আপনি আসিয়া তাঁহার করতলগত হইয়াছে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"সামাজিক ব্যাপারেও তিনি এইভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতেন। ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম জীবনে তিনি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন বলিয়া সমাজ বিষয়ে তাঁহার অতি দূরদৃষ্টি ছিল এবং সামাজিক ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ব্যাপারে যে পক্ষ তিনি মঙ্গলকর বিবেচনা করিতেন, নির্ভীকভাবে তিনি সেই পথ অবলম্বন ও অনুসরণ করিতেন। তাঁহার সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

"তিনি ভগবদ্‌গীতার পরম ভক্ত ছিলেন এবং শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃত উক্ত মহাগ্রন্থের পদ্যানুবাদ তাঁহার নিত্য ধর্ম্মপাঠ্য ছিল। জীবনের প্রথম ভাগে ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহচররূপে তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের ধর্ম্মপ্রেরণা তাঁহার জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। আবার এই ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার হরিভক্তিপরায়ণা পত্নীর সাহচর্য্যেই একান্তিকতাপূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত তিনি একান্ত শ্রদ্ধাসহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইহাতেই তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস অতীব প্রগাঢ় হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন তাঁহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত ছিল,—উহা তাঁহার নিকট যথার্থ সাধনা বলিয়া বিবেচিত হইত—অবসর-বিনোদন বলিয়া নহে।

"দানই পরম, দানই চরম এবং দানই চিরন্তন কর্ত্তব্য,—এই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ও প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এবং শোভাবাজার হিতসাধনী সভা, কলিকাতা অনাথ-আশ্রম, কলিকাতা অন্ধবিদ্যালয় ও জেলা দাতব্য সমিতি তাঁহার কীর্ত্তির আংশিক পরিচয়স্থল। কিন্তু ঢক্কা-নিনাদ না করিয়া গোপনে যে দান, তাহাই ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দান-

শৌণ্ডতার প্রধান দিক্‌। তিনি কেবলমাত্র দানবিতরণকারী কর্ম্মচারী ছিলেন না,—তাঁহার নিজ দান—তাঁহার রাজোচিত অর্থাগম না হইলেও, বিরাট্‌ ও কুণ্ঠাহীন ছিল। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন, এমন কি, পর্য্যাপ্ত পুরস্কারের লোভেও কেহ তাঁহার একটীও শত্রু আবিষ্কার করিতে পারিবে না। এমন লোক এমন প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে যাহার সহিত তিনি মিশেন নাই এবং কোনও না কোনও ব্যাপারে তাঁহার উক্ত বিরাট্‌ দানের অংশভাগী হইয়া, ভিক্ষায় বা অর্থসাহায্যে উপকৃত হয় নাই।

"যাহা তিনি স্পর্শ করিতেন, তাহাই সোনা হইয়া যাইত এবং যেখানেই তিনি গিয়াছেন, তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ নাগরিককর্ত্তব্য তাঁহাকে তথায় যথার্থ নাগরিক পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার সে একনিষ্ঠ কর্ম্মদক্ষতার প্রমাণ রাঁচির সংস্কার-সাধন। রাঁচিতে অবস্থিতি করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। মহাপ্রয়াণের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার এই শেষ যাত্রা জানিয়াই সেখানে গিয়াছিলেন। সেই প্রিয় স্থানে, তাঁহার জীবনের সেই শেষ সন্ধিক্ষণে, অতি নির্জ্জনে তিনি তাঁহার পতিপ্রাণা পত্নীর নিকট হৃদয়ের গোমুখী-দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন এবং আসন্ন মরণ-মুহূর্ত্তে দুইজনে মিলিয়া গভীর প্রেমের সহিত, পরম নির্ভরতার সহিত পূত হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

"এইভাবে চুণীলালের অবসান! পরমভাগবত কর্ম্মযোগীর জীবন ছিল তাঁহার, তাই শেষের দিনেও তাঁহার কর্ম্মচ্যুতি একটুও ঘটে নাই। তিনি যে বেশ জানিতেন,—কর্ম্মই তাঁহার পূজা! সেই বিশ্বাসেই তিনি দিনপাত করিয়া গিয়াছেন, কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন এবং জীবলীলা শেষ করিয়া গিয়াছেন।

"রঁাচিও সেদিন তাঁহার যোগ্য স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছে,—দূর-দুরান্তর হইতে দলে দলে সমবেত হইয়া, সমগ্র রঁাচিবাসী নিবিষ্ট শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার শবানুগমন করিয়া তাঁহাকে চিতানলে তুলিয়া দিয়াছে।

"আজ আমি চুণীলালের জীবন-চরিত লিখিতে বসি নাই,—বহু বৈজ্ঞানিক ও সাময়িক পত্রিকায় তাহার অসদ্ভাব হইবে না। অন্ততঃ যাঁহারা কোনও উল্লেখযোগ্য মহৎ ব্যক্তির সমগ্র দেশবিক্ষুব্ধকারী মহাপ্রস্থানের বিষয় বর্ণনা করিতে গরিমাবোধ করেন, তাঁহারা তাহা বিবৃত করিবেন।

"চুণীলালের কীর্ত্তিরাজির বর্ণনা আমি করিব না,—যেহেতু তাহা দেশ-বিশ্রুত। আমি বলিতে চাহি,—তাঁহার সেই নিঃস্বার্থ সরল জীবনযাত্রার কথা, সেই পরহিতব্রত অনাড়ম্বর মহাপ্রাণতার কথা,—যাহা হইতে সমগ্র দেশবাসীর মহদাদর্শ সঞ্চিত হইবে। তাঁহার সাহিত্যানুশীলন শুধু বিজ্ঞানচর্চ্চায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার স্বজাতি,—তাঁহার দেশের তরুণ, নানা ব্যাধিতে, অপর্য্যাপ্ত ও অবিশুদ্ধ আহার্য্যে জর্জ্জরিত ও দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের রক্ষার উপায়-নির্দ্ধারণ একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক ও খাদ্য-সংস্কারবিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় তিনি অগ্রণী লেখক। এতদ্বিষয়ে তিনি প্রধানতঃ ছাত্রসমাজের প্রতি বেশী লক্ষ্য দিতেন। বঙ্গভাষায় সহজ পন্থায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানবিষয়েও তিনি অগ্রণী,—ইহারই ফলে Indian Association for the Cultivation of Science এর উদ্ভব। আবার তাঁহার লক্ষ্য যে শুধু বৈজ্ঞানিক ও ভৈষজ্য আলোচনায় পর্য্যবসিত ছিল, তাহা নহে,—ডাঃ

মহেন্দ্রলাল সরকার ও ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়দ্বয়ের ন্যায় তাঁহার অনুশীলনের দূরবিসারী অভিজ্ঞতা ছিল। উক্ত দুই মহাত্মার প্রতি তিনি বড়ই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

"চুণীলালের প্রতি কার্য্য শৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীর এমন একটা সুসমৃদ্ধ অনন্যসাধারণ বিবৃতি রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তীগণের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়স্বরূপ হইবে। তাঁহার এই সুশৃঙ্খলাপূর্ণ কার্য্যাবলীর দৃষ্টান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে জানিতে পারা গিয়াছিল,—যে সময় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Education Commissionএর সদস্যরূপে মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনে যান। স্যার গুরুদাস তাঁহার বিচারবুদ্ধিসুলভ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ফৌজদারীসংক্রান্ত যে সমস্ত দ্রব্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য আসে, তৎসমুদয় কি ভাবে সুরক্ষিত ও পরীক্ষিত হয়। চুণীলাল তদ্বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ শৃঙ্খলার অভিনব পদ্ধতি বুঝাইয়া দিয়া কমিশনের বিস্ময় উৎপাদন করেন। সেই হইতে স্যার গুরুদাস ও চুণীলাল পরস্পরে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং সেই অন্তরঙ্গতার নিদর্শনস্বরূপ চুণীলাল স্যার গুরুদাসের গুণমুগ্ধ চরিতলেখক হইয়াছেন।

"সামান্য বিষয়ও তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারিত না এবং তাঁহার সেই আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিপাতে সেই সামান্য বস্তুও অভিনব হইয়া উঠিত। তাঁহার শ্বশুরালয় ক্ষুদ্র পল্লী ব্রাহ্মণপাড়া তাঁহার বদান্যতার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছে এবং পরবর্ত্তী সময়ে ঐ জনবিরল গ্রামখানি শিক্ষা ও অর্থনীতিবিষয়ক উন্নতি তাঁহার নিকট হইতেই লাভ

করিয়াছে। মানুষের দুঃখ দূর করিতে তিনি কোনও দিন বিমুখ ছিলেন না বলিয়াই, যাহারা তাঁহার উপর দাবী করিতে পারিত না, এমন বহু ব্যক্তিও তাঁহার পর্য্যাপ্ত আর্থিক ও দৈহিক সাহায্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারিত।

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভর্সিটী ইনষ্টিটিউট্, অন্ধবিদ্যালয়, অনাথ-আশ্রম, সাহিত্য-পরিষদ্, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড, মাদক নিবারণী সভা প্রভৃতি যে সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও যে সমুদয়কে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তৎসমূহ নিপুণকর্ম্মী ও লোকপ্রিয় চুণীলালের অবসানে সত্যই চিরতরে দরিদ্র হইয়া পড়িল।"

রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে মহাশয় কৃত প্রশস্তির মর্ম্মানুবাদ *

"সেদিন পূতকর্ত্তব্যের আহ্বানে যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছিলাম, আজ তা' আপনাদের সমক্ষে পাঠ ক'র্‌বার অবসর পেয়েছি ব'লে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমার সে বিবৃতি মহাপুরুষ ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের জীবলীলার কতকগুলি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,—যাহা

*১৯৩০ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে রাঁচি সহরে জনসাধারণের পক্ষ হইতে আহূত শোকসভায়, ইংরাজিতে লিখিত এই প্রশস্তিটী পঠিত হয়। চুণীলালের ধর্ম্ম ও চরিত্র সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুর আরও একটী বিবৃতি পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। পরিশিষ্ট (ছ) দ্রষ্টব্য।

আমি নিজে জানি। বাল্যকাল থেকে, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধ'রে, আমি তাঁ'র সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম।

"আমি তাঁ'কে মহাপুরুষ ব'লে অভিহিত কচ্ছি। চরিত্রের বিশুদ্ধতা, উদ্দেশ্যের সততা, হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং উদারতাপূর্ণ বিচারদক্ষতাই মানুষের মহত্ত্বের মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রে দেয়। আমার বিশ্বাস, চুণীলালকে সে বিষয়ে যাচাই ক'র্‌বার দরকার নেই, তিনি সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছিলেন।

"জীবনে তিনি সার্থকতার জয়মুকুট প'রেছিলেন, সম্মান তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্জ্জন ক'রেছিলেন এবং দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠাস্থাপনের সৌভাগ্যও তাঁ'র হ'য়েছিল। কিন্তু এ সব পার্থিব প্রতিষ্ঠা ছাড়া সকলের উপরে তাঁ'র যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য,—তা'রই পূজা তাঁ'র অন্তরঙ্গ বন্ধু-মণ্ডলী এবং এই অতি সামান্য ব্যক্তিও খুব বেশী ক'রে, ক'রে থাকে। তিনি যা'র সঙ্গে মিশেছেন, তাঁ'র হৃদ্যতা তা'র কাছে তাঁ'কে প্রিয় ক'রে তুলেছে,—কেউ তাঁ'র শত্রু হ'তে পারে নি।

"সঙ্গীন্ অবস্থাতে প'ড়েও তিনি কখনও তাঁ'র সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা হারান নি। এক সময়ের ঘটনা আমার মনে পড়ে,—তাঁ'র বিরুদ্ধে কল্‌কাতা হাইকোর্টে এক দেওয়ানী মোকদ্দমায় তিনি যে মীমাংসা-বিমুখ সত্যনির্ভরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা'তে বিচারক ও সমবেত জনসাধারণ সকলেই চমৎকৃত হ'য়েছিল। তিনি বেশ জান্‌তেন (এবং হ'য়েছিলও তাই) যে, এই সত্যসন্ধতা তাঁ'কে বহু সহস্র অর্থদণ্ডের দ্বারা ক্রয় ক'ত্তে হবে।

"ইউরোপীয় সমাজেও তাঁ'র সুহৃদ্ ও গুণমুগ্ধ যথেষ্ট ছিল। বহু

লোক তাঁ'র কাছ থেকে সুপারিশ পত্র নিতে আস্‌ত, তাঁ'রও তা' দিতে কোন আপত্তি ছিলো না, তবে তা'তে তিনি শুধু যেটুকু সত্য তা'ই লিখ্‌তেন,—তা'র বেশী নয়। এতে কিন্তু তাঁ'র আনুকূল্য-লাভেচ্ছুর তৃপ্তি হ'ত না,—তা' হ'লেও, তিনি তা'দের অসন্তুষ্টিই বরণ ক'রে নিতে পশ্চাৎপদ হন্‌নি।

"দানই ছিল তাঁ'র জীবনের মূলমন্ত্র। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে তিনি শোভাবাজার হিতসাধনী সভার (Shovabazar Benevolent Society) অন্যতম বিশেষ কর্ম্মী-সদস্য ছিলেন। যা'তে উক্ত সমিতির সংকীর্ণ অর্থসংস্থান অযোগ্য পাত্রে অনর্থক ব্যয়িত না হয়, তা'র জন্য সাহায্যার্থীর প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের ভার তাঁ'র উপর ন্যস্ত হ'য়েছিল। তিনি তাঁ'র নানাপ্রকার কর্ত্তব্যের মধ্যে, এই কার্য্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং আবেদনকারীদের তথ্যের জন্যে প্রাতঃকালে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট সন্ধান নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁ'র অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই কলিকাতা অনাথ-আশ্রম (Calcutta Orphanage) বর্ত্তমান উন্নত অবস্থাতে উপনীত হ'য়েছে। পানিহাটীতে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত উদ্ধার-আশ্রমের (Rescue Home) সহিতও তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের তিনি কেবলমাত্র কর্ম্মী-পদবাচ্য ছিলেন না,—তিনি তত্রত্য বালক-বালিকাদের সহিত পরম আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন ক'র্ত্তে সমর্থ হ'য়েছিলেন,—তা'রা তাঁ'কে তা'দের পিতার ন্যায় ভালবাস্‌ত ও শ্রদ্ধা ক'র্‌ত এবং তিনিও তা'দের কল্যাণের জন্য যথার্থ পিতার আগ্রহই দেখাতেন। এ ছাড়া তিনি আরো বহুতর দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সংলিপ্ত ছিলেন।

"গোপন দানও তাঁ'র সামান্য ছিল না এবং যা' দিতেন অকাতরেই দিতেন। এ বিষয়ে তিনি যীশুখৃষ্টের সেই উপদেশানুযায়ী চ'ল্‌তে চেষ্টা ক'র্ত্তেন;—'তোমার দক্ষিণ হস্ত যা' করে,—তোমার বাম হস্তকে তা' জান্‌তে দিও না।'

"দেশবাসীর স্বাস্থ্যহীনতার সমবেদনাই তাঁ'কে স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা গ্রন্থ-প্রণয়নে অনুপ্রাণিত ক'রেছিল,—তা'র মধ্যে "খাদ্য" নামক বাঙ্‌লা বইখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে তিনি পুস্তকখানির পঞ্চম সংস্করণ পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বাহির ক'রেছেন। এজন্য তাঁ'কে অত্যধিক পরিশ্রম ক'র্ত্তে হ'য়েছিল,—তা' হ'লেও তিনি তা' অকুণ্ঠভাবেই ক'রে গেছেন। সম্ভবতঃ এই অতিশ্রমই তাঁ'র স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি যদি আর কিছু না-ও লিখে যেতেন, তা' হ'লেও তাঁ'র এই একমাত্র গ্রন্থই তাঁ'কে তাঁ'র দেশবাসীর ভবিষ্যবংশীয়গণের নিকট চিরস্মরণীয় ক'রে রাখ্‌ত।

"মেডিকেল কলেজে চাকরী-গ্রহণের অল্পকাল পরেই তিনি বাইরের চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। কিন্তু যখনই কোনও ব্যক্তি দুঃস্থতার জন্য ঠিকমত চিকিৎসালাভে অসমর্থ হ'ত,—তখনই ডাক্তার বসু বিনা পারিশ্রমিকে তা'কে চিকিৎসা ক'র্ত্তে প্রস্তুত ছিলেন। সকালে সন্ধ্যায় তিনি এ কর্ত্তব্য পালন ক'র্ত্তেন। একাজে তাঁ'র আন্তরিকতা এত বেশী ছিল যে, এক সময় ডাক এসেছে সন্ধ্যার পরে, দেরীতে,—পরদিন প্রাতে রোগীকে দেখ্‌তে যেতে হবে কথা,—কিন্তু ঠিক প্রত্যুষেই দেখা গেল, ডাক্তারবাবু রোগীর দ্বারে গিয়ে ঘা দিচ্ছেন, তখন রোগীর বাড়ীর সবাই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত!

"এ ছাড়া আজ আমি আপনাদিগকে তাঁ'র জীবনের আধ্যাত্মিক দিক্‌টার সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে কিছু ব'ল্‌বো। তাঁ'র এই জীবনের সহিত মিশ্‌বার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। তাঁ'র অন্তরের অন্তস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা বইত। বাইরে থেকে তাঁ'কে সাধারণ সংসারী-লোক ব'লে বোধ হ'ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন যথার্থ কর্ম্মযোগী ছিলেন।—'প্রতি কর্ম্মই যজ্ঞ, তাহা সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপী ভূমার নিষ্কাম অর্চ্চনাতে পর্য্যবসিত করা যেতে পারে'—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার এই মহতী বাণী তিনি তাঁহার সাংসারিক জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার উপদেশ ঃ—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"—সংক্ষেপতঃ এই-ই ছিল তাঁ'র ধর্ম্মবিশ্বাস। এই প্রগাঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে, তিনি তাঁ'র হৃদ্‌বিহারী পরমপুরুষের হস্তস্থ যন্ত্ররূপে নিজেকে পরিচালিত ক'ত্তে একাগ্র চেষ্টা ক'ত্তেন। ভরসা করি, এখানে অনেকেই আছেন, যাঁ'রা সাক্ষ্য দিতে পার্‌বেন যে, এ বিষয়ে তিনি কত বেশী সার্থকতা লাভ ক'রেছিলেন। যখন তিনি মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প'ড়তেন, সেই তরুণ বয়স থেকেই এই ছিল তাঁ'র জীবনের স্বতঃপ্রবাহিত অন্তর্নিহিত ধারা। এটা আমি নিজে বেশ জানি। তাঁ'র এই জীবনধারা পরবর্ত্তীকালে, ভগবদ্‌গীতা ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থাদি গভীর চিন্তাপূর্ণ অধ্যয়নের ফলে, পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ ক'রেছিল। ভোর চারিটার সময় তিনি শয্যাত্যাগ ক'রে গীতা পাঠ ক'ত্তে ব'স্‌তেন, আর পরমাগ্রহে ভাব্‌তেন,—কি প্রকারে তন্নিহিত

উপদেশগুলি দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিচালিত করা যেতে পারে। ক্রমে ক্রমে তাঁ'র সে ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হ'য়ে উঠেছিল এবং পরিশেষে এই ধারণা তাঁ'র প্রাণে বদ্ধমূল হ'য়েছিল যে, লোকহিতায় যা' কিছু করা যায়, তা'ই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠতম ভগবদর্চ্চনা।

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥

"গীতা থেকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন,—কর্ম্ম এবং একমাত্র কর্ম্মের মধ্য দিয়েই আত্মোপলব্ধি বা আত্মদর্শন সম্ভাবিত হ'তে পারে,—কর্ম্মই হ'চ্ছে যজ্ঞ।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥

"তা'ই ব'লে বুঝ্‌লে চ'ল্‌বে না যে, তাঁ'র প্রাণে ভক্তি ছিল না। তাঁ'র এদিকটা পুষ্ট হ'য়েছিল তাঁ'র পরমবৈষ্ণবী পত্নীর সাহচর্য্যে। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন এবং সাধারণতঃ, তাঁ'র সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে নিয়েই গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন ক'র্‌তেন। এই ভাবেই তাঁ'র দার্শনিক হৃদয়ক্ষেত্র ভক্তির নির্ঝর-ধারায় প্লাবিত হ'য়েছিল। সপত্নীক তিনি বহুবার তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। তৎ-প্রণীত "নীলাচল" প'ড়্‌লে বুঝা যায় যে, যেখানে তিনি যেতেন বা যা' যা' কিছু তিনি ক'র্‌তেন,—সকল ক্ষেত্রেই সকল সময়ে তিনি ছিলেন পূর্ণকাম।

"ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি বড় উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীনতাকে তিনি সমর্থন ক'র্‌তেন। প্রত্যেক ধর্ম্মে সত্য নিহিত

আছে,—এইটুকু তিনি বিশ্বাস ক'রে ক্ষান্ত হন নি, বরং তাঁ'র বিশ্বাস ছিল, —সমস্ত ধর্ম্মই সত্য। অধ্যাপক মোক্ষমূলার ব'লে গেছেন,—'সব ধর্ম্মই মানবাত্মাকে উচ্চতর আদর্শের সম্মুখে উপস্থাপিত করে এবং অন্ততপক্ষে ভগবদ্দ্যুতিমধ্যস্থ উচ্চতর ও সুন্দরতর জীবনের আকুল আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দেয়।'

"সব যুগের সব দেশের মহাপুরুষগণের প্রতি তাঁ'র গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিশেষতঃ, তিনি যীশুখৃষ্টকে অত্যন্ত ভালবাস্‌তেন ও সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই তাঁ'র উপদেশাবলীর কিয়দংশ পাঠ ক'র্‌তেন এবং তা' কার্য্যে প্রয়োগ ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌তেন।

"মহাপ্রস্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহ তাঁ'কে দেখেছি,—মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা ক'র্‌তে। তখন তিনি বার্দ্ধক্যজনিত দৌর্ব্বল্যে কোনও শ্রমের কাজ ক'র্‌তে পার্‌ছিলেন না। আমি তাঁ'কে ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক দুটী স্মরণ করিয়ে দিলাম,—তা'তে আছে,— 'শান্তি যদি পেতে হয়, তাহ'লে মানুষকে মন থেকে সব আকাঙ্ক্ষা, সব কামনা নির্ব্বাসিত ক'র্‌তে হবে, আমিত্ব ও সংসারের সকল বন্ধনের বাইরে চ'লে যেতে হবে। এমন কি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও যদি মানুষ এই ত্যাগীর অবস্থাকে আত্মস্থ ক'র্‌তে পারে, তাহ'লে সে আত্মদর্শন লাভ ক'রবে এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভে সমর্থ হবে।' আমি বলেছিলাম,— 'আমরা আমাদের এই বার্দ্ধক্যে অন্ততঃ যতটুকু পারি ততটুকু এই আদর্শ ভাবোপলব্ধির একাগ্র চেষ্টা ক'র্‌তে পারি। এর জন্য শারীরিক সামর্থ্যের ত বেশী দরকার নেই।' তিনি অন্তরের সহিত আমার মন্তব্যকে সমর্থন ক'রে ব'ল্‌লেন,—কি আশ্চর্য্য ঘটনার সাদৃশ্য, নিশ্চয়ই এ

দৈবনির্দ্দেশ! তিনি পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় ঐ দু'টী শ্লোকই পাঠ ক'চ্ছিলেন, এবং শ্লোকোক্ত বিষয়ই চিন্তা ক'চ্ছিলেন! হায়! সেদিন যখন আমাদের পরস্পরের এই শেষ ভাববিনিময়ের পর আমি বিদায় গ্রহণ ক'র্‌লাম, তখন স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিনি—এজগতে আমাদের আর মিলন হবে না!

"কিন্তু আমার বিশ্বাস, জীবনের শেষমুহূর্ত্তে তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের চেষ্টা ক'রে গেছেন।"

শেষ যাত্রা

চিরবাসী হইবার জন্য মানুষ জগতে আসে না,—সময় ফুরাইলেই চলিয়া যায়। মমতার নিগড়ে চোকের জলের বাঁধন দিয়া কখনও তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় নাই,—যাইবেও না। অনেকের ধারণা, যেমন তৈল থাকিতেও দীপ নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ আয়ুঃ থাকিতেও মানুষের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আয়ুঃ দেহের নহে,—আয়ুঃ কর্ম্মের ;—কর্ম্মের আয়ুঃ ফুরাইলেই মানুষ চলিয়া যায়। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, দেহের আয়ুঃ নিঃশেষপ্রায়, অথচ সেই বিধ্বস্ত দেহ-দুর্গ হইতে প্রাণবায়ু কিছুতেই বহির্গত হইতেছে না! দুর্ব্বহ জীবন লইয়া মানুষ প্রতি মূহূর্ত্ত বাঞ্ছিত মরণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। রোগ-জরা-জর্জ্জর শরীর শীর্ণ-বিশীর্ণ,—তবু তাহার নিষ্কৃতি নাই! ভগ্নস্তূপের ভিতর তাহার জীবনী-শক্তি কি করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। অবশ্য, শরীর-যন্ত্র বিকল না হইলে যে মৃত্যু সম্ভাবিত হয় না, তাহা জানি। আমাদের বক্তব্য, দৈহিক বৈকল্য মানুষের মৃত্যুর মুখ্য কারণ নহে। কর্ম্মের পরিসমাপ্তির সহিত মনুষ্য-জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। কাকতালীয় ন্যায়ের তালবৃক্ষে বায়সের উপবেশন যেমন তালপতনের উপসর্গ বা উপলক্ষ্য মাত্র, মৃত্যুর পক্ষেও দেহের বৈক্লব্যও ঠিক সেইরূপ। ভাস্করানন্দ বা ত্রৈলঙ্গস্বামীপ্রমুখ

মহাপুরুষগণের সমাধি-অবস্থায় তিরোভাব কিংবা বজ্রাহতের আকস্মিক মৃত্যু তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমাদের মধ্যে অকাল-মৃত্যু বলিয়া একটা সাধারণ কথা আছে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, অকাল-মৃত্যু কাহারও হয় না। সাধারণ দৃষ্টিতে আচার্য্য শঙ্কর, চৈতন্যদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ অকালে মৃত্যুর কবলে কবলিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই জিতেন্দ্রিয়, যোগসিদ্ধ পুরুষ। ভগবদুপলব্ধি যাঁহাদের নিকট সহজসাধ্য হইয়াছে, যাঁহারা ভগবৎপ্রেমস্বরূপ অমৃতরস আস্বাদনের অধিকারী হইয়াছেন, সাধারণ মানুষের তথাকথিত মৃত্যুকে আয়ত্ত করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল না। তথাপি, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন,—সাধারণ মৃত্যুকে অভিনয় করিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষের জন্ম—আবির্ভাব, আর মৃত্যু—তিরোভাব, ইহাই প্রকৃত সংজ্ঞা। কর্ম্মনির্দ্দেশে তাঁহাদের আগমন,—কর্ম্মান্তে তাঁহাদের প্রস্থান। লোকশিক্ষা বা লোকধর্ম্মের শৃঙ্খলাস্থাপন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। মানব যে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ,' —মোহান্ধকার ছিন্ন করিয়া, তাহাই তাহাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিবার জন্যই তাঁহারা অবতীর্ণ হন এবং যখনই তাঁহাদের সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপিত হয়, তখনই তাঁহাদের মহাপ্রয়াণ সংঘটিত হয়। আয়ুর সীমারেখায় তাঁহাদের বয়স বিবেচিত হয় না, কেননা সাধারণ শতায়ু মানবের শত জন্মের সাধনায় যাহা সম্পাদিত হয় না, তাঁহারা তাঁহাদের স্বল্প জীবন-পরিধির মধ্যেই তাহা সম্পাদন করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু ইহা ত গেল, বড়লোকের বড় কথা। ক্ষুদ্রের মধ্যেও কি তাই! আমাদের বোধ হয়,—অনেকটা তাই। আমাদের শাস্ত্রে আছে, লক্ষ-যোনি ভ্রমণ না করিলে মানবজন্ম হয় না,—আবার মানব হইয়াও জীব বহু

জন্মান্তরের সাধনা ব্যতীত অমৃতত্ব লাভ করে না। সুতরাং, অমৃতত্ব-লাভ জীবের তথা মানবের চরম উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্যই তাহার সাধনা, যুগযুগান্তর অবিশ্রান্ত সাধনা। সাধনার অনুষ্ঠান কর্ম্ম। এই কর্ম্মের আবার স্তরবিভাগ আছে, উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, উন্নয়ন ও অধোগমন আছে। জন্মে জন্মে মানুষের কৃতকর্ম্মের গুণাগুণ-বিচারে কর্ম্মের যোগাযোগ প্রতিনিয়ত চলিয়াছে এবং সেই যোগ ও বিয়োগের ফল হইতে মানুষের জীবনের সুখ ও দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ;—কর্ম্মধারাও স্থিরীকৃত হইতেছে। সুতরাং, এক জন্মের কর্ম্মের পরিসমাপ্তি যেখানে, সেখানে সেই জীবনেরও পরিসমাপ্তি বুঝিতে হইবে।

কিন্তু মোহবদ্ধ জীব আমরা,—মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও শোকে মুহ্যমান্ হই। যখন আমাদের পরম আপনার জন তাঁহার লীলাখেলা শেষ করিয়া নিয়তির আহ্বানে মহাযাত্রা করেন, তখন আমরা আর স্থির থাকিতে পারিনা,—আমাদের দার্শনিক তথ্য তখন এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকে! যদি সহসা সে মহাযাত্রা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, ক্ষোভের ত সীমাই থাকে না ;—যদি পূর্ব্ব হইতে দেহাবসানের ইঙ্গিত আসে, তাহা হইলে, অস্ত-গমনোন্মুখ দেহীর আত্মাকে নানা সতর্কতার বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার ব্যর্থ-চেষ্টা করি। ইহা মানবধর্ম্ম,—উপায় ত নাই!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চুণীলাল ছিলেন অটুট-স্বাস্থ্য, কান্তিমান্, শক্তিমান্ পুরুষ। তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যের রক্ষামন্ত্রের ঋষি। দেশের সর্ব্বজনীন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁহার চিন্তা, তাঁহার গবেষণা, তাঁহার প্রচেষ্টা যে কত বিপুল ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু শুধু উপদেশ দেওয়া ত তাঁহার স্বভাব ছিল না. তিনি নিজে যাহা করিতেন এবং করিয়া

কৃতকার্য্য হইতেন, তাহাই অপরকে করিতে বলিতেন। স্বাস্থ্যবিষয়েও ঠিক তাহাই তিনি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভীষণ ভূমিকম্পে যেমন অটল অচলও টলিয়া যায়, সেইরূপ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে চুণীলালের অটুট স্বাস্থ্যও সময় সময় ভগ্ন হইয়াছে। চুণীলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনিল-প্রকাশের বিবাহের সময় যে সামাজিক বিপ্লব ও আত্মীয়-বিরোধের সূচনা হয়, তজ্জনিত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে হৃদয়ে দমন করিয়া, সত্যরক্ষার কঠোর প্রচেষ্টায় তাঁহার একবার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এই সময় তিনি হৃদ্রোগে বড় কষ্ট পান। অবশ্য সুচিকিৎসার ফলে তিনি আরোগ্যলাভ করেন। তৎপূর্ব্বের আর একটী উল্লেখযোগ্য অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া যায়,—ভবানী-পুর বিশ্বাসবাটীর প্রীতি-ভোজনের ফলে এত গুরুতর পীড়িত হন যে, তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইবেন না, এইরূপ আশঙ্কা হয়। মানসিক চিন্তার জন্য তিনি মধ্যে বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসাগুণে নিরাময় হন। মৃত্যুর কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হইতে পুনরায় হৃদ্রোগের সূচনা হয়। তাঁহার উপলক্ষ্য তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ্ লোকপ্রসিদ্ধ ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু। বিপিনবাবু চুণীলালের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। জীবনের প্রায় প্রতি অনুষ্ঠানে তিনি বিপিনবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই পরমসহায়কে হারা হইয়া তাঁহার বিশেষ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। তাহার পর, উপর্য্যুপরি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার শত চেষ্টাসত্ত্বেও তাঁহার কয়েকটী শিশু পৌত্রী ও স্নেহের দৌহিত্রী (সরযূবালার জ্যেষ্ঠা কন্যা) পারুলের অকাল-মৃত্যুতে প্রাণে বড়ই ব্যথা পান। ইত্যাদি কারণে তিনি হৃদ্রোগে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইতে থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিষ্ক্রিয় থাকা চুণীলালের ধাতুসহ ছিল না। বিশেষতঃ, পেন্সান-গ্রহণের পর হইতে তাঁহার

ডাক্তার ৺বিপিনবিহারী ঘোষ এম-বি

[২৩৮ পৃঃ]

কার্য্যের ঝঞ্ঝাট এত বাড়িয়া যায়,—চাকরী-জীবন হইতে অবসর-প্রাপ্তির সুযোগে, বহুবিধ জনহিতকর কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি এত বেশী জড়াইয়া পড়েন যে, তাঁহার মস্তিষ্কচালনার তিলার্দ্ধ বিশ্রাম ছিল না। চাকরী-জীবনে বাধ্যতামূলক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, যে অবকাশটুকু তিনি দেশের কাজে নিয়োজিত করিতেন, তাহাতে যেন তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই! সেজন্য যেদিন তাঁহার চাকরীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার পরদিন হইতে তিনি যেন দ্বিগুণ উদ্যমে কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন! সভা-সমিতি, অনাথাশ্রম, আতুরাশ্রম যে যেখানে ছিল, সকলে যেন দল বাঁধিয়া তাঁহার স্কন্ধে কর্ত্তব্যের বোঝা চাপাইতে লাগিল, আর তিনি তাহা একান্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন! যেন দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন. আজ চাকুরী হইতে মুক্তি তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় আনিয়া দিল! এইখানেই বুঝিতে পারা যায়, চুণীলাল কি Mission বা কর্ম্মভার লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন। সংযত জীবনযাপন, সাংসারিকতার আদর্শস্থাপন এবং আতুর ও মর্ম্মপীড়িতের দুঃখনিবারণই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম দুইটী তাঁহার চাকরী-জীবনেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। শেষ মহাকর্ত্তব্যটী তাঁহার জীবনের প্রথমাঙ্কে আরব্ধ হইলেও, সময় ও সামর্থ্যের অভাবে চাকরী-জীবন পর্য্যন্ত সম্যক্ পরিপালিত হইতে পারে নাই, অথবা তাঁহার আশানুরূপ সম্পাদিত হয় নাই। তাই বুঝি শেষজীবনে তাঁহার আদর্শ অবসর-বিনোদন,—অক্লান্ত লোকসেবা! একদিকে কার্য্যের গুরুভারে শরীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে উদ্যম যেন দুর্দ্দমনীয় বেগে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্যোতিঃ

বিকীর্ণ করিতেছে! দিন দিন জীবনের গণা দিন যতই শেষ হইয়া আসিতেছে, কর্ম্মব্যস্ততা বা কর্ত্তব্যসম্পাদনের ব্যাকুলতা ততই বাড়িয়া চলিয়াছে! বলা বাহুল্য, তখনও তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরতি নাই।*

উজ্জ্বল গৌরকান্তি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিয়াছে, নধর নিটোল বলিষ্ঠ দেহ ক্রমশঃ শীর্ণ ও লোলচর্ম্ম হইয়া আসিতেছে এবং রোগের পুনঃপুনঃ আক্রমণের ঝটিকায় শালপ্রাংশু দেহযষ্টি ক্রমশঃ নুইয়া পড়িতেছে দেখিয়া বাটীস্থ সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আজ সাবধান চুণীলালের সেদিকে আর লক্ষ্য নাই.—অথবা থাকিয়াও নাই! স্বাস্থ্যের খাতিরে কর্ম্মবিরতি আর তাঁহার মনঃপূত নহে,

---

*বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর হইতে, চুণীলাল চিনি খাওয়া ত্যাগ করেন—দুগ্ধে স্যাকারিণ (Saccharine) সংযোগ করিয়া খাইতেন। এইরূপ দুগ্ধপান করিবার সময় তাঁহার লক্ষ্যে পড়ে যে, স্যাকারিণ-সংযোগে দুগ্ধে পীতাভ বিম্ব উত্থিত হয়। কারণ-নির্ণয়ের জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য জন্মে। তখনও তিনি অসুস্থ—হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল অসুস্থতাকে গ্রাহ্য করেনা। রোগের একটু উপশম ঘটিলে, চুণীলাল বাটীস্থ লেবরেটরীতে পরীক্ষা আরম্ভ করেন ও বুঝিতে পারেন যে, Saccharine সংযোগে দুগ্ধের Protein (ছানা জাতীয় বস্তু) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পুঞ্জে অধঃস্থ হওয়ায়, ঐ পীতাভ বিম্বের উৎপত্তি। তাঁহার ধারণা হয় যে, প্রস্রাবে Albumin দেখিবার ইহা অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্বে এবং এখনও Albumin পরীক্ষার সাধারণ উপায়,—Nitric Acid Ring Test. অধুনা Salicyl Sulphonic Acid দ্বারা এই পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অভ্রান্তরূপে হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক চুণীলাল Saccharine দ্বারা Albumin পরীক্ষা হইতে পারে জানিয়াই ক্ষান্ত হন

বরং, কর্ম্মবিরতি তাঁহাকে আরও বেশী দুর্ব্বল ও অপটু করিয়া ফেলিবে, ইহাই তাঁহার ধারণা! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই তাঁহার প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অসুস্থতা জ্ঞাপন করিয়া, বহু ব্যক্তিকে তাঁহারা দ্বারদেশ হইতে ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। নানা-বিধ অনুনয়ে তাঁহাকে বহু সভাসমিতিতে যোগদান হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কেবল স্বাস্থ্যের জন্য ও দুই একটী বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে বাটীর বাহির হইতে দেওয়া হইত। বাটীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন তিনি স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন;—"এইবার দেখ্‌ছি, তোমরা আমাকে মেরে ফেল্‌বে।" কিন্তু ঘরে বসিয়াও তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় নহেন, তখনও তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত! বাটীস্থ সকলের নিষেধ-সত্ত্বেও তিনি এই সময় তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "খাদ্যের" পরিবর্দ্ধিত শেষ সংস্করণ সম্পাদন করেন। তাহার ফলে, পীড়ার পুনরাক্রমণ ভীষণতর

নাই,—অন্যান্য প্রচলিত পরীক্ষা অপেক্ষা ইহা অভ্রান্ত কিনা জানিবার জন্য তাঁহাকে অনেকগুলি পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। প্রস্রাবে শুধু Albumin থাকে না,—ভিন্ন জাতীয় অনেক বস্তুই দ্রাবক-সংযোগে অধঃস্থ হয়। কিন্তু প্রস্রাবে Albumin দেখা দেওয়া খুবই গুরুতর রোগের সূচনা বলিয়া, অভ্রান্তরূপে Albumin নির্ণয় করা আবশ্যক। পরীক্ষাদ্বারা চুণীলাল নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন,—তাঁহার উদ্ভাবিত Saccharine পরীক্ষা অন্যান্য প্রচলিত কোনও পরীক্ষা অপেক্ষা হীন নহে, বরং, অধিকতর সম্পূর্ণ পরীক্ষা। ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসের Indian Medical Gazette এ তিনি বিশদভাবে এই পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে সন্দেহস্থলে তাঁহার উদ্ভাবিত পরীক্ষা সংশয়-নিরাকরণের অনেক সাহায্য করে।

হয়। তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই,—ধীরতার প্রতীক্ চুণীলাল দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও শয্যাশায়ী অবস্থাতে, Universityতে প্রদত্ত Adhar Mukherjee Lecture লিখিতেছেন। তিনি নিজে গিয়া এই বক্তৃতা পাঠ করিতে পারেন নাই,—পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশ কর্ত্তৃক Universityতে পঠিত হয়।

কিন্তু একটু রোগ-নিবৃত্তি ঘটিলেই,—একটু সুস্থ সবল হইলেই চুণীলাল কক্ষ-প্রাচীরে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেন না।—আবার সেই সভা-সমিতিতে যোগদান, প্রতি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কর্ত্তব্য পালন! ফলে, পুনঃপুনঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিতে লাগিল। সকলেই বুঝিলেন, কলিকাতায় থাকিলে তাঁহার স্থায়ী স্বাস্থ্যলাভের আশা নাই, দীর্ঘদিনের জন্য রাঁচিবাসই সমীচীন।

রাঁচি ছিল তাঁহার বিরাম-নিকেতন, অতি প্রিয়স্থান। এখানে আসিলে তাঁহার হৃতস্বাস্থ্যের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিত। রাঁচি—লালপুরে মনোমত স্থানে তিনি তাঁহার সুরম্য বিরামকুঞ্জ রচনা করেন ও তাহার 'Ruby Cot' বা 'চুণী-কুটীর' নামকরণ করেন। এই স্থানে তিনি আরও কয়েক বিঘা জমী ক্রয় করিয়া, আরও দুইখানি বৃহৎ বাসগৃহ ও ফুল-ফলাদির সুন্দর বাগান নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং, রাঁচিবাসের প্রস্তাবে তাঁহার অমত হইল না। বিশেষতঃ, এই সময় পত্নী তিলোত্তমার শরীর অত্যন্ত খারাপ, তিনিও হাঁপানিতে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিলেন। এমন কি, অবস্থা যেরূপ, তাহাতে মহাযাত্রার পথে তিলোত্তমাই অগ্রগামিনী হইবেন, সকলেই এরূপ আশঙ্কা করিতেছিলেন। সেজন্য যদি কোনও প্রতীকার হয়, এই ভরসায় অনতিবিলম্বে রাঁচি-

যাত্রা স্থির হইল,—দিনস্থির হইল ২রা শ্রাবণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮ই জুলাই, ১৯৩০, শুক্রবার।

ওঃ! সে কি দুর্য্যোগময়ী রাত্রি! রাত্রি ৮½টায় গাড়ী। সন্ধ্যার বহু পূর্ব্ব হইতে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। মুষলধারে বারিপাত। কলিকাতার রাস্তা ঘাট জলপ্লাবিত। এ দুর্য্যোগে যাত্রা স্থগিত রাখিবার জন্য সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহার সহযাত্রিনী তিলোত্তমা পর্য্যন্ত জানাইলেন;—"থাক্, আজ গিয়ে কাজ নেই,—সবাই যখন ব'ল্‌ছে।" চুণীলাল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জিদ্ ধরিয়া বলিলেন;—"তাই কি হয়? সব ঠিকঠাক্। বর্ষাকাল,—বৃষ্টি ত হবেই। তাই ব'লে যাওয়া হবে না? কই, তুমি এখনো তৈরী হও নি!" তিলোত্তমা বলিলেন;—"আমার আর তৈরী হ'তে কি?" চুণীলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন;—"তোমাদের কোথাও যেতে-টেতে হ'লে,—একটু আল্‌তা-টাল্‌তা প'র্‌তে—।" তিলোত্তমা বলিলেন,—"এখন আর আল্‌তা প'র্‌তে হবে না।" চুণীলাল সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সে কি কথা! দীর্ঘদিন রাঁচিবাস ক'র্ত্তে যাচ্ছ, দিনক্ষণ দেখে। আর আল্‌তাপরা হবে না! ওগো, তোমরা এঁকে বেশ ভাল ক'রে আল্‌তা পরিয়ে দাও।" চুণীলালের জিদ্‌ই বজায় রহিল,—তিলোত্তমাকে আল্‌তা পরিতে হইল। চুণীলাল যাত্রার তাড়া লাগাইয়া দিলেন। আকাশের দুর্য্যোগ,—রাস্তায় জল। একটু সময় থাকিতে রওনা হওয়া দরকার। শরীর তখন বেশ সুস্থ, মন প্রফুল্ল। স্নেহের নাতি-নাতিনীগুলিকে, বধূমাতাদ্বয় ও কন্যাদ্বয়কে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া কত আদর করিলেন। তাহারা প্রণাম করিলে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বধূদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন :—"দেখ লীলা, মলিনা যে তোমার ছোট বোন্, এটা যেন সকল সময় তোমার মনে থাকে,—আর মলিনা, লীলা যে তোমার দিদি, এটাও যেন তোমার সকল সময় মনে থাকে,—তাহ'লেই সব গোল মিটে যাবে।" পুত্রদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন ,—"দেখ অনি, জ্যোতি, আমার এই কথাটী যেন তোমাদের সকল সময় মনে থাকে যে, ভায়ে ভায়ে মনোমালিন্য কখনো হ'তে দেবে না।" পূর্ব্বে রাঁচি বা অন্যত্র একটু বেশী দিনের জন্য যাওয়ার সময় তিনি প্রায়ই এইভাবের বিদায়-সম্ভাষণ করিতেন। সুতরাং, কেহই আজিকার এইরূপ ব্যবহারে বিস্ময়বোধ করিলেন না। আজ যে তাঁহাদের স্নেহময় পরমাত্মীয় তাঁহার মমতা-ভাণ্ডার নিঃশেষে তাঁহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা কেহই তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিলেন না। হায়! মরণপথযাত্রী যিনি, তিনি কি বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—এই যাত্রা তাঁহার শেষযাত্রা, এই সম্ভাষণ তাঁহার শেষ সম্ভাষণ! তাহা যদি তিনি বুঝিয়াছিলেন,—তবে তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল না কেন? তাঁহার মমতা-মধুর উপদেশবাণী বাষ্পভারাকুল হইল না কেন? তিনি যে মমতা-নির্ঝর ছিলেন! কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, সন্দেহ হয়,—তিনি যেন পূর্ব্ব হইতেই মরণের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছিলেন! আশ্চর্য্য বন্ধনচ্ছেদ বটে!

নির্ব্বিঘ্নে ও সুস্থ শরীরে চুণীলাল রাঁচি পৌঁছিলেন। পথশ্রান্তিতে তিলোত্তমার শরীর বরং একটু অসুস্থ। চুণীলাল তাঁহার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিলেন। অন্যবার রাঁচি গেলে তত্রত্য সুহৃদ্‌বর্গই তাঁহার

সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে আসিতেন। এবার রাঁচি গিয়া চুণীলালের যেন বিলম্ব সহিতেছিল না!—তিনি প্রত্যেকের বাড়ী গিয়া কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিলেন। প্রত্যেকের খুঁটিনাটী বিষয় খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা, কোথায় কে পীড়িত তাহাকে পরীক্ষা ও তাহার ঔষধ-ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপার অতি তৎপরতার সহিত আরম্ভ করিলেন। বহুদিন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকার পর এখন যেন তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পুনর্লাভ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন! রাঁচি আসিলে এত দিন দিবা দ্বিপ্রহরে বা রাত্রিতে তিলোত্তমা চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত বা অন্য কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, আর চুণীলাল তাহা শ্রবণ করিতেন। এবার তাহার ব্যতিক্রম হইল। চুণীলাল তদগত-চিত্তে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন,—তদ্বিষয় আলোচনা করেন, আর তিলোত্তমা শুনেন। তিলোত্তমার শরীর অসুস্থ, পাছে তাঁহার পড়িতে ক্লান্তি বোধ হয়। কিন্তু তাহাই কি হেতু? বোধ হয়, তাহা নয়।

এই সময় একটী ঘটনা ঘটিল। রাঁচিযাত্রার দুইদিন পরে, চুণীলালের তিরোধানের পক্ষকাল পূর্ব্বে, সুবিখ্যাত স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিলাতে পরলোকগমন করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীর পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। স্যার বিনোদচন্দ্র চুণীলালের বৈবাহিক জাষ্টিস্ স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বৈবাহিক;—সুতরাং, চুণীলালের আত্মীয় ছিলেন। শুধু তাহাই নয়, বিশিষ্ট বন্ধুও ছিলেন। প্রাতরাশ সমাপনান্তে চুণীলাল ইজিচেয়ারে শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন,—অদূরে তিলোত্তমা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতা,—তিলোত্তমার শরীর তখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। বিনোদচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদের উপর চোক্

পড়িতেই চুণীলাল চমকিত হইয়া, আবেগজড়িত চঞ্চল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ;—"ওগো শুনছ,—আমাদের বিনোদ মিত্তির মারা গেলেন !"

তিলোত্তমাও বিস্ময়সূচক কণ্ঠে বলিলেন ;—"সে কি !"

"আর সে কি। ওঃ! মস্ত বড় লোক,—দেশের প্রকাণ্ড ক্ষতি হ'য়ে গেলো। নাঃ—আর কি ! সব চ'ল্‌লো,—একে একে নিভিছে দেউটী।"

চুণীলালের মুখে হতাশার ছায়া প্রকটিত হইল।

তিলোত্তমা বলিলেন ;—"এই একমাস হ'ল স্ত্রী গেলেন। স্ত্রী-বিয়োগ সইল না। কিন্তু কি ভাগ্যবতী !—কি সাধ্বী !"

চুণীলাল কাগজের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই বলিলেন ;—"হ্যাঁ, ভাগ্যবতী বটে, তবে সাধ্বী ঠিক বলা যায় না।"

তিলোত্তমা বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কেন নয়—বলো ?"

চুণীলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ;—"সাধু অর্থে ত্যাগী,—আর সাধু থেকেই ত সাধ্বী ! কাজেই সাধু যেমন স্বার্থপর হ'তে পারেন না, সাধ্বীও তেমনি স্বার্থপর হ'তে পারেন না।"

তিলোত্তমা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"স্বার্থপরতা কোথায় দেখ্‌লে ?"

তেমনই হাসিতে হাসিতে চুণীলাল বলিলেন ;—"স্বার্থপরতা নয় ! এমন বিশ্বস্ত স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন ! পাছে স্বামী-শোক ভোগ ক'ত্তে হয়, সেই ভয়ে আগে থেকেই—"

পত্নী তিলোত্তমাও বলিতে ছাড়িলেন না,—তিনি অভিমান-ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন ;—"তবে তুমি ব'ল্‌তে চাও, স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে স্বামীর আগে পালানই উচিত ? খুব ত্যাগস্বীকার ত !"

চুণীলাল উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন ;—"আমার সাধ্বীর আদর্শ কি জান ?—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত যে স্ত্রী স্বামীর সেবা করেন ও স্বামীর মৃত্যুর পর তদ্গতচিত্তে কালযাপন করেন, তিনিই সাধ্বী। তোমরা হ'চ্ছ ধরিত্রীর জাত, সহিষ্ণুতাই তোমাদের গৌরব। তোমাদের মধ্যে সহ্যশক্তি যাঁর যত বেশী, তিনি তত বেশী সাধ্বী। সে ভাবের সাধ্বীর ইহলোকে পতি-বিরহ সহ্য ক'ত্তে হ'লেও পরলোকে স্বামীর সহিত যে মিলন হয়,—সে মিলন চির-মিলন, যথার্থ মিলন। আর জানই ত,—আমাদের শাস্ত্রে আছে,—পতি-পত্নী সম্বন্ধ এক জন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চুণীলাল বিনোদচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা পাড়িলেন। তিলোত্তমাকে উক্ত প্রসঙ্গে কিছু বলিবার আর অবকাশ দিলেন না। হায়! সে দিন তিলোত্তমাও বুঝিতে পারিলেন না, উক্ত মন্তব্যের মধ্যে কি মর্ম্মভেদী ইঙ্গিত লুক্কায়িত রহিয়াছে!

বুধবার। মৃত্যুর চারিদিন আগের কথা। চুণীলাল তৈল মাখিতেছেন। তিলোত্তমা অতি সন্তর্পণে তাঁহার অঙ্গে তৈল মাখাইয়া দিতেছেন। তিলোত্তমার সতর্কতা কিন্তু চুণীলালের দৃষ্টি এড়াইল না! জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"অত আস্তে আস্তে তেল মালিশ ক'চ্ছ কেন বলো দেখি ?"

তিলোত্তমা বলিলেন ;—"হাতের নখগুলো একটু বড় হ'য়েছে,—লেগে যাবে—তাই।"

চুণীলাল অন্যমনস্কভাবে বলিলেন ;—"বেশ ত, নাপিত ব'সে র'য়েছে,—কেটে নাও না।—ওরে মহেশ,—"

তিলোত্তমা হাসিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন ;—"তা কি হয়! ওর কাছে নখ কাট্‌বো কেন ?"

চুণীলাল আপত্তির হেতু বুঝিলেন,—হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—"ও হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমাদের বুঝি আবার নখ কেটে আল্‌তা প'র্‌তে হয়! জীতান্‌—জীতান্‌—"

জীতান চাকর। তিলোত্তমা বলিলেন ;—"আবার জীতানকে কেন এখন! এত ব্যস্ত কি,—হবে 'খন।"

চুণীলাল নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। বলিলেন ;—"না—না। দেখ, এই খুচ্‌রো কাজগুলো যখনি তখনি ক'র্ত্তে হয়, নইলে মনে থাকে না।—জীতান্‌—"

জীতান আসিতেই চুণীলাল তৎক্ষণাৎ তাহাকে নাপিতানীর সন্ধানে পাঠাইলেন। তিলোত্তমাকে নখ কাটিতে ও আল্‌তা পরিতে হইল।

ইতিমধ্যে একদিন চুণীলাল তিলোত্তমার জন্য একখানি চওড়া লাল-পাড় শাড়ী কিনিয়া আনিয়া তিলোত্তমাকে বলিলেন ;—"দেখ, সধবা স্ত্রীলোককে লালপেড়ে শাড়ী প'র্‌লে বেশ মানায়। কেমন লক্ষ্মী-ঠাকুরুণের মতন দেখায়। অনেকদিন তোমাকে লালপাড় শাড়ী প'র্‌তে দেখিনি,—তাই কিনে আন্‌লাম্‌। আজ তুমি এখানা প'রো,—আমি দেখ্‌বো।"

তিলোত্তমা স্বামীর সে সাধও মিটাইয়াছিলেন। রাঁচি আসা অবধি একপ্রকার সুখেই দিনগুলি কাটিতেছিল। স্থান-পরিবর্ত্তনের ও পরিচর্য্যার গুণে তিলোত্তমা অনেকটা সুস্থ ও সবল হইয়াছেন।

চুণীলালের শরীরে যেন কোনও গ্লানি নাই! কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে অসুস্থতার কোনও চিহ্ন নাই! নিয়মিতরূপ প্রাতরুত্থান, গীতাপাঠ, প্রাতর্ভ্রমণ, সভা-সমিতিতে যোগদান, বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে গভীর আলোচনা ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে শাস্ত্রালাপ, কোনও কর্ত্তব্যের বিচ্যুতি নাই! স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া, প্রফুল্লতার দিক্ দিয়া, উৎসাহের দিক্ দিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না,—চুণীলাল জীবনের প্রায় শেষ-সীমান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন,—পরপারের খেয়ায় উঠিবার তাঁহার আর বেশী বিলম্ব নাই। দেশের জন্য গুরুকর্ত্তব্যের বিষয় হইতে সংসারের খুঁটিনাটী পর্য্যন্ত প্রত্যেকটীর উপর তাঁহার যে লক্ষ্য ও অভিনিবেশ পূর্ব্বে লক্ষিত হইত, এক্ষণে তাহার কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত Adhar Mukherjee Lecture—'Food' নামক তাঁহার শেষ গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। রাঁচিতে বসিয়া তিনি তাহার শেষ প্রুফ্ দেখেন,—রাঁচিতে বসিয়াই তিনি তাহার ভূমিকা লিখিয়া পাঠান,—১লা আগষ্ট, ১৯৩০, শুক্রবারে। ওদিকে মজঃফরপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থান হইতে ভাল ভাল লিচু ও আমের কলম আনাইয়া, তাহাদিগকে নিজ তত্ত্বাবধানে উদ্যানের যথাযোগ্য স্থানে রোপণ করিতেছেন। কে বুঝিবে যে, তিনি কাল রাত্রি তিনটার পর আর ইহজগতে থাকিবেন না! গাছ পোতা হইতেছে,—তিলোত্তমাকে রহস্য করিয়া বলিলেন,—"আমি বাগানটাকে তৈরী ক'রে দিয়ে যাচ্ছি,—আমার ভোগে অবশ্য হবে না, তবে তোমার নাতি-পুতিরা খাবে।"

তিলোত্তমার এ রহস্য ভাল লাগিল না। তিনি বিরক্তিভরেই

বলিলেন ;—"তোমার ভোগে যদি হবে না,—তবে এ বাগান করা কেন ?"

চুণীলাল হাসিয়া উত্তর দিলেন ;—"নিজের ভোগের জন্যই কি সব কিছু ক'র্ত্তে হয় !"

উক্ত ১লা আগষ্ট শুক্রবারে তিনি প্রত্যেককে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট যাহার যাহা পাওনা ছিল, কড়াক্রান্তি শোধ করিলেন। রাঁচির বাজারে গিয়া দোকান-দেনা মিটাইয়া বাটী আসিয়া ফর্দ্দ মিলাইতে গিয়া দেখেন, দোকানী কিষণলাল মাড়োয়ারী পাঁচ পোয়া চিনির কথা ফর্দ্দে তুলিতে ভুলিয়াছে। তখনই চাকরকে দিয়া তাহার মূল্য পাঠাইয়া দিলেন। তিলোত্তমা বলিলেন ;—"দামটা না হয় বিকেলেই দিয়ে আসত,—এত তাড়াতাড়ি কি ? এই বেলা দুপরের সময়।" চুণীলাল বলিলেন ;—"না—না—তাই কি হয় ! আজ আর আমি কারো দেনা রাখ্‌বো না। একেবারে অঋণী হবো আজ। বাড়ীতেও খরচের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। —বাস্‌।"

চুণীলাল যেন একটী মহাতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন !

দিবাভাগ বেশ শান্তিতে কাটিল। পরিণত বয়সের পবিত্র দাম্পত্য-জীবন। উত্তেজনা নাই, তরলতা নাই, কোলাহল নাই,—নিরুপদ্রুত, সুনিয়ন্ত্রিত, শান্তিময় জীবন-যাপন। রাঁচি সহরের উপকণ্ঠস্থ বহু ভাগ্যবান্ গৃহস্থের আবাসস্থলী পল্লী লালপুর। অদূরে পর্ব্বত-বন্ধুর দেশ ;—লালপুর হইতে দৃশ্যমান্ রাঁচি পাহাড়, মোরাবাদী পাহাড় প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু আজ উচ্চাবচ কঙ্করাকীর্ণ প্রান্তরে ঊষর বন্ধুরতা নাই,—শ্রাবণের ধারা প্রকৃতির নগ্নগাত্রে শ্যাম মকমলের

কাঁচলী পরাইয়া দিয়াছে! মেঘমুক্ত সন্ধ্যা ও সকালে নগরের বহির্ভাগে ভ্রমণ নবজীবনের সঞ্চার করে। স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর কূপবারি,—রোগ-বীজাণুনাশক স্নিগ্ধ মুক্ত বায়ু। অবসাদ এখানে অবসন্ন! প্রবীণ দম্পতি আজ বড় সুখী! স্বাস্থ্যের যে-একটু অসঙ্গতি ছিল, এই সামান্ত কয়দিনের মধ্যে তাহাও প্রায় পূরণ হইয়া আসিয়াছে। সচ্ছল আনন্দময় সংসার,—চাঁদের হাট-বাজার,—আজ দূরে থাকিয়া মানসদর্পণে তাঁহারা সে সুখস্মৃতির প্রতিবিম্ব উপভোগ করেন। রাজদ্বারে সম্মান, ঐশ্বর্য্য-শালীর নিকট আদর-আপ্যায়ন, সুধীর নিকট শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, সাধুর নিকট আশীর্ব্বাচন এবং আতুর ও দৈন্যপীড়িতের নিকট কৃতজ্ঞতার অশ্রু-নির্ম্মাল্য যাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছে, তাঁহার আর অভাব কিসের? যাঁহার স্বামী অজাতশত্রু, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, স্বনামধন্য পুরুষ, সেই পতিগৌরবে গৌরবিণী নারীর ন্যায় সুখীইবা আবার কে?

কিন্তু নিয়তি,—রহস্যময়ী নিয়তি নিরবচ্ছিন্ন সুখ ত কাহারও ভাগ্যে লিখেন নাই! সুখনীড় ভঙ্গ করিতে তাঁহার ন্যায় পটীয়সী আর কে? ভাঙ্গিয়া গড়িতে তাঁহার যেমন আনন্দ,—গড়িয়া ভাঙ্গিতে বুঝি তাঁহার তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ! নচেৎ, তিলোত্তমার সৌভাগ্যে অকস্মাৎ এ অশনিপাত কেন!

দিবা গেল, সন্ধ্যা আসিল। বন্ধু-বান্ধব আসিলেন, নানাবিষয়ক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হইল। যথারীতি গীতাপাঠ ও শাস্ত্রালাপ হইল। যথাসময়ে সকলে বিদায়-গ্রহণ করিলেন,—অতি প্রসন্ন মনেই চুণীলাল তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। সহসা রাত্রি নয়টার সময় সেই কাল হৃদ্রোগের পুনরাক্রমণ হইল! তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের বাটীতে লোক ছুটিল।

ঔষধ আসিল, সেবন চলিল,—রোগের একটু উপশান্তিও হইল,—কিন্তু তাহা ক্ষণিক। একটু উপশম বোধ করিয়া, চুনীলাল তিলোত্তমাকে ঘুমাইতে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, -পাছে উৎকণ্ঠায় ও রাত্রি-জাগরণে তাঁহার শরীর আবার খারাপ হয়। স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিলোত্তমা শয়ন করিতে গেলেন। রাত্রি ২।৩ টার সময় আলো জ্বালা ও ঔষধ ঢালার শব্দে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চুনীলালের নিদ্রা হয় নাই,—রোগের যন্ত্রণা এত কঠোর। কিন্তু তথাপি মুখবিকৃতি নাই—স্থির—অচঞ্চল! তিলোত্তমা কাছে আসিয়া বসিয়া বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। তিলোত্তমা উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন ;—"আমি ভাল বুঝ্‌ছি না,—বাড়ীতে একটা টেলীগ্রাম করা যাক্, কি বলো ?"

চুনীলাল বলিলেন ;—"তা বেশ ত, আজ শনিবার, জ্যোতি বরং আসুক্ ;—আর গৌরী—কেমন ?"

গৌরী জ্যোতিঃপ্রকাশের জ্যেষ্ঠা কন্যা। চুনীলাল গৌরীকে বড় ভালবাসিতেন।

তিলোত্তমা সম্মতি দিলে চুনীলাল স্বহস্তে লিখিয়া টেলীগ্রাম পাঠাইলেন। পরক্ষণে একটু ভাবিয়া বলিলেন ;—"দেখ, একেবারে টেলীগ্রাম পাঠানটা কিন্তু ভাল হ'ল না। বাড়ীতে সবাই খুব ভাব্‌বে। একখানা পোষ্টকার্ড দাও ত, লিখে দিই।"

তিলোত্তমা পোষ্টকার্ড আনিয়া দিলেন। চুনীলাল লিখিলেন, অনিল প্রকাশকে,—"গত রাত্রি হইতে আবার অসুখ হইয়াছে, সেই জন্য জ্যোতিকে আসার জন্য টেলীগ্রাম করা হইল, ভাবনার বিশেষ কারণ নাই।"

শনিবার দিবাভাগে রোগের প্রকোপ প্রায় সমভাবেই থাকিল। কিন্তু তাহাতে চুণীলালকে খুব বেশী বিচলিত বা চিন্তিত বুঝা গেল না। বন্ধু-বান্ধব যাঁহারা প্রায় নিত্যই আসিতেন,—তাঁহারা ত আসিলেনই,—চুণীলালের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া, আরও অনেকেই দেখিতে আসিলেন। অসুখের কথা ত হইলই,—অন্যান্য বহু প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইল। চুণীলালের যেন এমন বিশেষ কিছু হয় নাই,—এমনই ভাবে তিনি তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। চুণীলালের মুখে সেই প্রসন্নতা, বাক্যে সেই গাম্ভীর্য্য, ব্যবহারে সেই অমায়িকতা। বন্ধুগণ নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সন্ধ্যায় আবার তাঁহারা দেখিতে আসিলেন। প্রিয় সুহৃদ্ উপেন্দ্রবাবু (রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দে মহাশয়) আসিলে, তাঁহার সহিত গীতা-পাঠ ও আলোচনা চলিল। আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার বিবৃতি দিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদের চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে, রাত্রি প্রায় ৯টার সময় রোগের অত্যধিক বৃদ্ধি, দুঃসহ যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। চুণীলাল দুইবার ঔষধ সেবন করিলেন, কিন্তু যন্ত্রণার কিছুই লাঘব হইল না। এবার তিনি জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলেন,—যন্ত্রণার মুখে বলিয়া ফেলিলেন ;—"ওষুধে আর কিছু হবে না। আর বুঝি অনি, জ্যোতির সঙ্গে দেখা হ'ল না!" তিলোত্তমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল,—তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। এত যন্ত্রণার মধ্যেও চুণীলাল কিন্তু বসিয়া আছেন! তিনি তিলোত্তমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আসিলেন ; সতী, অরুন্ধতী, শৈব্যা, বেহুলা আসিলেন ; বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, খৃষ্ট, পরমহংসদেব সকলেই আসিলেন। সংসারের

অনিত্যতা, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, গীতার ‘বাসাংসি জীর্ণানি’, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে একান্ত শরণ ও ফলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ ইত্যাদি কত পুণ্যকথার গঙ্গা-নির্ঝর আজ চুণীলালের যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখ হইতে গোমুখী-নিঃস্রাবের ন্যায় বহির্গত হইতে লাগিল! প্রত্যেক উক্তির মধ্যে যেন চুণীলাল বলিয়া চলিয়াছেন,—“ওগো অশ্রুধারায় আজ আমার যাত্রাপথ কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল ক’রোনা,—বিলাপ ক্রন্দনে আর মহাকালের মোহন-বাঁশীর মধুর আহ্বান শুন্‌তে বাধা জন্মিয়ো না!”

কিন্তু তিলোত্তমার আজ আর সান্ত্বনা কোথায়? পুত্র কন্যা সকলেই দূরে,—তাঁহার বল-ভরসা কিছুই ত নাই! ‘হায়! কলিকাতায় থাকিলে বোধ হয় কোনও প্রতীকার হইত! কেন মরিতে রাঁচি আসিলাম! কেন সেদিনকার সে দুর্য্যোগে যাত্রা করিলাম! এ ত আমার রাঁচি-বাস নয়, এ যে আমার চির-বনবাস হইল!’ তিলোত্তমা কখন্ বাতাস করিতেছেন, কখন্ বুকে হাত বুলাইতেছেন;—আর অবিশ্রান্ত কাঁদিতেছেন। চুণীলাল—মুমূর্ষু চুণীলাল তখনও তিলোত্তমাকে বৈরাগ্যের বার্ত্তা শুনাইয়া প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছেন! তিনি যেন একটু বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিলেন,—“কাঁদ্‌ছ কেন বলো দেখি! কেঁদে কি হবে? কেঁদো না। তার চেয়ে বরং নাম গান করো।” পরক্ষণেই কোমল কণ্ঠে বলিলেন;—“তুমি যে হরিনাম ক’র্ত্তে ভালবাসো,—আমাকে যে কতদিন মধুর হরিনাম শুনিয়েছ,—আর আজ শোনাবে না?”

তিলোত্তমা কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন;—“তুমি আজ আমাকে অকূলে ফেলে চ’লে যাচ্ছ,—আর—আমি—তোমাকে—”

চুণীলাল শুধু উত্তর দিলেন ;—"কি ক'র্বো—উপায় নেই,—ভবিতব্য—ভবিতব্য !!"

রাত্রি যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, রোগযন্ত্রণার তত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও তিনি বসিয়া আছেন ! তিলোত্তমার কথামত খানিক আগে একটু ব্রাণ্ডি পান করিয়াছিলেন। খুলিতে গিয়া বোতলের ছিপিটী ভাঙ্গিয়া যায়, তিলোত্তমার মাথার কাঁটার সাহায্যে চুণীলাল তাহা বাহির করেন। এখন কাঁটাটী তিলোত্তমাকে ফিরাইয়া দিলেন। চোক্ হইতে চশ্‌মাজোড়াটী খুলিয়া তিলোত্তমার হাতে দিয়া বলিলেন ;—"যত্ন ক'রে রেখো !" নিজেই নিজের হাত দেখিয়া বলিলেন ;—"নাড়ী নেই।"

রাত্রি গভীর হইয়াছে। কক্ষ নিস্তব্ধ,—শুধু আতঙ্কের ও যন্ত্রণার নিঃশ্বাস ! একটু পরে চুণীলাল বলিলেন ;—"দেখ, এই যে তোমরা বলো,—চোকে 'জাল-পড়া', এইবার যেন আমার সেই অবস্থা এলো।" পরক্ষণেই বলিলেন ;— "আমার বোধ হয় একটু পায়খানা হবে।"

তিলোত্তমার তখন অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের মেঝেতেই পায়খানার ব্যবস্থা করিলেন। পায়খানার পর চুণীলাল বলিলেন ;—"কাপড়খানা ছেড়ে ফেলি,—কেমন ?"

তিলোত্তমা কাপড় আনিয়া দিলেন। চুণীলাল নিজেই কাপড় ছাড়িলেন। পরক্ষণেই বলিলেন ;—"এবার আমি শোবো, শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হ'চ্ছে।"

তিলোত্তমা তাঁহাকে ধরিয়া বিছানায় লইয়া গেলেন। চুণীলাল শুইতে শুইতে বলিলেন ;—"তুমি কোথায়—?—আমার শিয়রে এসে ব'সো।"

তিলোত্তমা তাহা করিতেই, চুণীলাল তাঁহার কোলে মাথাটী রাখিলেন,

—একবার তিলোত্তমার মুখের পানে তাকাইলেন; তারপর—তারপর আঁখি মুদ্রিত করিয়া আবেগপূর্ণ গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন;—"ভগবান্!—ভগবান্!—যদি দরকার বোধ করো, আমাকে নাও!"—বাস্—স্তব্ধ—সব শেষ!!

আর তিলোত্তমা?—তিলোত্তমা তাঁহার পরমারাধ্যের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সংজ্ঞা হারাইলেন! রাত্রি তিনটার সময় তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, তাহার পর কখন্ প্রভাত হইয়াছে, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। আহা! সংজ্ঞা আর না ফিরিলেই বোধ হয় ভাল হইত! কিন্তু তাহা ত হইবার নহে,—তাঁহার স্বামী-দেবতা বলিয়া গিয়াছেন;—'ভবিতব্য'! সুতরাং, শুশ্রূষায় তাঁহার চৈতন্য ফিরিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন;—কক্ষ ও প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য;—সমগ্র রাঁচি ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে! সেই শয্যাতেই স্বামী-দেবতা শুইয়া আছেন,—সত্যই যেন ঘুমাইতেছেন! মুখ-বিকৃতি নাই, শরীরের বিবর্ণতা নাই; কে বলিবে,—তিনি আর ইহজগতে নাই! সত্যই তিনি নিদ্রিত,—অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত! রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীরা আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে নাম-কীর্ত্তন জুড়িয়া দিয়াছেন, খোলে করতালে আকাশ বাতাস মুখর হইয়া উঠিয়াছে,—আর তিনি যেন সমাধি-মগ্ন অবস্থায় শয্যায় শায়িত রহিয়াছেন!

বেলা নয়টার সময় জ্যোতিঃপ্রকাশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোক-সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় জ্যোতিঃপ্রকাশ পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। বহু পরিচর্য্যার পর তিনি একটু শান্ত হইলে, সৎকারের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার আলোচনা আরম্ভ হইল। সমবেত বন্ধু-বান্ধব সকলেই মত করিলেন, মৃতদেহ কলিকাতায় লইয়া

যাইতে হইবে। জ্যোতিঃপ্রকাশও তাহাতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু তিলোত্তমা বলিলেন;—"তা হ'বে না, আমি আমার এমন স্বর্ণকান্তি স্বামীকে বিকৃত দেখ্‌তে পার্‌বো না। তোমরা এখানেই এঁর সৎকার করো।"

তিলোত্তমার কথাই স্থির হইল। রাঁচিবাসীও বোধ হয়, চুণীলালের সৎকারের অবসর পাইয়া ধন্য হইল। স্তূপে স্তূপে পুষ্পসম্ভার আনীত হইল, মাল্য রচিত হইল। ফুলসাজে সাজিয়া, ফুলশয্যায় শুইয়া, পঁচিশ হাজার শোভাযাত্রী লইয়া, আমাদের আদরের চুণীলাল, আমাদের গৌরবের চুণীলাল, আমাদের রসায়নাচার্য্য আদর্শ কর্ম্মবীর চুণীলাল, শত-সহস্র লোলুপ বাহকের স্কন্ধে অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা করিলেন। সুবর্ণরেখার শাখা হুন্ড্রুর তীরে তাঁহার নশ্বর দেহ অনন্তে লীন হইল! শবদেহ কলিকাতায় আসিলে, এতদপেক্ষা বহুলোকের সমাগম হইত, সন্দেহ নাই; কিন্তু রাঁচিতে এ ভাবের শোভাযাত্রায় এত লোক সমাগম আর কখনও হয় নাই। একটা লোকের জন্য এতগুলি লোক যে একযোগে একস্বরে কাঁদিয়া উঠিতে পারে,—এমন জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অন্তরের শ্রদ্ধানিবেদন করিতে পারে,—রাঁচিবাসী আজ তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইল।

* * *

যাও কর্ম্মযোগী,—কর্ম্ম সমাপনান্তে তোমার সাধনোচিত ধামে বিশ্রাম কর। রাঁচিবাসী তোমার চিতাধুমের চন্দন-সুরভি পাইয়া ধন্য হইয়াছে, আমাদের তাহাতে দুঃখ নাই। সাধ্বী তিলোত্তমার উক্তিকে সমর্থন করিয়া আমরাও বলি,—তোমার স্বর্ণকান্তিকে বিকৃতাবস্থায় না দেখিয়া আমরা ভালই করিয়াছি। তোমার যে প্রতিভোজ্জ্বল বলিষ্ঠ

গৌর-শ্রী আমাদের চিত্ত-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে,—তাহাই চিরদিনের জন্য অপরিম্লান থাকুক্। আমরা তোমাকে স্বাস্থ্যের মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া পূজা করিয়াছি, সুতরাং, তোমাকে ত আমরা লুপ্ত-স্বাস্থ্য, নির্ব্বীর্য্য, নির্জীব দেখিতে চাহিনা! তুমি আমাদের মানস-চক্ষুর সমক্ষে সেই অক্ষুণ্ণ-স্বাস্থ্য, অক্ষুণ্ণ-তেজা পুরুষকারের প্রতীক্ কর্ম্মবীর চুনীলালরূপেই চির-বিরাজ কর,—আর জীবিতাবস্থায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে জীবন্ত করিবার জন্য অবদানবাণী ও কর্ম্মের দ্বারা যে অনুপ্রেরণা জাগাইয়া গিয়াছ,—আজ প্রতি বাঙ্গালীর অন্তরের অন্তস্তলে অবস্থিত রহিয়া, তাহা তাহাদের কার্য্যধারায় রূপায়িত কর,—তাহাদের জাতীয় জীবনের দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ গালি চিরতরে তিরোহিত হউক্।

কর্ম্মবীরের মহাযাত্রা*

এইত সেদিন রাঁচি গেলে! আস্‌বে না যে আর,
ঘুণাক্ষরে তার
আভাসটুকু দাওনি, ওগো, এমন কেন হ'লে!—
অমনি গেলে চ'লে,
রাঁচি হ'তে কোন্ অজানা সুদূর সড়ক বেয়ে,
কোন্ করমের আবাহনে জলদ্-তাগিদ্ পেয়ে!

* মৎপ্রণীত "আরত্রিক" কাব্যগ্রন্থের "চুনীলাল" শীর্ষক কবিতা। প্রথমে "স্মৃতি-তর্পণে" প্রকাশিত হয়।

ছিলে যে গো নিত্য নূতন কর্ম্ম-অনুরাগী,
পরের তরে চিত্ত তোমার নিত্য ছিল জাগি !
বর্ম্ম সম স্বাস্থ্য অটুট্ যেদিন গেল টুটে,
আমরা এসে ছুটে,—
ক'রেছিলাম বন্দী তোমায়, কপাট দিয়ে এঁটে,
একে একে সব করমের বাঁধন দিয়ে কেটে ;
হায়, মমতার সোণার শিকল দিয়ে,
ভেবেছিলাম রাখ্‌বো ধ'রে বুকের মাঝে নিয়ে !
মুক্তাকাশের বিহগ তুমি, তাইকি অভিমান,
তাই সহসা শূন্যপানে ক'ল্লে অভিযান !
হায়রে মোহে অন্ধ মোরা, হায়রে ভাগ্যহীন,
বুঝ্‌লাম না সেদিন,—
কর্ম্মপ্রাণের কর্ম্ম গেলে প্রাণ কি থাকে আর,—
সব চেয়ে যে নিবিড় বাঁধন কাজের বাঁধন তার !

কিন্তু কেন এমন ক'রে গেলে ?
তুমি যে গো বাঙ্‌লা-মায়ের ছেলের মত ছেলে !
বীর যে তুমি, উদার সরল, জান্‌তে নাক ছল,
বিঘ্ন এলে ধ'ত্তে যে গো মত্ত করির বল !
তোমার উক্তি না এ,—
"এক পায়েতে দাঁড়াই নাক—দাঁড়াই দুটী পায়ে !"

দৈন্য সনে যুঝে,
স্বনামধন্য পুরুষ তুমি, আন্‌লে তুমি খুঁজে,
লক্ষ্মী-মায়ের মঞ্জুষাটী মানের মাণিকমোড়া ;
আপন বলে চিরঞ্জয়ী, এমন তোমার জোড়া
বিশ্বমাঝে ক'জন মিলে ? হায়গো কেন আজ,
অলক্ষিতে পালিয়ে গেলে ধ'রে ভীরুর সাজ !
সব ছিল ত আগেই তোমার জানা,—
কি দুর্য্যোগে রাঁচি গেলে, মান্‌লে নাক মানা।
ঘর যে তোমার সোনার চাঁদে ভরা,
জীবন-আলো-করা,—
একদিনও ত পায়নি তারা তোমার স্নেহে ফাঁকি,
হঠাৎ কেন সবায় ভুলে মুদ্‌লে দুটী আঁখি !

রাঁচি যেতে সঙ্গিনীরে সঙ্গে নিয়েছিলে ;—
শুন্‌তে ত পাই,—সেথায় তুমি খুলে দিয়েছিলে,
মুক্তিকামী হৃদয়খানি ;—ক'ল্লে অভিনয়,
অতীত-স্মৃতি প্রথম-প্রীতির লীলা মধুময় !
পরিয়ে দিয়ে লাল শাটীটী তাঁরে,
সীথির সিঁদুর, আল্‌তা পায়ে দেখ্‌লে বারে বারে
তার পরে ত আরো কতই কথা,
বুঝিয়ে তুমি ব'ল্লে তাঁরে ভুলিয়ে দিয়ে ব্যথা।

সব যদি গো জান্‌তে তুমি তবে,
মহাযাত্রার বার্ত্তা কেন ব'ল্লে নাক সবে !
শেষ দেখাটী, শেষ সেবাটী, লুটিয়ে প'ড়ে পায়,
শেষের নেওয়া চরণরেণু জীবন-কিনারায়,
হায়, হ'ল না তারও অবকাশ,
ফুরিয়ে গেল শ্বাস !
সঙ্গিনীরে সঙ্গী শুধু ক'ল্লে জীবন-পথে,
শেষের দিনে একাই গিয়ে উঠ্‌লে মরণ-রথে !

একটী কথা—"ভবিতব্য"—একটী কথা ব'লে,
সকল দোষে খালাস হ'য়ে গে'ছ তুমি চ'লে।
কথায় কথায় শিক্ষা দিলে নীতি,—
"সেইত সতী, সেইত স্বামী-প্রীতি,—
স্বামীর তরে সকল ব্যথা বরণ ক'রে নেওয়া,
অশরীরী স্বামীর সেবায় আপন ঢেলে দেওয়া,
সাধ্বী ত সেই—সেই ত পতিব্রতা,—
আত্মসুখে চায় না দিতে পতির বুকে ব্যথা।"
তাই ঘুমালে দেখ্‌তে নীতির ফল,—
তন্ময়ী সে নারীর মনের বল ?—
সোহাগভরে রাখ্‌লে মাথা অঙ্কে বৈষ্ণবীর,
তাঁরই দেওয়া ওষ্ঠপুটে উদক্‌ জাহ্নবীর

ভক্তিভরে ক'ল্লে তুমি পান :
তাঁরই মুখে শুনতে শুনতে মধুর হরির গান,
নিবিড় ঘুমে নিঝুম হ'লে শান্ত নিশীথ-রাতে,-
লক্ষ তারা সাক্ষী হ'ল গগন-আঙ্গিনাতে !
বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগের কথা,
লক্ষ দাদুর-ঝিল্লী-রবে ছুট্‌লো যথা তথা।

* *

কিন্তু প্রাণে বড়ই বিষম বাজে,—
তুমি যে গো বিকিয়েছিলে অন্ধ-অনাথ-মাঝে !
আমার-আমার ব'ল্‌তে তোমার পরম আপনজন,
আতুর যারা, ক'চ্ছে তারা, অশ্রুবিসর্জ্জন।
কে মুছাবে নয়ন তাদের, পিতার স্নেহ দিয়ে—
প্রাণের 'পরে নিয়ে ?
আর কে তাদের ব্যথার বোঝা মাথায় পেতে নেবে ?
নীরব দানে কে আর তাদের অভাব দূরে দেবে ?
ওই বাঙ্‌লার বিজ্ঞানের যে শ্রেষ্ঠ নিকেতন,
ওই সাহিত্য-পরিষদ্‌ যে ব্যথায় বিচেতন !
সকল দিকে সমান আঁখি, কতই প্রাণের টান,
দূরবিসারী অভিজ্ঞতা ; রাখ্‌তে মায়ের মান,
কি আগ্রহ, কি সাধনা, কঠোর কর্ম্মযোগ,
দেশের স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য ক'রে আত্মবিনিয়োগ,

কতই লেখা, কতই উদ্ভাবন,—
আজ সহসা সব ব্রত কি হ'ল উদ্‌যাপন !

বিরাট্ তোমার কর্ম্ম-লীলা, কোথায় যে তার শেষ,-
জানিনা কি অপূর্ব্ব সন্দেশ !—
কোন্ সুবিরাট্ কর্ম্মময়ের কর্ম্মশালার মাঝে,
তোমার মত কর্ম্মবীরের অভাব আজি বাজে !
তাই এ তিরোধান,
নিঃস্ব করি, রিক্ত করি মোদের হৃদয়খান।
ব'ল্‌বো কিবা আর –
বাঞ্ছা যাহা, পূর্ণ তাহা বিশ্বনিয়ন্তার।

*　　　　*

জ্ঞান, করমের তরুণ সাধক, এক বয়সী দুটী,
পরমহংসদেবের চরণ শরণ নিল লুঠি ;
দোঁহার দু'হাত ধ'রে,
মাথায় আশিস্ ভ'রে,
পাঠিয়ে দিলেন যোগ্য পথের যোগ্য অধিকারী ;—
নির্দ্দেশে ত তাঁরি—
জ্ঞানযোগী সে দেখিয়ে দিলে, জ্ঞানের নিশান তুলে,
নারায়ণের নিত্য-সেবা দীনের সেবা-মূলে ;

রসায়নাচার্য্য চুনীলাল

কর্ম্ম দিয়ে দেখিয়ে দিলে তুমি কর্ম্মবীর,—
দীনের নেত্রনীর
দূর-করাটাই বিশ্বনাথের পূজার উপচার।
জ্ঞান-করমের মধুর সমাহার !
জ্ঞানযোগী সে চ'লে গেছে জগৎ ক'রে আলা,
এবার তোমার পালা,—
তাই বুঝি গো মিল্‌লে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণতলে,—
ভক্তি-জ্ঞান ও কর্ম্ম-মিলন মন যেন এ বলে !

সান্ত্বনা আর—আর কিছুত নাই,—
পেলে তুমি চরম গতি পরম তীর্থে ঠাঁই !
দাও ছিটায়ে তীর্থ-বারি প্রতি শোকীর শিরে,
তোমার স্মৃতির পরশ নিয়ে শান্তি আসুক্ ফিরে।
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই মহতী বাণী
সার্থক হোক্—'তুমি আছ'—আমরা যেন জানি।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট (খ)

[৬৬ পৃষ্ঠা]

Extract from a letter from late Capt. F. T. Evans, M. D., I. M. S, Chemical Examiner to Government of Bengal to the Principal, Medical College, Calcutta, dated the 21st October 1895.

In March 1894 Chuni Lal Bose was selected to succeed Rai Taraprasanna Roy Bahadur, F. I. C., F. C. S., Fellow of the Calcutta University in the important appointment of Assistant Chemical Examiner to the Government of Bengal. It is not too much to say that no appointment under Government filled by a native official, carries with it graver responsibilities than those belonging to the office of a Chemical Examiner to the Bengal Government. It demands not only a high degree of special technical knowledge and skill to be acquired only by years of careful study, but also an amount of self-sacrifice only to be inculcated by a proper sense of the graver issues involved in the discharge of work of this kind. The experience of the last eighteen months enables me to testify that Chuni Lal Bose is in every sense a worthy successor of his predecessor in the appointment and I cannot conceive of any higher praise than this.

In addition to the daily routine of the laboratory, Chuni Lal Bose has found time during the nine years he has worked at Chemistry to do a very considerable amount of original chemical and medico-legal work the

results of which were published in the papers, either by himself or jointly with others.

* * * *

In conclusion, I have the honour to submit that any further testimony from me regarding the excellent nature of Chuni Lal Bose's work and qualification is hardly necessary and it only remains for me to express the pleasure which it would give me to see the honour (Fellowship of the Calcutta University) for which he is now recommended suitably bestowed.

পরিশিষ্ট (গ)

[৮০ পৃষ্ঠা]

Copy of Observations issued in the Indian Journal of Medicine, June 1922.

We congratulate Rai Dr. Chuni Lal Bose Bahadur, C. I E., I. S. O., M. B., F. C. S., most heartily upon the high honour conferred upon him by the King-Emperor as announced in the last Birthday Honour list. The whole of the Indian Provincial Medical Services Association and the Bengal Branch specially, will feel proud of this honour conferred upon their senior Vice-President and an Honorary Member of the Association. In him are combined the qualities of level-headedness, honesty of purpose, congenial manners and a courage of conviction which are exhibited to the highest degree and have

characterised the man everywhere, whether in his capacity as Chemical Examiner to the Government of Bengal, as a member of the Senate of the Calcutta University, as Sheriff of Calcutta, as a public man, or as an earnest worker in the social cause. He was a most successful teacher and his scientific contributions are well-known to all of us. He is the author of many books on Chemistry and Hygiene and has devoted his whole life to popularising science for the benefit of his countrymen.

7th June, 1922
6, Crofton Road,
Ealing, W. 5.

My dear Chuni Lal,

I am just writing a few lines to catch this mail as I want to send you my heartiest congratulations on your having been given the C. I E. in the last list of Honours. I am very pleased but I think that the Government should also have knighted you for your work as Sheriff last year or else given you K. C. I. E. at once. Any way I still hope that you will be knighted sooner or later, as if any one in Calcutta deserves this honour you do by the splendid work which you have done for Government for years and years. Mrs. Harris also asks me to send you her congratulations and best wishes for your health. I recognise a few other names of those who have been honoured. I hope, things are beginning to settle down in India.

I have to thank you for your last letter received some months back. I hope all my numerous Indian

friends in Calcutta are keeping well. Please remember me to them all specially to my late Assistants in the Surgeon General's office. I often think of my pleasant years in Calcutta and all my Indian friends, and I wish I would see them once more.

Believe me
Always your sincere friend,
Sd. Geo. A. Harris.

শ্রীশ্রীশিবদুর্গা

৩।২, রামচন্দ্র মৈত্র লেন,
কলিকাতা, ৪ঠা জুন, ১৯২২

স্নেহাস্পদ চুনীবাবু,

আপনি রাজা হ'লেও আমাদের "চুনীবাবু",—নইলে আপনি উপাধিতে "বাবুর" ঢের উপরে। আমি যখন ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেম যে, ১লা জানুয়ারিতে আপনাকে Sir Chunilal ব'লে ডাক্‌বো, তখন গণনার প্রথম ভুল হ'য়েছিল,—আমার মনে ছিল না যে, যেমন দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে বোধন বসাতে হয়, তেমনি Knighthoodএর পূর্ব্বে একটা C.I.E. বা C.S.I. দিয়ে বোধন বসাতে হয়। আর একটা ভুল যে, যেমন শ্রীরামচন্দ্র মামুলী দুর্গোৎসবের ব্যবস্থামত বসন্তকালে এ কার্য্য সমাধা না ক'রে, শরতে শারদীয়া পূজা ক'রেছিলেন, সেইরূপ বিশিষ্ট লোকের জন্য মামুলী বন্দোবস্ত একটু বদলে যায়। বিশেষতঃ, ১লা জানুয়ারি আমাদের বর্ষারম্ভ নয়। কিন্তু যে সম্রাটের প্রজা ব'লে আমাদের স্বীকার ক'র্ত্তে হয়, সেই সম্রাটের জন্মোৎসবে সম্মানলাভে একটা যেন বিশেষ শুভ সূচনা আছে। আবার সেই সম্মানের অর্থ সাম্রাজ্যের সঙ্গী। মনের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করি, স্বাস্থ্য ও শান্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনলাভ ক'রে, বসুবংশের নামে

উজ্জ্বল্যের উপর ঔজ্জ্বল্য আনুন্। আমি জোর ক'রে বেঁচে থেকে Sir Chunilal লিখে তবে মহাযাত্রার কথা ভাব্‌বো।

আশীর্ব্বাদ

স্বাক্ষর—শ্রীঅমৃতলাল বসু

পরিশিষ্ট (ঘ)

[৮২ পৃষ্ঠা]

শ্রীঃ

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

পদার্থবিদ্যামানপত্রম্।

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বসু, এম্, বি, মহাশয়—

কলকত্তা

বিশ্বতে তাবদত্র পরমপবিত্রে ভারতবর্ষে সংসারসাগরপরপারৈক সুহৃদশেষশান্তি-সুখনিদানস্য পরমাত্মসাক্ষাৎকাররূপনির্ব্বাণসোপানস্য বাহ্যাভ্যন্তরীণশুদ্ধিকারণস্য শিষ্টানুষ্ঠিত-বর্ণাশ্রমাচারস্য সম্প্রতিতত্ত্বানুশীলনকর্ত্তব্যোপেক্ষণবিতণ্ডাদিদোষপ্রচ্ছন্নজ্ঞানস্য সনাতনধর্ম্মস্য পুনঃসম্যগভ্যুদয়ায় সদ্বিদ্যাপ্রচারায় সাঙ্গধর্ম্মস্য পুনঃ প্রতিষ্ঠাপনায় আর্য্যজাতেঃ সর্ব্বাবিধায়াঃ শ্রিয়ঃ সমধিকবর্দ্ধনায় চ নরপতিগণপরিপোষিতা বিদ্বদ্বৃন্দনিষেবিতা নিখিল-সম্প্রদায়ানুমোদিতা অন্তর্ভাবিতদেশাহস্তর্দ্দেশা নিখিলধর্ম্মসমিতিপ্রতিনিধিঃ শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলাভিধানা শ্রীমতী সমিতিঃ।

রসায়নাচার্য্য চুনীলাল

এষা খলু পদার্থবিত্তাশিল্পকলাবিজ্ঞানাদীনামভ্যুদয়ায় বদ্ধপরিকরেতি ভবত রসায়নশাস্ত্রনৈপুণ্যমবলোক্যাত্মগৌরবং মন্তমানা গুণগ্রাহিণী ধর্ম্মসভেয়ং ভবন্তং গুণানুরূপং "রসায়নাচার্য্য" ইত্যুপাধ্যলঙ্কারেণালঙ্কৃত্য পরমানন্দসন্দোহমনুভবন্তী কাময়তে সানুরাগং সর্ব্বশক্তিমতো ভগবতশ্চরণারবিন্দেষু ভবতঃ সৎপুরুষার্থশক্তিপ্রাচুর্য্যমাধ্যাত্মিকোন্নতিশ্চ ভূয়াদিতি।

শ্রীকাশীধাম্নি শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলপ্রধানকার্য্যালয়ঃ দ্বিতীয়াতিথৌ শুক্লপক্ষে পৌষমাসে ১৯৭৩ বর্ষে	স্বাঃ শ্রীরামেশ্বর সিংহ (মিথিলাধিপতি, জি, সি, আই, ই) সভাপতিঃ ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলস্য। প্রধানাধ্যক্ষঃ।

পরিশিষ্ট (ঙ)

[১২১ পৃষ্ঠা]

Narikeldanga, Calcutta,
8th September, 1918.

My dear Rai Bahadur,

I have read with much interest your admirable paper entitled "Some Practical Hints to improve the Dietary of the Bengalis" The subject is one of vast importance. It concerns both the rich and the poor. The great deficiency of nutritive ingredients in the Bengali's dietary tells materially on his body and indirectly also on his mind, and if the defect is not cured in time, things will go from bad to worse. But the problem of

improvement is as difficult as it is important and the difficulty arises from the poverty of the people and is enhanced by religious sentiment excluding several articles from the dietary.

It is matter for no small congratulation that this important and difficult subject is taken in hand by a writer of your ability and attainments who is not only a learned physician and chemist but has made the food question his lifelong study, who is gifted with a rare power of lucid popular exposition of recondite truths of science, and who is animated by an earnest desire to serve his countrymen. And this paper, as might be expected, is well worthy of its author.

It does not indulge in vain recomendations which the poverty of the people would render impracticable or which their sentiments would make unacceptable. It treats of the subject in a simple but methodical manner, considering first of all in detail the articles of the ordinary existing dietary and pointing out its defects, and it then suggests simple practical modes of removing those defects The guiding principle throughout kept in view is not to add much that is new, but to utilize and turn to the best advantage all that is old, by easily practicable and improved modes of preparation, and to avoid all that is rare and costly and avail of everything that is cheap and easily procurable.

Certain popular ideas regarding the exaggerated importance of meat have been sought to be corrected, and the true physiological action and value of different articles of diet have been explained in language as simple and free from technicality as could be desired.

This valuable paper should be circulated as widely,

and the suggestions contained in it followed as fully, as possible.

With best wishes,
I remain,
Yours sincerely,
Gooroodass Banerjee.

To Rai Chunilal Bose Bahadur.

Narikeldanga, Calcutta,
8th September 1918.

My Dear Rai Bahadur,

I have read with great pleasure and no small profit your interesting and valuable paper on "The Milk Supply of Calcutta, its Hygienic, Commercial and Social Aspects"

Considering the importance of milk and milk-products in the Indian dietary and the extent of their adulteration, the necessity of imporving their quality and increasing their quantity can hardly be overstated. And it may be hoped that this paper, coming from the pen of a distinguished scientist and a recognised leader of thought in our community will help the solution of the mik-supply problem, by disseminating sound knowledge and sober views on the subject.

The paper deals in the first place, with the sources of milk-supply, the composition of pure milk, the extent and nature of its adulteration, and the detection of adulteration by simple tests. It then discusses the question of milk-supply in its hygienic and commercial aspects, and among other measures for securing improved and increased supply, it recommends the establish-

ment of model dairies, the providing of good pasture grounds, the opening of milk-markets under proper control, and the institution of prizes for encouraging good dairy management. And lastly, it reviews the social aspects of the question. It appeals to Government, to Municipal authorities and to the people, for co-operation in the matter ; and that appeal, it is hoped, will find a ready response.

The paper deserves careful study by everyone interested in the welfare of the community.

Yours sincerely,
Gooroodass Banerjee.

To Rai Chunilal Bose Bahadur

পরিশিষ্ট (চ)

[২১৯ পৃষ্ঠা]

Report of speech of Rai Chuni Lal Bose Bahadur on the occasion of the Ramakrishna Math and Mission Convention, 1926, presided over by Swami Shivananda.

I am linked with three generations of the Ramakrishna Mission. What I mean by this is that I have had the rare privilege in my life to sit at the feet of Sree Ramakrishna ; Swami Vivekananda and myself were friends in our early days and I had also the good fortune to associate myself with the work inaugurated

by the Swamiji from the early days of its inception; and then I am associated more or less with the present order of Sannyasins as well even in this fag-end of life. I have thus been in touch with and many a time actually worked in co-operation with the Mission during the last twenty-eight years or more, with the result that I stand here to-day to bear testimony to the excellent work which the Order has been doing and still more the ennobling spirit of "Service as worship" in all work which the Mission has brought into play in the country by word and example through its varied activities. I have in some cases had occasion to see first-hand the workings of a member of permanent institutions, philanthropic, educational and missionary, fostered under the loving care and assiduous labour of the self-sacrificing workers of the Mission in different parts of the country—at Hardwar, Benares, Allahabad, Brindaban and at other places I have all through marked with joy and delight and often with a sense of pride and reverence the achievements of these youthful adherents of the neo-faith, struggling through innumerable odds and difficulties by sheer force of their character and their genuine feeling for the poor and the distressed, their undaunted zeal and courage unaided by any temporal power worth counting upon. I remember, in this connection, with a sense of sincere delight and admiration, incidents connected with my own life which bear witness to the intrepid zeal and earnestness combined with a sincere feeling and love for the distressed with which the workers of the Ramakrishna Mission conduct relief operations during flood, famine and pestilence regardless of their personal safety. Years ago, when certain parts of Bengal were under a ravaging flood, I with a few friends of mine collected some money to offer relief to the distressed people, but none of us

having any experience in regard to such work in the actual field of operation, I approached the authorities of the Belur Math to assist with some leading in the matter. Swami Sadananda, since deceased, was deputed for the work. We then proceeded to the afflicted areas with the Swami and was struck with awe to see how that great man used to carry to the needy people pots of rice, pulses and other necessaries wading through the surging floods running breast-high risking his own life every moment, which I still remember vividly. Angels from heaven may have looked at his activities with wonder. Instances like this can be added one after another without end. And to my mind the services which the Mission has rendered to the country within the short period of three decades towards the practice and realisation of the ideal of *Sevadharma* are an asset to the nation. Besides, the country has had already much to learn and adopt out of these noble activities. The ideal of *Sevadharma* is the spirit of the age. The call to 'service to the motherland in the spirit of worship' is a slogan which the Swami Vivekananda has sounded forth for India of to-day. The ideal, rightly understood and intelligently practised, is calculated to serve all those great national ends which we have so long been fighting for. And that exactly is what the Ramakrishna Mission is conceived to aim at and fulfil.

Another great contribution—perhaps the most precious one to humanity at the present age—has been the light of true knowledge, wisdom, proper understanding and evaluation of the truths which religions and philosophies have been teaching mankind since the dawn of civilisation. This light emanated from Sree Ramakrishna and it is being diligently thrown broad-

cast by the Ramakrishna Mission in the country and abroad from the days of Swami Vivekananda's world campaign. Sree Ramakrishna by the example of his life has shown mankind the truth that different systems of religion represent but different phases of one Eternal Religion, which is the religion of human soul, suited to different times, temperaments and circumstances. Religions do not contradict but fulfil one another; they but minister to the hankerings of the human heart according to individual predilections and they all tend towards and ultimately lead to the one Goal which is God expressed in different names and forms. Philosophies as well are but different readings of the same eternal mysteries from different angles of vision and there is as such a co-ordinated gradation in respect of the truths they found. Bigotry and dogmatism, therefore, have no place in religion and philosophy. None can dogmatise on any particular creed or form to the exclusion of others; his is as much true as those of others. The pivot of religious life, whatever be the creed, is renunciation, i.e., foregoing the less for the greater, the baser for the nobler with difference only in degree. This renunciation grows towards self-control (Brahmacharya) and self-denial in the concerns of personal life. These are again the cardinal virtues that underlie the growth of true manhood. And there is no denying the fact that the present degeneration of the country is due to the lack of this virtues in our national character. The national and social life demands many things from the individual which he cannot give unless prepared to forego personal interests to a certain extent. True, national prosperity cannot come to any individual or nation unless the individual and the nation is ready to strive for it sincerely and diligently; but a spirit of self-abnegation is also neces-

sary for achieving the collective ends of national life.

Renunciation or self-denial does not necessarily imply monastic life in all cases. All men are not to be monks. Only a few who feel a tremendous impulse from within can forego the lesser demands of family life and devote themselves to the larger demands of a life for the ideal with individual liberation and the good of mankind as its one outlook. With a little loss to their parents such noble souls become ministers to the well-being of the community and the world at large. But all are not ordained for that Nevertheless, there is sufficient scope in the life of the man of the world even to become an instrument for the greater good of the community. The ideal of 'Brahmacharya' and the spirit of renunciation are none-the-less incumbent upon a house-holder's life Only they have got to be consistently adjusted according to the conditions of that life. Unrestrained pandering to the flesh-instincts is not the object of married life. Children ushered into existence like so may brutes only bring poverty, moral and physical deterioration and hence national decay. With a mighty flow of virility, strength and courage in every vein there must be firmness of self-restraint examples of which could be found in the life of many in ancient times. Raghu—the mighty king Raghu of olden days—was not the son of parents of our type. His father practised for long the austerities and self-discipline of a life of Brahmacharya in the hermitage of Vasistha. Think again of the discipline which Aswapati underwent in order to beget a daughter like Savitri. Think of the life and character of Bhisma and the host of other heroes whom India

produced in the glorious past of our national history. A good deal of what children become they inherit from their parents. Remember the teachings of our ancient scriptures and all the saints and seers of bygone days. Remember also what Sree Ramakrishna, the latest and the most complete of the whole host of them, taught and enjoined upon you through his unique life. We should learn to look upon marriage as a holy alliance for a healthy continuance of the race also for the spiritual uplift of the pair and not as one for base enjoyment of the flesh. The Master used to say—Husband and wife should, after having one or two children, live together as brother and sister and should thenceforward devote themselves to the training of their children, to their own spiritual life and to the well-being of the society.

These are the vital truths of life which the Ramakrishna Mission has taken up to teach and propagate for the good of the country and of humanity. The Ramakrishna Mission owes its origin to the demands of Indian national life and the voice of the Swami Vivekananda, which rings through every note of it, lives as an inspiration for all futurity. It is primarily for the interests of India that the Swamiji went to the West. His idea was to establish between the two hemispheres by a better understanding of the lives of both, friendly relations of mutual exchange and fellowship and thus profit by the best gifts which the one has to give to the other. The western nations are materially far ahead of us and we need their help to develop in that respect. But they lack sorely in the more vital concern of life *viz.*—spiritual. And as friendship is possible only between equals, Swami

Vevekananda repeatedly urged upon us to wake up to a full recognition of our spiritual heritage, which the West seeks for its redemption, and raise ourselves up to an equally advantageous position to demand their friendship and help in matters material. Begging will not do; be prepared to give and you will be given back in equal share. This is what the Swamiji meant, and this is what he called his foreign policy, while the extensive practice and application of the ideal of Seva-dharma in all that we require to develop a healthy manhood in the country—in education and sanitation in the uplift of the masses and the depressed and in the education of our mothers and sisters above all—is what he called his home policy.

পরিশিষ্ট (ছ)

স্বর্গীয় চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর মহোদয়ের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটী স্মৃতি

সে অনেক দিনের কথা, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হ'য়ে গেল—কিন্তু এখনও বেশ মনে পড়ে। তখন আমি এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। বয়স আন্দাজ তের বৎসর। তিনি পড়েন মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ার ক্লাসে। প্রথম যে দিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ হ'ল, তখন কেমন যেন একটী অসাধারণ চরিত্রের প্রভাব আমার মনকে তাঁর দিকে টান্তে লাগ্ল। সে দিন তিনি যে আমাকে কোন ভাল উপদেশ দিয়েছিলেন তা নয়—সামান্য কথা-বার্ত্তা হ'ল—কেমন আছি কি পড়ি ইত্যাদি—কিন্তু কেমন মিষ্ট কথা—কেমন বল্‌বার ধরণ! তার ভিতর যেন একটী Magnetic Influence ছিল। একটা বিশেষত্ব সহজেই অনুভব ক'র্‌লাম। সে ছাপ নষ্ট হ'বার কোন কারণ কখনও উপস্থিত হয় নি।

রসায়নাচার্য্য চুনীলাল

ডাক্তারের ব্যবসায়ে যে অন্য সকল ব্যবসার অপেক্ষা পরের উপকার করার অধিকতর সুযোগ পাওয়া যায়, এটা যেন গোড়া থেকেই তাঁর মনে জাগ্ত। থার্ড ইয়ার থেকেই ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার কর্‌তে আরম্ভ করেছিলেন। নিজের কতকটা ক্ষতি স্বীকার করেও উহা কর্তেন। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত এই এক ভাবে লোকের উপকার করবার সুযোগ পেলে তিনি কখন ছাড়্তেন না। শরীর খুব অসুস্থ হ'য়ে রাঁচিতে গেছেন—কিন্তু কেহ এসে ডাক্তার ব'লে তাঁর সাহায্য চাইলে অসুস্থতার কথা ব'লে বা প্রাক্‌টিস্ করি না ইত্যাদি ওজর ক'রে কখন কা'কেও ফিরিয়ে দিতে দেখি নি। এক সময় কলিকাতায় নিজে খুব Heart Trouble থেকে ভুগ্‌ছিলেন—অথচ একদিন দেখ্‌লাম দোতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে একজন Apoplexy রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মীয়গণকে ভরসা দিবার জন্য তার রোগ-পরীক্ষা কর্‌তে গেছেন।

সমবেদনা ছিল তাঁর একটী স্বাভাবিক ভাব। সেটী তাঁকে সেধে আন্‌তে হ'ত না। বাল্যকালে বেশ একটু দুঃখ ক্লেশের ভিতর দিয়ে—অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম ক'রে—বিদ্যাশিক্ষা ক'রেছিলেন। পরিণত বয়সে যখন কাকেও সেরূপ অবস্থায় পতিত দেখতেন তখনই তাকে সাহায্য কর্‌বার সুবিধা খুঁজ্‌তেন। এই সমবেদনা আজীবন তঁাহাকে নানা প্রকার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে স্বার্থহীন কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত ক'রেছে।

সমাজে সর্ব্বত্র সকলের প্রিয় ছিলেন। কলহ বিবাদ দূরে থাক্—কখন কারও সহিত মন কষাকষি হতে দেখিনি। এক সময়ে একজন শিক্ষিত বন্ধু (Deputy Magistrate) তাঁর প্রতি অযথা অন্যায় বাক্য প্রয়োগ ক'রলেও তিনি এমন প্রশান্ত ভাব রক্ষা করেছিলেন যে তিন চারি মাস ধ'রে পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রাপ্ত হ'লেও সেই উপলক্ষে একটা স্থায়ী মনোমালিন্য হ'তে দেন নি। যার সঙ্গে একটু আলাপ হ'ত, তার ঘর সংসারের সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের সকল সংবাদ নিতেন। সব কথা ঠিক্ ঠিক্ মনেও রাখ্‌তে পার্‌তেন এবং ভুল্‌তেন না। দেখা না হলে বাড়ী গিয়ে খবর নিতেন।

"মনঃপ্রসাদ" ও "সৌম্যত্ব" এ দুটি মানস তপস্যা ব'লে গীতায় কথিত আছে। এ দুটী তপস্যায় তিনি খুব অগ্রসর হয়েছিলেন বলে মনে হয়। যখনি কাছে গেছি, সর্ব্বদাই একটি প্রফুল্ল ভাব দেখেছি—এমন কি কঠিন পীড়ার সময়ও মুহ্যমান্ অবস্থায় কোন দিন দেখি নি। তর্ক কর্‌বার সময় উত্তেজিত হ'তেন না—নিজের মতে দৃঢ় থেকে সম্পূর্ণ সৌম্যভাব রক্ষা কর্‌তে পার্‌তেন।

একটা স্বাভাবিক নিরভিমান ভাব তাঁর ছিল। আমি একজন বড় ডাক্তার—সর্ব্বত্র সম্মানিত, অতএব আর কেহ আমাকে কোন পরামর্শ দিলে সেটী তার ধৃষ্টতামাত্র, এরূপ ভাব কখন দেখি নি। তিনি খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে একজন authority ছিলেন। তা জেনেও রাঁচিতে একবার অসুখের সময় তাঁকে Jug Soup খাবার পরামর্শ দিতে আমি সাহস করেছিলাম। তখন তাঁর মাছ মাংস খাবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। তথাপি মন দিয়ে আমার কথা শুন্‌লেন এবং পরদিন যে ডাক্তার তখন তাঁর চিকিৎসা কর্‌ছিলেন তিনি ঐ পরামর্শ আগ্রহের সহিত অনুমোদন করায় Jug Soup খেতে সম্মত হ'লেন।

সামাজিক কাজ কর্ম্মে পাঁচ জনের সহিত মিলিত হয়েও ঐরূপ নিরভিমান ভাব রক্ষা কর্‌তে পার্‌তেন। আমার ছোট মামা যে দিন হঠাৎ মারা গেলেন সে দিন চুণীবাবুকে ডাক্তার হিসাবেই চিকিৎসার জন্য প্রথমে সংবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রোগী মারা গেলেন। সন্ধ্যার পর সৎকারের ব্যবস্থা কর্ত্তে হ'ল। আমাদের কয়জনের মধ্যে সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন চুণী বাবু—সুতরাং, তিনি কর্ত্তা হয়ে ব্যবস্থা কর্‌বার জন্য র'য়ে গেলেন। কাঁধ দিবার লোক কম পড়াতে ছোক্‌রাদের সঙ্গে মিলে নিজেই কাঁধ দিবেন স্থির ক'র্‌লেন—যদিও তখন তাঁর বয়স আন্দাজ ৫১।৫২ বৎসর এবং কিছু কাল পূর্ব্বে Heart Trouble থেকে বেশ ভুগেছিলেন। তাঁর পরিবর্ত্তে আমি যাবার জন্য জেদ করাতে কিছুতে শুন্‌লেন না। বল্‌লেন "তোমাকে যেতে দিতে পারি না। তুমি বাড়ীতে থেকে স্ত্রীলোকদের সান্ত্বনা দাও।"

যখন কলিকাতায় Sheriff হ'য়েছিলেন তখন প্রয়োজন হ'লে ট্রাম গাড়ি ক'রে হাইকোর্টে যেতে কুণ্ঠিত হ'তেন না। সে সময়ে বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁকে শীঘ্র একখানি মটর গাড়ি কিন্‌তে পরামর্শ দেন। উত্তরে তিনি বলেন যে, তাতে অনুচিত আত্মগৌরবকে প্রশ্রয় দেওয়া হ'বে,—যেন Sheriff হ'লে সাধারণের সহিত একত্রে এক গাড়িতে বসা যায় না। Sheriffএর কাজ থেকে অবসর পেলে পরে মটর গাড়ি কিনেছিলেন।

রাজনৈতিক ব্যাপারে practical politics ছিল তাঁর অভিমত। তার বাহিরে যাওয়া কখন অনুমোদন কর্‌তেন না। তাঁর ভাবটী ছিল এই যে, সকল নৈসর্গিক ব্যাপারেই একটা উন্নতির ক্রম (Law of Growth) অপেক্ষা করে, যা কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না। এই ক্রমবিকাশের (Evolution) গতি অবলম্বন ক'রে প্রত্যেককে গ'ড়ে উঠ্‌তে হ'বে—সময় পূর্ণ হবার পূর্ব্বে উদ্বিগ্ন হ'য়ে সত্বর গ'ড়ে তোল্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'লে ভাল ফল হয় না। খ্রীষ্টের বাক্য বল্‌তেন—"Which of ye by taking thought can add a cubit to his stature?" আরও বল্‌তেন যে, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যে "আঁব্‌ পাক্‌লে আপনিই গাছ থেকে প'ড়ে যায়—টেনে পাড়্‌তে হয় না। কাল পূর্ণ হ'লে পুরাতন ভেঙ্গে নূতন গ'ড়ে উঠ্‌বে।" পুরাতনকে আত্যন্তিক দৃঢ় ভাবে আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাকা অবশ্য ভ্রম, তা স্বীকার কর্‌তেন। কিন্তু বল্‌তেন যে, তারও চেয়ে বেশী ভ্রম ব্যস্ত হ'য়ে পুরাতনকে অকালে ভেঙ্গে দিয়ে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নূতনকে গ'ড়ে তুল্‌তে না পারা। ইংরাজরা আমাদের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের প্রধান সহায় এবং তাদের সহিত আমাদের সংযোগ বিধাতার বিধান, এটা তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। সেজন্য তিনি ইংরাজ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ কর্‌তেন। এই প্রকার ভাবের কথা সাধারণ সভা-সমিতিতে স্পষ্ট ভাবে বল্‌তেও কখনও পশ্চাৎপদ হ'তেন না, যদিও এজন্য কখন কখন তিনি অযথা লোকনিন্দাভাজন হ'য়ে পড়্‌তেন। আমার মনে আছে, একবার রাঁচির ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অধিবেশনের সময় এ দেশের প্রাচীন সভ্যতার প্রশংসাবাদ ক'রে এরূপ

বলা হয় যে, উহা পুনরায় আমাদের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পার্‌লে আমাদের কল্যাণকর হবে। আরও বলা হয় যে, ইংরাজদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান সভ্যতার দ্বারা এদেশের বিশেষ অনিষ্ট ঘটেছে। চুণীবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে প্রবল ভাবে ঐ সকল কথার প্রতিবাদ করেন। তিনি এই ভাবে বলেন যে, বর্ত্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবী ব্যেপে মানবজাতির যে অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ কচ্ছি (the facts we are facing every day) সেটী আমরা অগ্রাহ্য (ignore) কর্ত্তে পারি না এবং তার সহিত আপনাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে বিযুক্ত ক'রে ভারতের পুনরুত্থান সাধন কর্‌বার যত্ন করা একটী কল্পনা-কাহিনী মাত্র। এই ভাবটী বিশদ কর্‌বার জন্য তিনি অনেকগুলি যুক্তিসঙ্গত practical কথা বলেন। দুঃখের বিষয় যে, উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁর কথা গুলি ঠিক্ ঠিক্ ভাবে গ্রহণ ক'র্ত্তে পারেন নি। কারণ তিনি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন।

ধর্ম্ম-সাধন বিষয়েও বড় practical ছিলেন। উপস্থিত কাজে কি করা যায় সেই দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল—"সময়ের সার বর্ত্তমান"। কোন রকম কাল্পনিক অনুরাগ নয়—একটী জীবন্ত ধর্ম্ম তাঁর প্রাণকে নিভৃতে সতত জাগ্রত রাখ্‌ত। আজকার কাজ যথাসম্ভব আজ করা চাই, কাল্‌কার ভাবনা কল্যই ভাব্‌বার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এই রকম একটী ভাব মনে রাখ্‌তেন। একবার আমার ছোটমামা অফিসে ছয়মাস ছুটী নিয়ে বিশ্রাম কর্‌ছিলেন। ছুটী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একদিন কথ প্রসঙ্গে তিনি চুণীবাবুর নিকট বলেন যে, অফিসের কাজ থেকে একেবারেই অবসর নিয়ে শ্রীভগবানের চরণ চিন্তা ক'রে দিন কাটাতে ইচ্ছা করে। উত্তরে চুণীবাবু বলেন,—"আচ্ছা ভাই! এই যে ছয়মাস ছুটী কেটে গেল, তার মধ্যে কয় দিন কয় ঘণ্টা ঈশ্বরের চিন্তা করেছ?" ছোটমামা মুস্কিলে পড়লেন—ভেবে দেখ্‌লেন তেমন বিশেষ কিছু করা হয় নি এবং বুঝলেন যে আসল কথা-উপস্থিত কাজে করা চাই—"করিব করিব" এরূপ কল্পনায় কোন ফল হয় না।

গীতা পাঠ বড় ভাল বাস্‌তেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় কথিত ধর্ম্মমতই তিনি জীবনে অত্যন্ত দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছিলেন। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" মানুষ নিজ নিজ স্বভাবনিরত কর্ম্মকে শ্রীভগবানের পূজার ফুল ক'রে তুল্‌তে পারে—নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করতে পারে—গীতার এই মতটী তিনি জীবনে আত্মসাৎ করেছিলেন। উহাই ছিল তাঁর দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (Compass), তাঁর প্রতিদিনের guiding principle। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পত্র পুষ্প ফল জল দিয়ে শ্রীভগবানের পূজা করা অপেক্ষা নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁর পূজা করা শ্রেষ্ঠতর।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্‌॥"

মনে হয়, এই কারণেই আসন পেতে আড়ম্বর ক'রে ব'সে পূজা ধ্যান কর্‌তে তাঁকে দেখি নি—কিন্তু রাঁচির বাড়ীর সাম্‌নের বাগানে সহজ ভাবে চেয়ারে ব'সে একাকী গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকৃতে দেখেছি। হৃদয়ে যে সাক্ষাৎ ভাবে অন্তর্যামী ভগবানের স্পর্শ অনুভব কর্‌তেন, তা তাঁর কথায় কাজে ও ব্যবহারে বেশ বুঝা যেত। তাঁর হৃদয়ে কুসংস্কার-বিহীন বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব কিরূপ ছিল, তা তাঁর রচিত "নীলাচল" নামক গ্রন্থে "শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের স্নান-যাত্রা" সম্বন্ধে যা লিখিত আছে, সেটুকু একবার পাঠ ক'র্‌লেই বেশ বুঝা যাবে। এ সকল বিষয়ে ভাল ক'রে জান্‌বার আমার বিশেষ সুবিধা হয়েছিল যখন আমি তাঁর রাঁচির বাড়ীর অতি নিকটে একটী বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকৃতাম্‌। সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টাকাল দুই জনে একত্রে গীতা পাঠ করা হ'ত। নববিধান সমাজের উপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় ৺গৌর গোবিন্দ রায় মহোদয়ের কৃত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার বাঙ্গালা সংস্করণ পাঠ করা হ'ত। শরীর বিশেষ রকম অসুস্থ থাকৃলেও অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত এতটা দীর্ঘ সময় গীতা পাঠে আনন্দ অনুভব কর্‌তেন। জটিল ব্যাখ্যাগুলির মীমাংসা ভাল

ক'রে না বুঝে ছাড়তেন না। জীবনে গভীর সাধনা ছিল ব'লেই সে গুলির রস আস্বাদন করতে পারতেন।

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদার ভাব পোষণ করতেন। গীতার বাক্য—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"

এবং পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাক্য—"যত মত তত পথ"—এই গুলিতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সাকার উপাসনাকে পৌত্তলিকতা ব'লে ঘৃণা করতেন না এবং যাঁরা সেরূপ করেন, তাঁরা যে আপনাদিগকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ ক'রে নূতন সম্প্রদায় গড়ে তুলেন মাত্র, এ তিনি স্বীকার ক'রতেন। তিনি পরমহংসদেবের এই বাক্যে বিশ্বাস ক'রতেন যে—"ঈশ্বর সাকারও বটেন এবং নিরাকারও বটেন এবং তিনি সাকার ও নিরাকার উভয়েরই অতীতও বটেন।"

সকল ধর্ম্ম ও সকল দেশের ও সম্প্রদায়ের সাধু মহাজনদিগের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বিশেষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীঈশা (Jesus), শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছিলেন। এঁদের কথিত ধর্ম্ম মত গুলি আত্মসাৎ ক'রে জীবনে অনুসরণ করবার চেষ্টা করতেন। যুগপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় ও শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ উভয়কেই বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের সম্বন্ধে অনেকবার সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন এবং সেগুলি কোনটী বা প্রবন্ধাকারে এবং কোন-কোনটী মাসিক পত্রিকায় বা সংবাদ পত্রে ছাপা হয়েছিল। সাধু মহাজন-দিগের সম্বন্ধে কেহ কখন কোন নিন্দা করলে তাঁর প্রাণে আঘাত লাগত—যেন তাঁর পিতা মাতার নিন্দা করা হ'য়েছে! খ্রীষ্ট সম্বন্ধে অযথা নিন্দাবাদ-পরিপূর্ণ দুইখানি পুস্তক পাঠ ক'রে এতই মর্ম্মে ব্যথা পেয়েছিলেন যে, ঐ সকল কথার প্রতিবাদ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। সেই মনোবেদনা-প্রণোদিত হ'য়ে তিনি ঐ সময়ে খ্রীষ্টের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ঐ সকল

অযথা নিন্দাবাদগুলির প্রতিবাদ ক'রে "The Appeal of a Hindu to Critics of Jesus Christ" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা স্বকীয় প্রেরণা দ্বারা লিখিয়ে নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত করিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল তা ঐ পুস্তিকাখানির তিনি যে "Foreword" লিখেছিলেন তা পাঠে বুঝা যায় এবং তাঁর ধর্ম্মমতের উদারতা ও বিশ্বজনীন ভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

সর্ব্বোপরি তাঁর ধর্ম্ম-জীবন গার্হস্থ্যাশ্রমের একটী সুন্দর আদর্শ। চির-জীবন শ্রীভগবান্ অন্তর্যামীর সাক্ষাৎ-প্রেরণায় সকল কাজ নিয়মিত কর্‌বার জন্য প্রাণপাত যত্ন করেছেন। সকল সময় কৃতকার্য্য হয়েছেন কি না, ততদূর জান্‌বার সুবিধা আমার ছিল না, তবে ঐ প্রকার যত্নে বিফল হয়েছেন এমন কোন ঘটনা আমার জানা নাই। সত্যের অনুরোধে আত্মবলিদান কত্তে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কয়েকটী ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে, যখন সমাজের অনেক ক্ষমতাশালী (influential) লোক—অতি প্রিয় বন্ধুগণ ও অতি নিকট আত্মীয়গণ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, তথাপি সত্যের প্রতিষ্ঠা রক্ষা কর্‌বার জন্য একাকী কেবল অন্তরের জ্ঞানের আলোকের সাহায্যে সে সকল কার্য্যে সমাধা কত্তে পশ্চাৎপদ হন নাই। সমগ্র জীবন ব্যেপে ছোট বড় সকল ব্যাপারে যেন সর্ব্বদা খুঁজে বেড়াতেন যে, তার ভিতর কি মঙ্গল অনুষ্ঠান তাঁর দ্বারা সাধিত হ'তে পারে এবং সুযোগ পেলে তা সম্পন্ন কর্‌তে কখন ছাড়তেন না। তাঁর জীবনের predominant ভাবটী ভাল করে বুঝাবার জন্য কবীন্দ্র শ্রীরবীন্দ্রনাথের একটী গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত কর্‌লাম—

"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ-প্রাণ,
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান!"

ইতি—**শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে।**